এক

বহুকাল আগে এক রোমান তীর্থযাত্রী মেরিয়াব্রোনের এই মঠে রোপণ করেছিলেন বাদাম গাছটিকে। সেই থেকে মঠের ফটকের সমদূরবর্তী স্তম্ভশ্রেণীর একপাশে দূর দেশাগত এই গাছটি উত্তর প্রান্তের নূতন পরিবেশে দিনে দিনে বেড়ে উঠেছে নিঃসঙ্গ, একাকী। হাওয়ার দোলায় সতেজ, সৌম্যদর্শন গাছটির পাতাগুলি যখন মাথা নত করে মৃদু মৃদু দোলে তখনও যেন তার সর্বাঙ্গে একটা শান্ত দৃঢ়তার ছায়া। বসন্তের ছোঁয়ায় তার চার-পাশের প্রকৃতি যখন সবুজ সাজে সাজতে শুরু করে, এমন কি মঠের অন্যান্য বাদাম গাছগুলিও যখন তাদের পাটল রঙের আবরণ পরে নিয়ে বসন্ত উৎসবে মেতে ওঠে, এই বাদাম গাছটির কিন্তু তখনও কোনো রূপ পরিবর্তন হয় না। একদিন আচমকা তার নূতন কচি পাতার বুকে ক্ষীণ বিচিত্র রঙের আভা ছড়িয়ে কুঁড়িরা উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে আর শরৎকালে নূতন ফসল ঘরে তোলবারও অনেক পরে তার হলদে পত্রমঞ্জরী থেকে কাঁটা-ভরা ফলগুলি টুপটুপ করে পড়তে থাকে মাটির বুকে। নিঃসঙ্গ, সুন্দর এই গাছটি মঠের প্রবেশপথকে তার কোমল ছায়ায় ঢেকে গ্রীষ্মদেশাগত শ্রান্ত অতিথির মতই দাঁড়িয়ে আছে। রোমান ও ইতালীয় পথিকেরা বাদামগাছটিকে বড় ভালবাসে। আর আশ্রমবাসীরা তাকে অপরিচিত আগন্তুক মনে করে অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বিদেশী এই গাছটির তলায় মঠের বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা যুগ যুগ ধরে দলে দলে জড়ো হয়েছে। কি শীতে, কি গ্রীষ্মে, ছাত্রের দল এর তলায় বসে, হাসে, গল্প করে, খেলে, ঝগড়া মারামারি করে। বইয়ের থলে কাঁধে ফেলে ফুলের পাপড়ি আর বাদাম চিবোতে চিবোতে, অথবা বরফের গোলা নিয়ে খেলতে খেলতে তারা এই গাছের ছায়ায় ভিড় জমায়। এখানে প্রতি বছরই নূতন বিদ্যার্থীরা আসে। তাদেরই মধ্যে কয়েকজন আবার মঠেই থেকে যায় সন্ন্যাসী

হবার জন্য। অন্যেরা স্কুলের জীবন শেষ করে আপন আপন স্নেহের আশ্রয়ে ফিরে যায়। জীবনসংগ্রামে নেমে তারা কেউ হয় কৃতী পুরুষ, কেউ-বা জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে কোথায় যায় তলিয়ে। বড় হয়ে কখনও কখনও মঠটি দেখতে আসে তারা, সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের ছোট ছেলেদের মঠের এই বিদ্যাপীঠে ভর্তি করবার জন্য। মঠের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য নিজেদের জীবনের কত-না স্মৃতি তাদের মনের মুকুরে ভেসে ওঠে! আনমনা হয়ে মৃদু হেসে তারা বাদাম গাছটির দিকেও সস্নেহ দৃষ্টি তুলে কি যেন ভাবে কয়েকটি মুহূর্ত— তারপর আবার কোথায় চলে যায়।

মঠের ভেতরে লাল পাথরের মজবুত স্তম্ভশ্রেণী আর গোলাকার খিলানের মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিদ্যাপীঠের সন্ন্যাসীরা বাস করেন, অধ্যয়ন করেন। মঠের পরিচালনার ভারও তাঁদেরই উপর। জ্ঞানের প্রতিটি শাখা এখানে অনুশীলন করা হয়। পার্থিব, অপার্থিব জ্ঞান, অজ্ঞানতা আর জ্ঞানালোকের বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে মঠের অধ্যাত্ম জীবনে। অজস্র বই এখানে লেখা হয়েছে, কত বইয়ের টীকাসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অনেক নূতন নূতন বিধান সৃষ্টি হয়েছে আর দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন কত-না লেখা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রার্থনা-বইগুলিকেও নূতনভাবে সংস্কৃত করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের জীবনধারা এই মঠে প্রভাব বিস্তার করেছে। মঠের সন্ন্যাসীদের মধ্যে উদাসীন, উৎসাহী উপবাসীর দল যেমন ছিলেন, ছাত্রদের মধ্যেও তেমনই দাঙ্গাবাজ ছাত্রের অভাব ছিল না। এখানে যাঁরা যাঁরা জীবন কাটিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে গেছেন, তাঁদেরই মধ্যে থেকে হয়তো একদিন এমন একজনের আবির্ভাব হয়েছে যিনি অন্য সবার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যাঁকে সবাই ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত আবার ভয়ও করত। তাঁর সমসাময়িক অন্য সবার কথা নিঃশেষে ভুলে গেলেও বহুদিন পর্যন্ত তাঁর কথা লোকের মুখে মুখে ফিরত।

আজও মেরিয়াব্রোনের মঠে দুজন সন্ন্যাসী—একজন বৃদ্ধ আর একজন যুবা—সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছেন। মঠ আর বিদ্যাপীঠের অনেক সন্ন্যাসীর মধ্যে এ দুজনই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। এই দুজনের একজন হলেন মঠের মহান্ত ড্যানিয়েল, অন্য জন বিদ্যাপীঠের নবাগত তরুণ শিক্ষক নরজিস। নরজিস নূতন দীক্ষা নিয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে নিজের অসামান্য প্রতিভার জন্য এত দিনকার প্রথা ও নিয়মের বিরুদ্ধেই গ্রীক সাহিত্যের শিক্ষক

নিযুক্ত হয়েছে। গুরু ও শিষ্য, এই দুজনকে মঠের সবাই গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে।

মঠের সন্ন্যাসীরা প্রায় প্রত্যেকেই মহান্তকে বড় ভালবাসে। তাঁর কোনো শত্রু নেই। সহজ, সরল, ভাল মানুষটি তিনি, কিন্তু তাঁর উপর ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও মঠের কয়েকজন শিক্ষিত ব্রহ্মচারী একটু অবজ্ঞার চোখেও দেখে তাঁকে। তাদের মতে মহান্ত দেবতুল্য মানুষ হলেও পণ্ডিত নন মোটেই।

তরুণ যুবক নরজিসের আচার-ব্যবহার এবং ভাবভঙ্গি সবই সম্ভ্রান্ত বংশীয় নাইটের মত। অন্তর্ভেদী শান্ত, গম্ভীর চোখদুটির দৃষ্টি দেখেই বোঝা যায় নরজিস বড় কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক। তার ঠোঁট দুটি সুসংবদ্ধ ও পাতলা। তার যুক্তিপূর্ণ সংলাপ পণ্ডিতদেরও মুগ্ধ করে। সূক্ষ্ম রুচিবোধ আর আভিজাত্যের জন্য মঠের প্রায় সবাই তাকে ভালবাসে।

গুরু শিষ্য দুজনেরই নিজস্ব ধারায় ফুটে ওঠে আপন-আপন বৈশিষ্ট্য। একে অন্যের প্রতি কেমন এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে, আর মঠের মধ্যে এ দুজনই পরস্পরকে একান্ত আপন জন বলে জানে।

নরজিসের একমাত্র দোষ সে বড় আত্মসচেতন। কিন্তু এই দোষটিকেও সে সুন্দরভাবে লুকিয়ে রাখে। গম্ভীর আর আত্মমগ্ন বলে পণ্ডিতব্যক্তিরা ছাড়া খুব অল্প লোকই তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের দাবি করতে পারে। আপন বৈশিষ্ট্যের শীতল আবরণে নিজেকে যেন সে ঘিরে রেখেছে। নরজিস বড় একা, নিঃসঙ্গ। একদিন মহান্তের কাছে তার এই স্বীকারোক্তির পর মহান্ত তাকে বললেন, 'নরজিস, তোমাকে ভুল বুঝে অন্যায় করেছি আমি। তোমাকে দাম্ভিক ভেবে তোমার উপর অবিচার করেছি। তুমি বড় একলা ; তোমাকে প্রশংসা করার লোক অনেক আছে, কিন্তু বন্ধু কেউ নেই তোমার। তোমাকে একটু ভর্ৎসনা করবার জন্য কত ছুতোই না খুঁজেছি, কিন্তু একটিও পাই নি। তোমার বয়সী তরুণরা যে রকম অবাধ্য হয় তোমাকেও তেমনই অবাধ্য দেখতে চেয়েছি। কিন্তু তুমি তো কখনও অবাধ্য হও না। সময় সময় তুমি আমাকে ভাবিয়ে তোল নরজিস।' নরজিস তার গভীর কাল চোখ দুটি মহান্তের দিকে তুলে ধীরে ধীরে বলল, 'আপনাকে এতটুকুও দুঃখ দিতে আমি চাই না, ফাদার। একথা হয় ত খুবই সত্য যে আমি দাম্ভিক। সেজন্য দয়া করে আমাকে শাস্তি দিন।'

উত্তরে মহান্ত বললেন, 'বাচনভঙ্গি আর চিন্তাধারায় অদ্ভুত প্রতিভাবান তুমি। বিধাতা যেন তোমাকে শিক্ষক এবং পণ্ডিত হবার উপযুক্ত করেই গড়েছেন। আচ্ছা, তোমারও কি সেই ইচ্ছা?'

'আমাকে ক্ষমা করুন, ফাদার। আমার যে কি ইচ্ছা আমি তা নিজেই বুঝি না। বিজ্ঞানচর্চার দিকেই আমার ঝোঁক বেশি। এ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া কি করে সম্ভব? কিন্তু জ্ঞানচর্চাই যে আমার একমাত্র পথ হবে তাও মনে হয় না। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই যে সব সময় তার জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে তা নয়। অনেক সময় অদৃষ্টদ্বারাও পরিচালিত হয় সে।'

মহান্তের চোখে মুখে এবার চিন্তার গভীর ছায়া পড়ল। তবুও মৃদু হেসে জবাব দিলেন বৃদ্ধ, 'মানব চরিত্র যতটুকু আমি বুঝতে শিখেছি তাতে এই মনে হয়, আমাদের যৌবনে আমরা প্রায় প্রত্যেকেই যেন নিজের নিজের ইচ্ছাকে অদৃষ্টের খেলা বলতে ভালবাসি। তোমার অদৃষ্ট কি হতে পারে বলে মনে কর তুমি?' নরজিস তার কাল চোখ দুটি অর্ধ-নিমীলিত করল, চোখের পাতার আড়ালে যেন হারিয়ে গেল তারা। কোনো উত্তর দিল না সে। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। মহান্ত তাকে এবার আদেশের সুরে বললেন, 'বল, কথা বল।' মাটির দিকে চোখ নামিয়ে অস্ফুট স্বরে নরজিস বলতে শুরু করল, 'আর যাই হক না কেন, এই মঠের জীবনই যে আমার অদৃষ্ট এটা আমি নিঃসংশয়ে অনুভব করি, ফাদার। আমি জানি, আমি সন্ন্যাসী, যাজক, উপাচার্য এমনকি একদিন হয়তো এই মঠের মহান্তও হব। এইসব পদ-মর্যাদার জন্য আমি লালায়িত নই, কিন্তু আমি জানি এ সমস্তই আমার উপর একদিন চাপিয়ে দেওয়া হবে।' এবার তারা দুজনেই নীরব হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

বৃদ্ধ দ্বিধাভরা স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'এ ধারণা কেমন করে হল তোমার? পাণ্ডিত্য ছাড়া আর কি আছে তোমার যেজন্য তুমি এমন কথা বলতে পার?'

নরজিস ধীর গম্ভীর স্বরে বলল, 'মানুষের প্রকৃতি বুঝতে পারি আমি। নিজেরই নয় শুধু, অন্যের মন মেজাজ বুঝবার মত সূক্ষ্ম অনুভূতি আমার আছে। আমার প্রকৃতিগত এই বৈশিষ্ট্যই মানুষকে শাসন করে তার সেবা করতে বাধ্য করবে আমাকে। মঠের এই জীবনধারা বরণ করে না নিলে আমি হয়তো একদিন বিচারক বা শাসক হতাম।'

মহান্ত মাথা নেড়ে বললেন, 'তা হয়তো ঠিক। মানুষকে আর তার ভাগ্যকে জানবার বিশেষ গুণ রয়েছে তোমার মধ্যে। বেশ—আমার বিষয়ে কতটুকু জান তা বলবে কি তুমি?'

মহান্তের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে তাঁর প্রকৃত মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করল নরজিস। তারপর মাথা নত করে অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমি আপনার কথা কতটুকুই বা জানি, ফাদার। আমি জানি আপনি ঈশ্বরের সেবায়েতদের মধ্যে একজন। এতবড় মঠের আচার্য না হয়ে বনে বনে ছাগল চরিয়ে, নির্জনে তপোবনে প্রভাতী প্রার্থনা-সংগীত গেয়ে, কৃষকদের পাপস্বীকারোক্তি শুনে তাদের মুক্তির মন্ত্র দিয়ে জীবন কাটালেই আপনার পক্ষে শোভন হত। নিজের জন্য হয়তো কেবল শান্তিপূর্ণ মৃত্যুই কামনা করেন আপনি। আমার মনে হয় ভগবান আপনার এই প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। মৃত্যু একান্ত নীরবে আপনাকে কোলে তুলে নেবে একদিন।' মহান্তের বসবার ঘরে পরিপূর্ণ স্তব্ধতা নেমে এল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর বৃদ্ধই প্রথম আন্তরিক বন্ধুত্বের সুরে বললেন, 'তুমি বড় স্বপ্নবিলাসী, নরজিস। কল্পনা যতই নির্দোষ, সুন্দর হক না কেন, মানুষকে প্রতারণা করে। আমি ওসবে বিশ্বাস করি না, তোমারও করা উচিত নয়। কল্পনা ছাড়াও ঈশ্বর আমাদের কাছে অনেক কিছু দাবি করেন, তবে এক বৃদ্ধের সহজ, শান্তিপূর্ণ মৃত্যু হবে একথা জানিয়ে তুমি তাকে আনন্দই দিয়েছ, বন্ধু। তোমার কথা শুনে তার মন এক মুহূর্তের জন্য হলেও আনন্দে নেচে উঠেছে। কিন্তু আজ আর নয়—অনেক হয়েছে।'

আর একদিন বিদ্যাপীঠের শিক্ষা-পরিকল্পনার কয়েকটি বিষয়ে মঠের সর্বকনিষ্ঠ শিক্ষকের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় মহান্ত নরজিসের বিচার করতে বসলেন। শিক্ষা-পরিকল্পনায় কয়েকটি পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত যুক্তি দেখিয়ে একান্ত আগ্রহের সঙ্গে নরজিস তার মত প্রকাশ করল। কিন্তু ব্রহ্মচারী লোরেঞ্জ কেমন ঈর্ষাপরবশ হয়েই যেন তাতে মত দিলেন না। বারবার তাদের আলোচনা হল, ফল হল না। শুধু তিক্ততাই বেড়ে চলল। মীমাংসার জন্য মহান্তের কাছেই যেতে হল শেষে।

মহান্ত ড্যানিয়েল সহানুভূতির সঙ্গে ধৈর্য ধরে ব্যাকরণের শিক্ষা সম্বন্ধে তাদের দুজনেরই যুক্তি শুনলেন। দুজনে এ ব্যাপারে নিজ নিজ চিন্তাধারা ব্যক্ত করার পর বৃদ্ধ মহান্ত তাদের দিকে সকৌতুকে তাকালেন এবং তাঁর শ্বেতশুভ্র মস্তক মৃদু দুলিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমার প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা

একজনও মনে করো না যে এসব ব্যাপার তোমাদের চাইতে আমি ভাল বুঝি। তবে এটা খুবই প্রশংসনীয় যে নরজিস তার সমস্ত অন্তর দিয়ে বিদ্যাপীঠের কথা ভাবছে আর সেজন্যই সে আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনাকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করার প্রয়াসী। কিন্তু যদি তার ঊর্ধ্বতন শিক্ষক অন্য রকম কিছু চিন্তা করেন তাহলে নরজিসকে নীরবে তা মেনে নিতেই হবে। কারণ মঠের নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভেঙে যাবে এমন কোনো কাজ করলে বিদ্যাপীঠের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হয়েও কোনো লাভই হবে না। তাই নিজেকে এ ব্যাপারে সংযত করতে না পারায় নরজিসকেই দোষী করছি। আর তোমাদের দুজন তরুণ শিক্ষার্থীর জন্য এই কামনা করছি, তোমাদের চাইতে বিদ্যাবুদ্ধিতে কম এমন গুরুজনের অভাব যেন তোমাদের জীবনে কোনো দিনই না হয়। আত্মাভিমান দূর করার জন্য এর চেয়ে ভাল জিনিস আর কিছু নেই।' এই ভাবে কৌতুকভরে কথা বলে তিনি তাদের বিদায় দিলেন। কিন্তু দুজনের মধ্যে আবার শান্তি ও সম্প্রীতির ভাব ফিরে এসেছে কি না বোঝবার জন্য পর পর কয়েক দিন দুজনের ওপরেই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেও ভুললেন না।

কিছু দিনের পর মঠে আর একটি নূতন মুখ দেখা গেল। এমন কত-না নূতন ছেলে এখানে এসেছে আবার চলে গেছে। চোখের আড়াল হলেই তাদের কথা সবাই ভুলে যায়। কিন্তু এই নূতন মুখখানি যেন ভোলবার নয়। এই ছোট ছেলেটির বাবা অনেকদিন আগেই তাকে মঠের বিদ্যাপীঠে পড়তে দেবেন বলে জানিয়েছিলেন। তারপর বসন্তের এক সুন্দর দিনে তার বাবা তাকে মঠে নিয়ে এলেন। বাদাম গাছটির তলায় তারা ঘোড়া বাঁধল। মঠের দারোয়ান তাদের দেখে এগিয়ে এল। ছেলেটি বাদাম গাছের নগ্ন ডালপালার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। বলল, 'কী সুন্দর গাছটি! এমনটি তো কোথাও দেখি নি! কি নাম ওর কে জানে!' ছেলেটির বাবার মুখখানি যেমন কৃশ তেমনই গম্ভীর। তিনি ছেলের কথায় কান দিলেন না। কিন্তু দারোয়ান ছেলেটিকে একপলক দেখেই ভালবেসে ফেলেছে। তাই সে গাছটির নাম তাকে বলল। ধন্যবাদ জানিয়ে হাত বাড়িয়ে দারোয়ানের হাতখানি ধরে ছেলেটি বলল, 'আমার নাম গোল্ডমুণ্ড। আমি এখানকার স্কুলে পড়তে এসেছি।' দারোয়ান একটু হেসে নবাগতদের সঙ্গে নিয়ে ফটক পার হয়ে চওড়া পাথরের সিঁড়ি বেয়ে মঠে প্রবেশ করল। গোল্ডমুণ্ড বেশ খুশি মনেই মঠে ঢুকল। তার কেবলই মনে হতে লাগল এখানে অন্তত

দুজনের দেখা সে পেয়েছে যাদের সঙ্গে খুব সহজেই বন্ধুত্ব করা যাবে। সেই দু দুজনের একজন হল সুন্দর বাদাম গাছটি আর অন্য জন মঠের এই দারোয়ান।

বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সন্ধ্যার দিকে মহান্ত নিজে তাদের স্বাগত জানালেন। তৎকালীন সম্রাটের সেনাবাহিনীর অন্যতম সৈনিক গোল্ডমুণ্ডের পিতা তাঁর ছেলেকে তাঁদের দু জনের হাতেই সঁপে দিলেন। ভদ্রলোককে কিছুদিন অতিথিশালায় থাকবার জন্য অনুরোধ করা হল। কিন্তু পরদিনই তাঁকে চলে যেতে হবে বলে তিনি মাত্র এক রাত্রির জন্য থাকতে রাজী হলেন। যাবার সময় গোল্ডমুণ্ডের বাবা সঙ্গের একটি ঘোড়া মঠে উপহার দিয়ে গেলেন। শিক্ষক মহাশয় এবং মহান্ত দুজনেই নীরব, নম্র গোল্ডমুণ্ডের দিকে তাকিয়ে খুশি হলেন। এই সুন্দর কিশোর এক নিমেষেই তাঁদের আকৃষ্ট করেছে।

গোল্ডমুণ্ডকে তার শিক্ষকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ছাত্রদের থাকবার হলঘরে তারও বিছানা দেওয়া হল। তার দু চোখ ভরে কেমন একটা ভয়-মেশানো শ্রদ্ধার দৃষ্টি। তার সুন্দর সোনালী চোখের পাতায় দু ফোঁটা জল টলমল করছে দেখে দারোয়ান তার কাঁধে সাদরে চাপড় মেরে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য হাসি মুখে বলল, 'কি হয়েছে খোকাবাবু? এমন করে মন খারাপ করে থেকো না। প্রথম প্রথম মা-বাবা-ভাই-বোনের জন্য একটু কষ্ট হবেই। কিন্তু কয়েকটা দিন গেলেই দেখবে এখানেও কত ভাল লাগবে তোমার। এখানকার জীবনটাকেই তখন ভালবেসে ফেলবে।'

গোল্ডমুণ্ড উত্তর দিল, 'ধন্যবাদ, ভাই। কিন্তু আমার মা-ভাই-বোন কেউ নেই। শুধু বাবা আছেন।'

'তা কি হয়েছে, এখানে কত খেলার সঙ্গী পাবে তুমি। পড়াশুনো করবে, নূতন নূতন খেলা খেলবে। আমার কাছেও মাঝে মাঝে আসবে তুমি, কেমন?'

গোল্ডমুণ্ড হাসল। বলল, 'বেশ। যে ছোট্ট ঘোড়াটা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে তার কাছে এখনই আমাকে নিয়ে চল না। তাকে একটু আদর করব। আমি দেখতে চাই সেও এখানে খুশি মনে থাকতে পারবে কি-না।' দারোয়ান তখনই তাকে গোলাঘরের কাছে আস্তাবলে নিয়ে চলল। সন্ধ্যার আঁধার সবে নেমে এসেছে। আস্তাবলে গোল্ডমুণ্ড তার বাদামী রঙের ছোট্ট ঘোড়াটিকে দেখতে পেয়ে আদরে গলা জড়িয়ে

ধরল। ঘোড়াটাও তার মনিবকে চিনতে পেরে গোল্ডমুণ্ডের দিকে মাথাটি এগিয়ে দিল। গোল্ডমুণ্ড তার প্রশস্ত কপালের উপর নিজের গাল লাগিয়ে তাকে চাপড়াতে চাপড়াতে আদরের স্বরে বলল, 'সোনামণি, কেমন আছ? তুমি আমাকে এখনও ভালবাস তো? বাড়ির কথা একবারও মনে পড়ছে কি? পেট ভরে খেয়েছ তো? আমার ছোট্ট বন্ধু, আমার ব্লেস, আমার কাছে থাকবে বলে আমি কত খুশি হয়েছি কেমন করে তা বোঝাব? আমি তোমাকে রোজ দেখতে আসব, কেমন?' কিছুক্ষণ পর এখান থেকে বিদায় নিয়ে দারোয়ানের সঙ্গে লেবু গাছে ঘেরা প্রশস্ত চত্বরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। ভেতরের ফটক পর্যন্ত এসে দারোয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়ে গোল্ডমুণ্ড একা একা স্কুল ঘরে এসে পৌঁছল।

সেখানে তখন প্রায় এক ডজন ছেলে বেঞ্চে বসে আছে। তাদের নূতন মাস্টারমশাই নরজিস তার দিকে তাকাতেই গোল্ডমুণ্ড বলল 'আমি এখানে নূতন শিক্ষার্থী। আমার নাম গোল্ডমুণ্ড।' নরজিস তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গম্ভীর মুখে পেছন দিককার বেঞ্চে বসবার জন্য ইঙ্গিত করল। তারপর আবার পড়াতে শুরু করল। গোল্ডমুণ্ড বসল। মাস্টারমশাই তো তার চাইতে এমন কিছু বড় হবেন না! এই তরুণ শিক্ষকটিকে দেখে সে খুব অবাক হল। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটু খুশিতেও মন ভরে উঠল তার, সত্যি, মাস্টারমশাইটি দেখতে কেমন সুন্দর। আবার কী ধীর গম্ভীর মার্জিত সুন্দর ব্যবহার! সকলকেই যেন ভালবেসে জয় করে নিতে পারেন তিনি। দারোয়ানটি তার সঙ্গে কত সুন্দর ব্যবহার করেছে, মঠের অধ্যক্ষ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, ব্লেস আস্তাবলে খুশি মনে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির মতই সব মনে হচ্ছে যেন। আবার এখানে এই বিচিত্র তরুণ ব্রহ্মচারীও রয়েছেন। যেমন বিদ্বান, তেমনই সুন্দর দেখতে; ঠিক যেন রাজপুত্র! স্পষ্ট, শান্ত স্বরে এমনভাবে পড়াচ্ছেন যে ছাত্রেরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে বাধ্য হচ্ছে। গোল্ডমুণ্ডও আনন্দের সঙ্গে শুনতে লাগল, যদিও বিষয়টা সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। মনটা তার শান্ত হল এতক্ষণে। কতগুলি ভাল লোকের মধ্যে এসে পড়েছে সে। তাদের ভালবেসে বন্ধু করে নেবার চেষ্টা করবে। আজই সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে তার মন বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন মনের সেই অশান্ত, উতলা ভাব আর নেই। সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন সে খুশি, সত্যিই খুব খুশি। বারবার সে মাস্টার-

মশায়-এর দিকে তাকাতে লাগল। অবাক হয়ে তাঁর সতেজ ছিপছিপে দেহখানির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তাঁর শান্ত, উজ্জ্বল দৃষ্টি। সুসংবদ্ধ ঠোঁটদুটি প্রতিটি শব্দ কেমন নিখুঁত সাবলীল ভঙ্গিতে উচ্চারণ করছে! তাঁর উদাত্ত স্বরে ক্লান্তির এতটুকুও ছোঁয়াচ নেই।

পড়ান শেষ হয়ে গেলে ছাত্রের দল হৈ হৈ করে উঠে পড়ল। আচমকা গোল্ডমুণ্ডের চেতনা হল সে অনেকক্ষণ সেখানে বসে তন্দ্রায় ঢুলছে। কেমন লজ্জা হল তখন। আশেপাশের কয়েক জন তার এই ভাব দেখে ফেলেছে, অন্যদেরও ফিসফিস করে বলে দিচ্ছে। নরজিস ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র তার চারপাশের সঙ্গীরা চিৎকার করতে করতে তাকে ঘিরে ধরল। একজন তাকে ভেংচে বলল, 'কি গো, ঘুম ভাঙ্গল?'

আর একজন ঠাট্টা করে বলল, 'ওঃ, বিদ্যার জাহাজ একেবারে! একদিন হয়তো কেউকেটা হবেন! প্রথম দিন পড়া শুনেই একেবারে ঘুমের রাজ্যে চলে গেছেন!' তৃতীয়জন প্রস্তাব করল, 'এই খোকাটিকে বিছানায় নিয়ে চল।'

তারপর তার হাতে পায়ে সবাই মিলে চিমটি কাটতে লাগল। পাঁজা-কোলে করে তাকে উঁচুতে তুলে ধরে চেঁচাতে শুরু করল। বিদ্রূপভরা কত কথার বাণ ছুঁড়তে লাগল। তারা তাকে এমনভাবে বিরক্ত করতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত গোল্ডমুণ্ড ধৈর্য হারিয়ে ফেলে রেগে চারদিকে হাত-পা ছুঁড়ে তাদের মেরে ধরে নিজেকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল। কয়েক জনের জামা টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলে সে মাটিতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।

গোল্ডমুণ্ডই জয়ী হল শেষ পর্যন্ত। তার শক্তিমান শত্রুর জামা কয়েক বারই সে টেনে ছিঁড়ে ফেলল। বিপক্ষের কয়েক জন এবার গোল্ডমুণ্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার জন্য আগ্রহ দেখাল। তারা কিন্তু তার নামটাও তখন পর্যন্ত জানে না। তারপর তারা সবাই ছুটে উধাও হয়ে গেলে একজন সহকারী মাস্টারমশাই, ব্রহ্মচারী মার্টিন এসে প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার বলতো? কি হয়েছে তোমার? তুমিই তো গোল্ডমুণ্ড, তাই নয়? ঐ দুষ্টু ছেলের দল তোমাকে মেরেছে বুঝি?'

'না, পারে নি! আমিই জয়ী হয়েছি।'

'কিন্তু কার সঙ্গে?'

'কি করে বলব তা ? আমি এখনও এখানকার কাউকে চিনি না। ওদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে হাতাহাতি করেছে।'

'ও। আচ্ছা, সে-ই কি প্রথম শুরু করেছে ?'

'মনে হচ্ছে আমিই শুরু করেছিলাম। তারা আমার পেছনে লেগেছিল। তাই আমিও রেগে গিয়েছিলাম।'

'বাঃ! বেশত, শুরুটা বেশ সুন্দর ভাবেই হয়েছে দেখছি! শোন, স্কুলঘরে আবার কোনোদিন মারামারি করলে চাবুক খাবে কিন্তু। আচ্ছা, এখন খেতে যাও।'

অপ্রস্তুত গোল্ডমুণ্ড দৌড়ে চলে যাবার সময় মৃদু হেসে তিনি তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অন্যেরা যে দিকে গেছে সেই দিকে দৌড়তে দৌড়তে হাত তুলে গোল্ডমুণ্ড সোনালী চুলের গুচ্ছ গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

গোল্ডমুণ্ড নিজেও মনে মনে স্বীকার করল, মঠে এসে তার এই প্রথম কীর্তিটি নেহাতই একগুঁয়েমী আর দৌরাত্ম্যের পরিচয় দিয়েছে। রাতে সবার সঙ্গে খেতে বসে বড়ই লজ্জিত হল মনে মনে। কিন্তু সবাই তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালে সেও তার শত্রুপক্ষের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করল। আর সেই দিন থেকে অন্য সব ছাত্রদের একান্ত প্রিয় হয়ে উঠল সে।

দুই

সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলেও গোল্ডমুণ্ড তখনই সত্যিকারের কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু খুঁজে পেল না। তার সহপাঠীদের মধ্যে এমন কেউই ছিল না যার সঙ্গে সে নিজেকে একাত্ম মনে করতে পারে। মঠের অন্য সবাই কিন্তু প্রথম দিনে বেপরোয়া মারামারিতে রত এই সাহসী যোদ্ধাটিকে এখন একজন অতি শান্তিপ্রিয় সঙ্গী হিসেবে পেয়ে অবাক হয়ে গেল।

এবারে মনে হল গোল্ডমুণ্ড স্কুলের সেরা ছাত্র হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। মহান্ত ড্যানিয়েল আর তরুণ শিক্ষক নরজিস—দুজনেই তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। দুজনকেই তার ভাল লেগেছে, তাঁরাই যেন তার সকল ভাবনাকে ঘিরে আছে। এঁদের জন্য গভীর শ্রদ্ধা মেশানো ভালবাসা মর্মে মর্মে অনুভব করল সে। মহান্তকে গোল্ডমুণ্ড দেবতুল্য বলেই মনে করে। তাঁর সহজ সরল রীতি, আর সুন্দর, শান্ত স্বভাব গোল্ডমুণ্ডকে দুর্নিবার এক আকর্ষণে টানতে লাগল।

মহান্তের পায়ে নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দিতে সাধ হয় তার। তপস্বীর মত সুন্দর, নির্মল জীবন কাটাবার শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করবার কামনাই গোল্ডমুণ্ডের মনে দিনরাত। এটা তার নিজের একান্ত সাধ, বাবার ইচ্ছা ও আদেশ। গোল্ডমুণ্ডের বাবা একবার কি একটা ইঙ্গিত করে স্পষ্ট বলে গেছেন যে তাঁর ইচ্ছা তাঁর ছেলে সমস্ত জীবন মঠেই কাটাবে। গোল্ডমুণ্ডের জন্ম সংক্রান্ত কি এক কলঙ্কই নাকি এভাবে সারাজীবন প্রায়শ্চিত্ত করবার একমাত্র কারণ। মহান্ত তার বাবার উপর তেমন সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

গোল্ডমুণ্ডের আরেক জন প্রিয়পাত্র নরজিস তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে সবকিছুই বুঝতে পেরেছে। তবুও নীরবেই রইল সে। তার সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করল, একটি দেবদূতের মতই নিষ্পাপ, সুন্দর এই ছেলেটি আচমকা কোথা হতে তার একান্ত কাছে এসে পড়েছে। এখানে সেও বড় একা, নিঃসঙ্গ। কিন্তু গোল্ডমুণ্ডের সঙ্গে নিজেকে আজকাল একাত্ম মনে করছে নরজিস। যদিও বাইরের দিক থেকে ছেলেটি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। নরজিস

বড় ভাবুক ও বিশ্লেষণপ্রিয়। কিন্তু গোল্ডমুণ্ড শিশুর মত কল্পনাবিলাসী। তবু তাদের অন্যান্য সাদৃশ্যগুলি সব বৈসাদৃশ্য ঢেকে দিয়েছে। দুজনেই অভিজাত বংশের ছেলে, সূক্ষ্ম, সুন্দর রুচিবোধ দুজনেরই। তাদের অন্য সঙ্গীদের থেকে তারা দুজনেই যে সম্পূর্ণ আলাদা এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। দৈবের একই ইঙ্গিতে যেন চলেছে তারা দুজন।

গোল্ডমুণ্ডের প্রকৃতি আর ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরেই যেন নরজিস তার প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল হয়ে পড়ল। গোল্ডমুণ্ডও তার এই সুন্দর, চিন্তাশীল, ধ্যানমগ্ন শিক্ষকটিকে দেখামাত্র আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সহজ ও সরলতার প্রতীক, ঋষিতুল্য মহান্তকে জীবনের আদর্শ বলে মেনে নিয়ে কেমন করে আবার এই অন্তর্দর্শী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, জ্ঞানী শিক্ষকটিকেও সে ভালবাসতে পারল, সেটাই গোল্ডমুণ্ডের কাছে এক পরম বিস্ময়। তবুও কৈশোরের সমস্ত শক্তি, উৎসাহ দিয়ে এই পরস্পর বিরোধী চরিত্রের দুজনকেই অনুসরণ করবার চেষ্টা করল। এভাবে এদের দুজনের প্রতি তার মনের বিচিত্র এই আকর্ষণ তাকে সর্বক্ষণ বড় কষ্ট দিচ্ছিল। স্কুলে এসে প্রথম কয়েক মাস গোল্ডমুণ্ড নিজের মনের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করেছে। প্রতিমুহূর্তে এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে দুঃসহ এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কবল থেকে মুক্তি পেতে সাধ গেছে তার। ছুটে আস্তাবলে গিয়ে তার প্রিয় সঙ্গী ব্লেসের কপালে নিজের গালটি ছুঁইয়ে তাকে চুমু খেয়ে আদর করতে করতে অঝোরে কাঁদতে শুরু করেছে। কেমন এক অব্যক্ত ব্যথার কাল-ছায়া তার মুখের রেখায় রেখায় একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠত। সবাই তখন বুঝতে পারত এবার তার একটা কিছু হয়েছে।

গোল্ডমুণ্ডের সুন্দর গাল দুটো ভেঙে গেছে আজকাল। দৃষ্টিও কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তার যে হাসি খুশি ভাব প্রথম কয়েকদিন সবাইকে আনন্দ দিয়েছে তা ক্রমেই কমে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে যখন তার মনে নানা কুচিন্তা আসে, লেখা পড়ায় মন বসেনা, দিবাস্বপ্ন দেখে বা অলস ভাবনায় সমস্ত মন ছেয়ে যায়, এমনকি ক্লাসে বসেও তন্দ্রায় ঢলে পড়ে তখন নিজেকে কেমন অপরাধী মনে করে দুশ্চিন্তায় একেবারেই ভেঙে পড়ে।

গোল্ডমুণ্ডকে ঘিরে নরজিসের ভাবনা তার কল্পনার চাইতেও অনেক বেশি গভীর। এই সুন্দর, নির্মল ছেলেটি নরজিসের মধ্যে আপন সত্তার বিপরীতকে উপলব্ধি করবে, নরজিস এই কামনাই করছে। গোল্ডমুণ্ডকে পরিপূর্ণভাবে জেনে তাকে সত্য পথে চালিয়ে নিয়ে তার

অন্তরকে সত্য ও সুন্দরের পূজারী করে তুলতে চায় নরজিস। একটি ফুলকে ফুটিয়ে তুলতে চায় সে। তবুও নানা কারণে নরজিস নিজেকে সামলে নিল। তার প্রতি বয়স্ক কয়েকজন ব্রহ্মচারীর বাঁকা দৃষ্টি মাঝে মাঝেই অত্যন্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে লক্ষ্য করেছে সে। তারাই আবার অনেক সময় উপযাচক হয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা করেছে, নানাভাবে দরদ দেখাতে চেয়েছে। কিন্তু এসবই নরজিস নীরবে প্রত্যাখান করেছে। সুন্দর গোল্ডমুণ্ডকে আদর করে উপদেশ দিতে সাধ যায় তার। এলোমেলো সোনালী চুলের গুচ্ছে আদরে আঙুল বুলিয়ে তার সুন্দর, কোমল মুখখানিতে হাসি ফোটাতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তা সে করতে পারে না কখনও। মঠে নূতন এলেও তাকে শিক্ষকের দায়িত্ব আর সম্মান দুই-ই দেওয়া হয়েছে। তার থেকে মাত্র কয়েক বছরের ছোট ছাত্রদের সঙ্গে এমন একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে যে, মনে হয় সে বুঝি এদের চাইতে বিশ বছরের বড়। বিশেষ কোনো ছাত্রের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা অনুভব করা মাত্রই নিজেকে কঠোরভাবে দমন করে। আর যারা তার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী তাদের প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে তার কর্তব্য করার আপ্রাণ চেষ্টাও করে সে। জ্ঞান, বুদ্ধি আর প্রতিভার সেবাতেই যেন তার কঠিন, সংযত জীবনকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করা হয়েছে। অসতর্ক ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি আর সূক্ষ্ম বোধশক্তির জন্য সে আত্মতৃপ্তি লাভ করে মনে মনে গর্বও অনুভব করে। গোল্ডমুণ্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব তাকে যাই দিক না কেন, একদিন এই বন্ধনই বিপজ্জনক একটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে হয়তো। তাই সে তার জীবনের মর্মস্থলকে স্পর্শ করতে দেবে না এই বিচিত্র আকর্ষণকে। তার শান্ত, নির্লিপ্ত, ধ্যানমগ্ন জীবনকে সে মানুষের আত্মিক সেবার উপযোগী করে আর শিক্ষার্থীদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য গড়ে তুলছে। শুধু তাই নয়, আপন সত্তার সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা ভুলে গিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়াও তার জীবনের লক্ষ্য।

গোল্ডমুণ্ড আজ একবছরের উপর হল মঠের বিদ্যাপীঠে এসেছে। ফটকের সামনে সুন্দর বাদাম গাছটির ছায়ায় আর বাইরের প্রাঙ্গণে লেবু গাছগুলির তলায় তার সঙ্গীদের সঙ্গে কত খেলা খেলেছে। এখন আবার বসন্ত এল। তবুও গোল্ডমুণ্ড কেমন ক্লান্ত, নিরুৎসাহ। আজকাল প্রায়ই তার মাথা ব্যথা করে। স্কুলে গিয়ে তন্দ্রায় ঢলে পড়ে, পড়াশুনোয় মন দিতে পারে না মোটেই।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় এডল্‌ফ্‌ গোল্ডমুণ্ডের কাছে এল। এডল্‌ফের সঙ্গেই প্রথম দিন তার মারামারি হয়েছিল। গেল শীত শুরু হতেই এই ছেলেটি গোল্ডমুণ্ডের পাশে বসে ইউক্লিড পড়তে আরম্ভ করেছে। রাত্রির খাওয়ার পর একঘণ্টা ছাত্রেরা তাদের শোবার হলঘরে এ দিক ও দিক ঘুরে খেলা করে, স্কুল ঘরে বসে গল্পগুজব করে, আবার হয়ত বাইরের প্রাঙ্গণে একটু বেড়িয়েও আসে। সেদিন ঠিক এই সময়টিতেই এডল্‌ফ্‌ গোল্ডমুণ্ডের কাছে এসে তার হাত ধরে মঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, 'গোল্ডমুণ্ড, তোমাকে একটা মজার কথা বলব। কথাটা শুনে হাসবে হয়ত। তুমি তো খুব ভাল ছেলে, একদিন হয়তো-বা বিশপই হবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর আমি যা বলব তোমাকে, ঘুণাক্ষরেও আর কাউকে, কোন মাস্টার-মশাইকেও বলবে না সে কথা, কেমন? নীরবে আমাদের সঙ্গী হবে'...

ফিস ফিস করে কথা বলে এডল্‌ফ্‌ তাকে টেনে নিয়ে চলল ফটকের বাইরে লেবু গাছগুলির তলায়। বলল, ওদের নাকি একটা ভাল সঙ্ঘবদ্ধ দল আছে। সেই দলের পাণ্ডা সে নিজেই। তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে আরম্ভ করে তারা সকলেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছে তারা কেউ কোনোদিন সন্ন্যাসী হবে না। তাই একরাত্রির জন্য বিধি নিষেধের গণ্ডি ছাড়িয়ে গোপনে দূরের এক গাঁয়ে চলে যাবে। এই রোমাঞ্চকর অভিযানের অভিজ্ঞতা ও আনন্দ কুড়িয়ে নিয়ে রাত্রির আঁধারেই আবার তারা চুপি চুপি মঠে ফিরে আসবে।

'কিন্তু তখন তো ফটক বন্ধ থাকবে,' গোল্ডমুণ্ড বলল।

'হাঁ, তা তো থাকবেই। কিন্তু তাতে আরও বেশি মজা হবে। খেলাটা জমবে ভাল। দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দল গোপন পথে ফিরে আসবে আবার। একাজ তো আর এবারেই প্রথম করা হচ্ছে না।' গোল্ডমুণ্ডের মনে পড়ল সহসা, একটি ছাত্রকে একদিন বলতে শুনেছিল, 'গাঁয়ের পথে বেরিয়ে পড়ি চল।' এমন কথা কিন্তু অনেককেই অনেকবার বলতে শুনেছে সে। আমোদ স্ফূর্তি করবার জন্য গভীর রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়ে তারা। কিন্তু নিয়ম ভঙ্গ করা মানে তো মাস্টারমশাইদের হাতে বেদম চাবুক খাওয়া। গোল্ডমুণ্ডের মনটা কেমন বেতাল হয়ে গেল একনিমেষে। 'না' বলে এক ছুটে ফটকের মধ্য দিয়ে একেবারে শোবার ঘরে চলে যেতে ইচ্ছা হল তার। কিন্তু তবুও এডল্‌ফের সামনে 'না' বলতে

পাপ বলেই মনে করল সে। অন্যদের কাছে এটা কিছু না হলেও গোল্ডমুণ্ডের কাছে যে কোনো রকমে মেয়েদের সংস্পর্শে আসাটাই মহাপাপ। কারণ সন্ন্যাসী হয়ে পবিত্র জীবন কাটাতেই সে এখানে এসেছে। না, আর কোনো-দিনই সে এখানে আসবে না। নোংরা রান্নাঘরের মিটমিটে আলোর পরিবেশে বুকটা তার কেবলই ঢিপঢিপ করতে লাগল।

তার সঙ্গীরা বিজ্ঞের মত কথায় কথায় ল্যাটিন উদ্ধৃত করে মেয়ে দুটির কাছে বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করছে। একটু একটু করে তারা তাদের খুবই কাছে গিয়ে বসে নানা ভাবে ভালবাসার কথা বলে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করতে লাগল।

সবাই ফিস ফিস করে কথা বলছে। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে যেন বিসদৃশ মনে হচ্ছে। গোল্ডমুণ্ড কারও সঙ্গে কথা না বলে কম্পমান দীপশিখার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে মেঝের ওপর পাথরের মত নিথর হয়ে বসে রইল। অন্যদের এই ভীরু প্রেম নিবেদনের দৃশ্যটি দেখবার একটা কৌতূহল রোধ করতে না পেরে মাঝে মাঝে সে সেইদিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে জোর-করেই আবার অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। প্রকাশ্যে এই শ্যামাঙ্গী তরুণীটির প্রতি বীতস্পৃহ হলেও আন্তরিকভাবে সে যেন তাকে ছাড়া অন্য কাউকে না দেখতে পেলেই খুশি হয়। আর সেজন্যই মেয়েটির প্রতি বিতৃষ্ণা ভাব কেটে গিয়ে বারবারই গোল্ডমুণ্ডের দৃষ্টি তার শান্ত, সুন্দর মুখখানির উপর আছড়ে পড়ছে। মেয়েটিও মন্ত্রমুগ্ধের মতই যেন অপলক তার দিকে তাকিয়ে আছে।

এভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। গোলমুণ্ডের কাছে এই এক ঘণ্টা সময়কে মনে হল যেন দীর্ঘ একযুগ। ছাত্রেরা তখন তাদের ল্যাটিন ভাষার বাহাদুরি আর ঠাট্টাতামাশা প্রায় শেষ করে এনেছে। ধীরে ধীরে সবাই কেমন নীরব হয়ে পড়ল। এবারহার্ড হাই তুলতে আরম্ভ করেছে। রোগা, বয়স্কা মেয়েটি মনে করিয়ে দিল যে এবার তাদের যাবার সময় হয়েছে। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে একে একে বয়স্কা মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। সবার শেষে হাত বাড়াল গোল্ডমুণ্ড। তারপর তরুণীটির হাতও তারা স্পর্শ করল। গোল্ডমুণ্ড এবারও সবার শেষে ভদ্রতা রক্ষা করল। কনরাড জানালা দিয়ে বেরিয়ে সবার আগে পথ দেখিয়ে চলল। এবারহার্ড আর এডলফ্ ঠিক তার পেছনে। গোল্ডমুণ্ড তাদের অনুসরণ করতেই অনুভব

করল কে যেন পেছন থেকে কাঁধে হাত রেখে তাকে টেনে ধরেছে। তবুও সে দাঁড়াল না। বাগান পর্যন্ত নেমে এসে একটু দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকাল। জানালা দিয়ে গলিয়ে খোঁপা-বাঁধা তরুণী মেয়েটি তখন তার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে ডাকল, 'গোল্ডমুণ্ড……'

গোল্ডমুণ্ড দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকাতেই মেয়েটি এবার প্রশ্ন করল, 'তুমি আবার আসবে তো?' মেয়েটির সলজ্জ, কম্পিত, নিরুদ্ধ স্বর। গোল্ডমুণ্ড মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে মেয়েটি সহসা হাত বাড়িয়ে তার মাথাটি দু হাতের আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল। গোল্ডমুণ্ড তার কপালের ওপর উষ্ণ ছোট ছোট হাত দুখানির কোমল স্পর্শ অনুভব করল। মেয়েটি আরও অনেকটা ঝুঁকে তার গভীর কাল চোখ দুটিকে গোল্ডমুণ্ডের চোখের সামনে নিয়ে সহসা ছোট শিশুর মতই গোল্ডমুণ্ডের মুখের ওপর একটি ভীরু চুম্বন-স্পর্শ বুলিয়ে দিল। এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে গোল্ডমুণ্ড ছুটে বাগান পেরিয়ে সঙ্গীদের অনুসরণ করল। নরম মাটির বুকে হোঁচট খেয়ে এগিয়ে যেতে যেতে একটা গোলাপ-ঝাড়ে হাত লেগে কাঁটা বিঁধে গেলেও। কঞ্চির বেড়া ডিঙ্গিয়ে তাদের পিছনে গাঁয়ের পথ ধরে ছুটে চলল সে পাগলের মত। বুদ্ধি দিয়ে সে নিজেকে শাসাচ্ছে, 'আর কোন দিনই নয়,' কিন্তু মন তার হতাশায় বলতে চাইছে, 'কাল, কাল আবার আসতে হবে'।

এই নিশাচরদের কেউ দেখতে পেল না। ঘন আঁধারে মুখ লুকিয়ে তারা ফিরে চলল মঠে।

পরদিন বিপুলকায় এবারহার্ড কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোচ্ছে দেখে তার সঙ্গীরা বালিশ ছুঁড়ে তাকে জাগাতে বাধ্য হল। সকাল বেলাকার প্রার্থনা, খাওয়া, স্কুলের পড়া—সবকিছুই তারা সময়মত, নিয়মমতই করল। কিন্তু স্কুলে গিয়ে গোল্ডমুণ্ডের চেহারা এমনই বিবর্ণ দেখাল যে মার্টিন নামে এক মাস্টারমশাই ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন সে অসুস্থ বোধ করছে কি-না। এডল্‌ফ্‌ চোখের ইশারায় তাকে সাবধান করে দেওয়ায় গোল্ডমুণ্ড অস্ফুট স্বরে বলল, 'না, আমি বেশ ভালই আছি।'

দুপুরের দিকে গ্রীক-সাহিত্যের ক্লাসে নরজিসের দৃষ্টি কিন্তু গোল্ডমুণ্ডের উপর থেকে একটুও নড়ল না। নরজিসও বুঝতে পারছে গোল্ডমুণ্ড অসুস্থ। কিন্তু কোনো প্রশ্ন না করে কেবল তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। ক্লাস শেষ হলে অন্য ছাত্রদের দৃষ্টি এড়াবার জন্য লাইব্রেরি-ঘরে

গোল্ডমুণ্ডকে দিয়ে একটি সংবাদ পাঠিয়ে নিজেও তার পিছনে গেল। তার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'গোল্ডমুণ্ড, বল তোমার জন্য কি করতে পারি আমি। মনে হচ্ছে তোমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বোধহয় তুমি অসুস্থ। যদি তাই হয় তাহলে চল তোমাকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিই। আজ ক্লাসে পড়াবার সময় তুমি মোটেই সেদিকে মন দিতে পার নি।' বিবর্ণ গোল্ডমুণ্ড স্তম্ভিত দৃষ্টিতে নরজিসের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নত করল। একটু পরে আবার মাথাটি তুলে কথা বলবার চেষ্টা করতেই তার ঠোঁটদুটি থরথর করে কেঁপে উঠল। কোনো উত্তরই বের হচ্ছে না মুখ দিয়ে। তারপর হঠাৎ একপাশে হেলে পড়ে টেবিলে কপালটি রেখে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। নরজিস কুণ্ঠিত মনে হতবাক হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর তার মুখখানি তুলে তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে দরদ-ভরা স্বরে বলল, 'এই যে, কি হল তোমার? কাঁদছ? আচ্ছা বেশ, কাঁদ। কাঁদলেই তোমার মন অনেকটা হালকা হয়ে যাবে। ......বোস......না, কোনো কথা বলতে হবে না। তুমি কত কষ্ট পেয়েছ এতক্ষণ। সহজ স্বাভাবিক থাকতে হয়তো কত চেষ্টা করেছ পাছে কেউ কিছু বুঝতে পারে, তাই নয়? কি, কান্না শেষ হয়েছে এবার? তাহলে এস আমার সঙ্গে। তোমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসব। চুপচাপ শুয়ে ঘুমাও। কাল ঘুম থেকে জেগে দেখবে তোমার শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে আবার। এস......'।

সবার দৃষ্টি এড়িয়ে নরজিস তাকে মঠের হাসপাতালে এনে ছোট একটা ঘরের শূন্য দুটো বিছানার একটিতে বসিয়ে রেখে মঠের ডাক্তারকে ডেকে আনতে চলে গেল। গোল্ডমুণ্ড স্কুলের পোষাক খুলতে লাগল। একটু পরে নরজিস তার জন্য রান্নাঘর থেকে রোগীর ঝোল আর একপেয়ালা বলকারক পানীয় নিয়ে এসে তাকে খাওয়াল। গোল্ডমুণ্ড বিছানায় শুয়ে শুয়ে সহজ, স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। মঠের বাইরে রাত কাটানর কথাটা ভুলে যাবার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বারবার, প্রতিটি মুহূর্তে। তাদের সেই বিচিত্র দুঃসাহসিক নৈশ অভিযানের সমস্ত ঘটনাই ভুলতে চায় সে। শুধু ভুলতে চায় না রাতের অন্ধকারে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সেদিনের সেই তরুণী মেয়েটির কোমল স্পর্শ, তপ্ত নিশ্বাস, তার টুকরো টুকরো কথা আর ঠোঁটের ওপর দরদভরা তার একটি চুম্বনের রোমাঞ্চকর অনুভূতি। এসবের

সঙ্গে আবার একটি নূতন উপলব্ধির যোজনা হল। নরজিস তাহলে মনে মনে তাকে ভালবেসে ফেলেছে! জ্ঞানী, গুণী, সুন্দর এই তরুণ শিক্ষকটি তাকে তার সমস্ত অন্তর দিয়েই ভালবেসেছে। কিন্তু গোল্ডমুণ্ড বোকার মত তারই সামনে কেঁদে ফেলেছে, লজ্জায় সে একটি কথাও বলতে পারেনি। নরজিস নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে এমন শিশুর মত নির্বোধ ব্যবহার আশা করে নি। নরজিসের দিকে লজ্জায়, সংকোচে সে আর তাকাতে পারবে না বুঝি। কিন্তু তবুও এ কথা সত্য চোখের জলের সঙ্গে অনেক দুঃখ, বেদনা তরল হয়ে বের হয়ে গেছে। মনটা অনেক হালকা হয়েছে।

কিছুক্ষণ পর নরজিস তার এই অসুস্থ ছাত্রকে দেখতে চুপি চুপি ঘরে ঢুকল। গোল্ডমুণ্ড তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বিবর্ণ গালদুটো আবার রক্তাভ হয়ে উঠেছে। নরজিস কৌতূহল-ভরা সাগ্রহ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল স্থির হয়ে। এবারে সব বাধা কেটে গেছে, তারা দুজনে এখন থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পারবে। একদিন হয়তো সে নিজেও এমনি দুর্বল, ক্লান্ত হয়ে ভালবাসতে, সেবা পেতে কাউকে তার একান্ত পাশে কামনা করবে। তার এই প্রিয় ছাত্রটির কাছ থেকেই তখন তা গ্রহণ করবে সে।

তিন

নরজিস আর গোল্ডমুণ্ড—দিনে দিনে এ দুজনের মধ্যে একটা অদ্ভুত হৃদ্যতা গড়ে উঠল। ভাবুক নরজিসকেই প্রথমে গুরু দায়িত্ব বহন করতে হল। প্রতিটি ব্যাপার সে খুঁটিয়ে চিন্তা করতে চায়। ভালবাসার ব্যাপারেও তাই। তাদের এই ভালবাসার প্রেরণা ছিল সে নিজেই। অনেক দিন পর্যন্ত এ দুজনের মধ্যে একমাত্র সে-ই এই ভালবাসার অর্থ, গভীরতা আর পরিধি সম্বন্ধে সচেতন ছিল। আর তাই ভালবাসলেও বহুদিন পর্যন্তই তাদের এই ভালবাসায় সে ছিল একা। কারণ নরজিস বুঝতে পারত যতদিন পর্যন্ত না গোল্ডমুণ্ড নিজেকে ভালভাবে চিনতে পেরেছে ততদিন পর্যন্ত তাদের এ ভালবাসার প্রকৃত অংশীদার হতে পারে না সে। গোল্ডমুণ্ড অবোধ শিশুর [illegible] আনন্দদায়ক এক খেলায় মেতেছে মাত্র। কিন্তু

দায়িত্বশীল ও আত্মসচেতন নরজিস গভীরভাবে চিন্তা করেই এই পরিণতিকে মেনে নিয়েছে।

নরজিসের ভালবাসার স্পর্শ গোল্ডমুণ্ডের মনেও এনে দিয়েছে অনেকখানি শান্তি আর মুক্তি। সে রাতে সেই সুন্দর মেয়েটিকে দেখে আর তার একটিমাত্র চুম্বন-স্পর্শে সে প্রথমবারের মত জেগে উঠেছিল কামনার এক নূতন জগতে। সুপ্ত কামনার এ জাগরণ মনে মনে সে চেয়েও ছিল যেন। কিন্তু তবু কি একটা আঘাতে নিরাশ হয়ে পড়ছে বারবার। রাতের অন্ধকারে জানালার ধারে মেয়েটির চুম্বন আর কাল চোখের আবেশ-ভরা দৃষ্টিই বুঝি-বা তার জীবনের সমস্ত স্বপ্ন, আশা, ব্রহ্মচর্যের প্রতি বিশ্বাস আর নির্ধারিত ভবিষ্যতের মূলে কুঠারাঘাত করবে, এ আশঙ্কায় সে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। পিতৃনির্ধারিত সন্ন্যাস জীবনকে মনেপ্রাণে মেনে নিয়ে কৈশোরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে যখন এক মহান, সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে প্রয়াসী, ঠিক তখন একটিমাত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবনের স্বাভাবিক কামনার উন্মেষকে সে তার পরম শত্রু বলেই মনে করল। স্ত্রীজাতির প্রতি এই দুর্নিবার লোভ আর আকর্ষণই হয়ত হয়ে উঠবে তার গন্তব্য পথে চরম বাধা। নরজিসের অনাবিল বন্ধুত্বই তাকে এক পুষ্পিত উদ্যানের সন্ধান দিয়েছে যেখানে তার বাঞ্ছিত সন্ন্যাস জীবনের নূতন সৌধ গড়ে তুলতে পারবে সে। তার এ অনিন্দ্য প্রেমই হয়ত সর্বনাশা কামনার হাত থেকে তাকে নিয়ে যাবে ত্যাগের মহান পথে।

তবু তাদের বন্ধুত্বের প্রথম পর্যায়ে গোল্ডমুণ্ড নানা অদ্ভুত আর অবাঞ্ছিত বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এ প্রেম তাকে দুলিয়েছে নানা নিরাশার দোলায় আবার কখনও ধরা দিয়েছে তার অবাস্তব আর ভয়াবহ দাবী নিয়ে। তার মতে পরস্পরের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর ঐকান্তিক অনুরাগই তাদের সমস্ত বৈসাদৃশ্য আর বিরোধকে মিটিয়ে দুজনকে এক করে দিতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে নরজিসের মত খুবই দৃঢ় ও কঠোর, স্পষ্ট আর অনমনীয়। তার কাছে নিরীহ সহজিয়া প্রেম কামনার জগতে একটা অর্থহীন সুখকর পরিভ্রমণ মাত্র। আর তাই সে কখনও তা চায় না। এরকম উদ্দেশ্যবিহীন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণে আনন্দ থাকলেও কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না বলেই সে তা অস্বীকার করে।

গোল্ডমুণ্ডের যথার্থ মূল্য নরজিস ভালভাবেই যাচাই করতে পেরেছে।

ছেলেটির সতেজ সৌন্দর্য, তার প্রকৃতি, জীবনের আদর্শ আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও নরজিস একেবারে অজ্ঞ ছিল না। এই কিশোরটিকে গ্রীক-দর্শনে পারদর্শী করে তুলতে বা ভালবাসার প্রতি তার সরল বিশ্বাসকে নিয়ে কোনো বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে অকারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করতে চায়না সে। সুদর্শন এই কিশোরটিকে সে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসে ফেলেছে। তবুও গোল্ডমুণ্ডকে মঠের আধ্যাত্মিক জীবনের উপযুক্ত বলে নরজিস মনে করেনা। মানুষের অন্তরের সত্যরূপ দেখবার ক্ষমতা নরজিসের অনেকের চাইতেই বেশি এবং তার এই একান্ত প্রিয়জনের অন্তরকে সে তো দ্বিগুণ অনুভূতি ও উপলব্ধি দিয়ে স্পষ্ট করেই জেনেছে। তাদের দুজনের মাঝে বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও গোল্ডমুণ্ডের প্রকৃতিকে গভীরভাবে অনুধাবন করে সম্পূর্ণ রূপে বুঝতে পেরেছে সে। নরজিস দেখল গোল্ডমুণ্ডের প্রকৃতি আর চিন্তাধারা বিশেষ ভাবে মোহাচ্ছন্ন। তার মনের অলীক কল্পনা, প্রাথমিক শিক্ষা আর শৈশবে লালন পালনে ত্রুটি এবং তার বাবার কাছে শোনা অনেক কথাই এজন্য দায়ী। আর একারণেই বহুদিন আগে এই কিশোরটির স্বাভাবিক গোপন মনোবৃত্তিগুলি অনাবৃত হয়ে পড়েছে নরজিসের কাছে। এ ব্যাপারে তাই তার কর্তব্য সুস্পষ্ট —গোল্ডমুণ্ডের হৃদয়কে মোহমুক্ত করে চিনিয়ে দিতে হবে তার গোপন সব মনোবৃত্তিকে, ফিরিয়ে আনতে হবে তাকে তার স্বাভাবিক প্রকৃতিতে।

গোল্ডমুণ্ডকে মোহমুক্ত করার প্রচেষ্টায় নরজিস প্রথমেই জানতে চাইল কেন সে সে-দিন হঠাৎ অসুস্থ হয়েছিল আর নরজিস তার কাছে যাওয়া মাত্র কেনই-বা সে অমন করে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। কাজটা কষ্টসাধ্য মনে হলেও বেশ সহজেই হয়ে গেল। সে রাতের কাহিনীর একটা স্পষ্ট স্বীকারোক্তির তাগিদ গোল্ডমুণ্ড মনে মনে অনুভব করছে অনেকদিন থেকেই, আর মহান্ত ড্যানিয়েল ছাড়া কাউকেই এ ব্যাপারে সে বিশ্বাস করতে পারে-না। কিন্তু তিনি তো তার স্বীকারোক্তি শুনবেন না। তাই নরজিস সুযোগ বুঝে তাদের প্রথম বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে অতি সন্তর্পণে তার সে-দিনের বেদনার কারণ জানতে চাইলে কোনো কথা গোপন না করেই গোল্ডমুণ্ড তার সব প্রশ্নের জবাব দিল।

তাকে যাচাই করে নেবার জন্যই নরজিস বলতে শুরু করল, 'আচ্ছা, যে-দিন সকালে তুমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে, সে-দিনটির কথা হয়তো তোমার মনে আছে। আর তা ভুলবেই বা কেমন করে? সে-দিনই যে

আমরা বন্ধু হয়ে পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলাম। আমি তো প্রায়ই সে-দিনটির কথা ভাবি। তুমি হয়তো ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধি করতে পার নি, কিন্তু আমি সে-দিন বড় অসহায় বোধ করছিলাম।'

'তুমি অসহায় বোধ করেছিলে!' খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে গোল্ডমুণ্ড উত্তর দিল, 'অসহায় তো ছিলাম সে-দিন আমি। রুদ্ধনিশ্বাসে সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত না পেরে শিশুর মতই আকুল হয়ে কেঁদে উঠেছিলাম। ওঃ, আজও সে কথা মনে পড়লে খুবই লজ্জা হয় আমার। তোমাকে আবার কোনো দিন মুখ দেখাতে পারব বলে ভাবি নি। আমার সেই করুণ অবস্থা তুমি দেখে ফেলেছ, আজ এ কথা ভাবতেও কেমন লাগে!'

নরজিস খুব সন্তর্পণে অগ্রসর হল। বলল, 'হাঁ, তুমি সেদিন লজ্জিত হয়েছিলে তা বুঝতে পেরেছি। তোমার মত সুন্দর, সাহসী ছেলে তার বন্ধুর সামনে, শুধু বন্ধুই নয়, তার শিক্ষকের সামনে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে কাঁদবে এ কথা ভাবাই যায় না যেন। তোমার পক্ষে তা শোভাও পায় না। তাই তোমাকে আমি তখন অসুস্থই ভাবলাম। কিন্তু সে-দিন সর্বক্ষণই তুমি অসুস্থ ছিলে না। মনে হচ্ছে সে-দিন অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছিল। সত্যিই কি তাই?'

তক্ষুণি গোল্ডমুণ্ড কোনো উত্তর দিতে পারল না। পরে ধীরে ধীরে বলল, 'হাঁ, অসাধারণ একটা কিছু ঘটেছিল বৈকি। তাহলে তোমাকেই আমার সব কথা শোনাতে চাই।'

নতদৃষ্টি হয়ে সে-রাতের কাহিনী গোল্ডমুণ্ড তার বন্ধুকে বর্ণনা করলে স্মিত হেসে নরজিস উত্তর করল, 'হাঁ, গাঁয়ে যাওয়া সত্যিই নিষিদ্ধ। কিন্তু অনেক নিষিদ্ধ কাজই তো করে থাকি আমরা। আবার অনেক সময় স্বীকারোক্তি দ্বারা নিজেকে অপরাধমুক্ত ভেবে অন্যায়কে নিঃশেষে ভুলেও যাই। তাই অন্যান্য বিদ্যার্থীদের মত তুমিই-বা কেন এমন ছোটখাট উচ্ছৃঙ্খলতা করবে না? এটা কী এমন দূষণীয়!'

গোল্ডমুণ্ড রেগে উঠে অনর্গল বাক্যবাণ ছুঁড়তে শুরু করল এবার। 'গাঁয়ে কি ঘটে না ঘটে তুমি তা ভাল করেই জান। বাস্তবিকপক্ষে মঠের কয়েকটি ছোট খাট নিয়মভঙ্গ করা এবং কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে বাইরে পালিয়ে যাওয়া আমিও এমন কিছু অন্যায় মনে করি না। যদিও সন্ন্যাসজীবনের প্রস্তুতির পক্ষে এগুলিও বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে।'

নরজিস তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠল, 'জান, অনেক বড় বড় ঋষির জীবনেও এমন সব বে-আইনী ঘটনার প্রয়োজন হয়েছে! শোন নি কি ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবনও অনেক সময় মানুষকে পবিত্রতার দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে?'

'শুনেছি বৈকি, অনেক শুনেছি', আত্মরক্ষার সুরে বলল গোল্ডমুণ্ড, 'আমি বলতে চেয়েছি সে-দিন যে জন্য আমি কেঁদে ফেলেছিলাম তা বে-আইনীভাবে মঠ থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়, অন্য কিছু,—সেই মেয়েটিই এর কারণ, সেটা এমন একটা অনুভূতি যা তোমাকে কোনো দিনই ভাষা দিয়ে স্পষ্ট করে বুঝাতে পারব না। মনে হয়েছে যদি একবার সেই মোহের ফাঁদে পা দিয়ে মেয়েটির দিকে হাত বাড়াই তাহলেই আর আমি এখানে ফিরে আসতে পারব না, তলিয়ে যাব নরকের অতল তলে যেখান থেকে আর কোনো দিনই আমার মুক্তি সম্ভব নয়। মনে হয়েছে সেখানেই বুঝি আমার সুন্দর স্বপ্ন, নৈতিক চরিত্র, ভগবৎপ্রেম আর তাঁর অপার মহিমার চিরসমাপ্তি ঘটবে।'

চিন্তিতভাবে নরজিস মাথা নাড়ল। তারপর ধীর-গম্ভীর স্বরে বলতে লাগল, 'ভগবৎপ্রেম আর নৈতিক চরিত্রের প্রতি আমাদের বিশ্বাস এক জিনিস নয় গোল্ডমুণ্ড। এ ব্যাপারটা কি এতই সহজ? লিপিবদ্ধ থাকায় নৈতিক বিধানগুলি আমরা জানতে পারি। কিন্তু কেবল লিপিবদ্ধ নৈতিক বিধানের মধ্যেই ভগবান নেই। এই অনুশাসনগুলি তাঁর সামান্যতম অংশ মাত্র। প্রতিটি অনুশাসন মেনে চললেও আমরা অনেক সময়েই তাঁর কাছ থেকে বহু দূরে থেকে যাই।'

'কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ না আমি কি বলতে চাইছি?'

'খুবই বুঝতে পেরেছি। স্ত্রীলোকের সংসর্গ আর সকাম প্রেমকে নেহাতই জাগতিক ব্যাপার ধরে নিয়ে পাপ বলে মনে কর তুমি। এ দুটি ছাড়া আর যে-কোনো পাপই যেন করতে পার অথবা করলেও অতটা নিচে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা নেই তোমার। তাছাড়া স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তও চলে অন্য যে-কোনো পাপের, এই তো তোমার ধারণা।'

'হাঁ, তাই আমার বিশ্বাস।'

'তাহলে দেখছ, আমি তোমাকে খুবই বুঝতে পেরেছি। আর এ ব্যাপারে তোমার ধারণাও সবটাই ভুল নয়। মাতা ঈভ আর তাঁর সাপের কাহিনী নিছক গল্পমাত্র নয়। তবু বলব তোমার এ বিশ্বাস খুবই ভুল। আজ যদি তুমি ড্যানিয়েলের মত মহান্ত বা সেণ্ট ক্রিসসৃটমের মত সিদ্ধ পুরুষ হতে

অথবা একজন ধর্মযাজক বা পুরোহিত হতে এমনকি একজন অতিসাধারণ সন্ন্যাসী হলেও তোমার এ বিশ্বাস সত্য হত। কিন্তু এখনও তুমি এঁদের কেউই হতে পার নি। বর্তমানে তুমি একজন নবীন বিদ্যার্থী মাত্র। মঠে জীবন কাটানর ইচ্ছা তোমার মনে মনে থাকলেও অথবা এ তোমার বাবার একান্ত ইচ্ছা হলেও তুমি দীক্ষিত হয়ে কোনো শপথ গ্রহণ কর নি এখন পর্যন্ত। তাই এ সময়ে কোনো সুন্দরী তরুণীর প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে বিপথে পা বাড়ালেও মঠের পবিত্রতা নষ্ট করে সত্যভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হবে না।'

'কোনো লিখিত শপথ নয়,' গোল্ডমুণ্ড তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, 'আমার নিজের কাছে গ্রহণ করা শপথ অলিখিত হলেও পবিত্রতম। তুমি বুঝতে পারছ না কি অনেকের কাছেই যা একান্ত বৈধ আমার কাছে তা এখনও অবৈধ! তুমি নিজেও তো দীক্ষিত হও নি এখন পর্যন্ত। ব্রহ্মচারীর পবিত্র জীবন বরণ করে নিতে তুমিও কোনো শপথ গ্রহণ কর নি, তবু তো কোনো কুমারীকে কখনও স্পর্শ করবে না তুমি। ঠিক বলছি না কি? তোমাকে দেখে যা মনে হয় তা তোমার সত্যরূপ নয় কি? আমার ধারণা কি তাহলে ভুল? প্রকাশ্যে গুরুভাইদের এবং আচার্যদের কাছে শপথ গ্রহণ না করলেও অনেক দিন আগেই তুমি কি আপন অন্তরে অন্তরে কোনো শপথ গ্রহণ করনি? আর সেই শপথ দ্বারাই কি তুমি চিরদিনের মত নিজেকে একটা নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ মনে কর না? তুমি কি তাহলে আমার মত নও?'

'না গোল্ডমুণ্ড, আমি তোমার মত নই। তুমি যা কল্পনা কর আমি তাও নই। আমিও নীরবে শপথ গ্রহণ করেছি সত্য। এ বিষয়ে তোমার ধারণা নির্ভুল। কিন্তু অন্য কোনো দিক থেকেই আমি তোমার মত নই। আজ তোমাকে একটা কথা বলব যে-কথা একদিন না একদিন তুমি মনে করবে বলেই আমার বিশ্বাস। সেটা হল, তোমার বন্ধুর সঙ্গে কতখানি পার্থক্য তোমার, তা তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়াই আমাদের এই বন্ধুত্বের একমাত্র অর্থ ও উদ্দেশ্য।'

গোল্ডমুণ্ড হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নরজিসের চোখের দৃষ্টি আর গলার স্বর, কোনোটাই যেন সে সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু নরজিস কেনই-বা এমন সব কথা বলছে? নরজিসের অনুক্ত শপথ তার শপথের চাইতেও কেন অনেক বেশি অলঙ্ঘ্য? সে কি তাকে শিশু ভেবে কৌতুক করছে?

তাদের এই বিচিত্র বন্ধনের সমস্ত জটিলতা আর বিষণ্ণতা আবার গোল্ডমুণ্ডকে গ্রাস করে ফেলল।

গোল্ডমুণ্ডের প্রকৃতির গোপন রহস্য জানতে এতটুকুও বাকি নেই নরজিসের। চিরন্তন মাতা ঈভের প্রলোভনই লুকিয়ে আছে তার অন্তরে। আনন্দোচ্ছল, সুন্দর, অদ্ভুত জীবনীশক্তিসম্পন্ন ও উচ্চাভিলাষী এই কিশোরটি কি করে এমন তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হল? নিশ্চয়ই কোনো দানব তার মাঝে বাসা বেঁধেছে। আর এই গুপ্ত পিশাচই তাকে দ্বিধাবিভক্ত করে তার নির্মল স্বাভাবিক সত্ত্বার বিরুদ্ধে পরিচালনা করছে। এই পিশাচকেই বশীভূত করতে হবে এবং তার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে হবে সবার কাছে। আর তা করতে পারলেই গোল্ডমুণ্ডকে জয় করাও সম্ভব হবে একদিন।

নরজিসের সঙ্গে গোল্ডমুণ্ডের বন্ধুত্ব কাউকেই খুসী করেনি। নিন্দুকরা এই বন্ধুত্বকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ অন্যায় বলে কলঙ্ক রটাতে লাগল। এমনকি যারা এর মধ্যে কোনো অন্যায়ের আভাস দেখতে পেল না তারাও যেন নিন্দুকদেরই সমর্থন করল। কেউই তাদের এই বন্ধুত্ব মেনে নিতে রাজী নয়। তারা বলতে চায় এই নিবিড় হৃদ্যতা মঠের সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে তাদের দুজনকেই দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। আর তাই মঠের ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশা করার উপযুক্ত নয় তারা। তাদের প্রকৃতি আর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে সমাজ বিরোধী এবং মঠের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, এমনকি ধর্মবিরুদ্ধও।

এই দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ক্রমে মহান্ত ড্যানিয়েলের কানেও পৌঁছুল। চল্লিশ বছরেরও ওপর এই মঠে থেকে তরুণদের অনেক বন্ধুত্বই লক্ষ্য করেছেন তিনি। আশ্রমের সাধারণ জীবনধারার অঙ্গীভূত এ ধরনের বন্ধুত্ব কখনও উপহাসাস্পদ আবার কখনও বা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না করে দূর থেকে তিনি তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। বিদ্যায় আর বুদ্ধিতে যে তরুণ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, যাকে অন্যসকল শিক্ষক-সন্ন্যাসীই তাদের সমপর্যায়ের এমন কি তাদের চেয়ে উঁচুতেই মনে করে, সেই নরজিসকে তার শিক্ষণব্রতের নির্বাচিত পথ-চলায় বাধা দেওয়া উচিত হবে কি? নরজিস আগের মতই সুন্দর ভাবে না পড়ালে কিংবা তাদের এই বন্ধুত্ব তাকে অলস, অকর্মণ্য করে তুললে মহান্ত সেই মুহূর্তে তাদের দুজনকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই আনা যায় না। সবই কেবল গুজব আর তার

প্রতি ঈর্ষাপরায়ণের অবিশ্বাস মাত্র। তাছাড়া অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে সুনিশ্চিত-ভাবে মানবচরিত্র অনুধাবনে নরজিসের অদ্ভুত ক্ষমতাসম্বন্ধে মহান্ত ড্যানিয়েল বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। তাই মহান্ত স্থির করলেন কোনো প্রকার অবিশ্বাসকে নিজের মাঝে সংক্রামিত হতে দেবেন না তিনি।

গোল্ডমুণ্ডকে নিয়ে নরজিস অনেক ভেবেছে। সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন এই তরুণটি যেন শিল্পী হয়েই জন্মেছে। ফুলের গন্ধে, প্রভাতসূর্যের আলোয় ও পশুপাখির সৌন্দর্যে, আর সঙ্গীত সুধায় ডুবে থেকে যে অনায়াসেই আনন্দ লাভ করতে পারত সে কেন ধর্মযাজক আর সন্ন্যাসীর জীবনগ্রহণে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল? গোল্ডমুণ্ডের বাবা কিভাবে তাঁর ছেলেকে এ উদ্দেশ্যে উৎসাহিত করেছেন তাও সে জানে। কিন্তু সত্যিকারের একটা ইচ্ছাকে তিনি তার মধ্যে সৃষ্টি করতে পেরেছেন কি? ছেলেকে কি এমন যাদু করলেন তিনি যার জন্য এ বৃত্তি গ্রহণ করাকেই সে তার জীবনের কর্তব্য বলে বিশ্বাস করল? আর এ কি ধরনের মানুষ তার বাবা? অনেক সময় ইচ্ছা করেই তার বাবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে গোল্ডমুণ্ডও তার কথা কত বলেছে, কিন্তু তবুও নরজিস এই লোকটির স্পষ্ট কোনো রূপ কল্পনা করতে পারেনি, তাঁকে বুঝতেও পারেনি। এটা একটা অস্বাভাবিক আর সন্দেহজনক ব্যাপার নয় কি? গোল্ডমুণ্ড যখন ছেলেবেলাকার মাছ ধরার গল্প বলে, ভাষায় প্রজাপতির রূপ ফুটিয়ে তোলে, পাখির ডাক অনুকরণ করে, কোনো বন্ধু, কুকুর বা ভিখারীর গল্প শোনায় তখন সমস্ত কিছুই যেন চোখের সামনে প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। কিন্তু যখন সে তার বাবার কথা বলে তখন এ-রকম কোনো ছবিই ফুটে ওঠে না। বাস্তবিকই যদি তার বাবা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও ক্ষমতাবান হতেন এবং ছেলে-বেলায় তার ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন তাহলে গোল্ডমুণ্ড হয়তো অনেক সুন্দর করে তার বাবার বর্ণনা দিয়ে তাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারত। নরজিস অবশ্য গোল্ডমুণ্ডের বাবাকে তেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি। এই সৈনিক পুরুষটি তার অসন্তোষই জাগিয়ে তুলেছে। এমনকি প্রকৃতপক্ষে তিনিই গোল্ডমুণ্ডের বাবা কি-না এ সম্বন্ধেও সন্দিহান হয়েছে সে এক-একসময়। লোকটা একটি শূন্যগর্ভ মূর্তি মাত্র। কিন্তু তবু কোথা থেকে তিনি এমন ক্ষমতা অর্জন করে ছেলের অন্তর বিজাতীয় সব স্বপ্নে ভরে তুলেছেন, ভাবলে অবাক হতে হয়।

গোল্ডমুণ্ডও প্রায়ই নরজিসের কথা ভাবে। বন্ধুর গভীর ভালবাসায় সুনিশ্চিত হলেও নরজিস তাকে নিতান্তই ছেলেমানুষ মনে করে এরকম একটা বিরক্তিকর সন্দেহ তার মনে মনে ছিল। তারা একে অপর থেকে ভিন্ন প্রকৃতির একথা তাকে সর্বদা মনে করিয়ে দেওয়ারই-বা কি অর্থ হতে পারে? যাই হক —কেবল চিন্তার চেয়ে কাজ অনেক ভাল। আর কোনো কিছু নিয়ে কেবলই চিন্তা করা তার স্বভাবও নয়। দীর্ঘ সুন্দর দিনগুলি ভরিয়ে তুলতে অনেক কিছুই করার রয়েছে।

জাঁতাকলের মালিক ও তার ছেলে,—আশ্রমবাসী এই দুটি সাধারণ লোক গোল্ডমুণ্ডকে খুবই ভালবাসে। তাদেরই সঙ্গে সে ঝরনার ধারে ধারে ভোঁদড় তাড়া করে বেড়ায়, আবার কখনও একত্র বসে সুস্বাদু রুটি সেঁকে। বেশির ভাগ সময় নরজিসের সঙ্গে কাটালেও সে এভাবে তার অনেক পুরানো আনন্দ আর অভ্যাসকে নূতন করে উপভোগ করতে লাগল।

মঠের প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলি তার খুবই ভাল লাগে। বিদ্যার্থীদের সমবেত সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করতে তার কত-না আনন্দ। পাশের একটি বেদীতে বসে জপ করতেও ভালবাসে সে, চার্চের গুরুগম্ভীর প্রার্থনা শুনতে শুনতে ধূপধুনার ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে বসবার চত্বরের খিলানের বরাবর মহাপুরুষদের নিথর, নিস্পন্দ মূর্তি আর তাঁদের অলংকার ও সাজসজ্জার দ্যুতির দিকে সে অপলক তাকিয়ে থাকে। মূর্তিগুলি যেন তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। পাথরের ও কাঠের এই প্রতিকৃতিগুলির সঙ্গে কোথায় বুঝি তার মনের একটা গোপন মিল রয়েছে। সংস্কার বশেই এই মূর্তিগুলিকে অমর ও সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ বলে ধরে নিয়ে তার জীবনের পথ-প্রদর্শক, পালক ও রক্ষক মনে করতে ইচ্ছা হয় তার! গাছপালা আর পশুপক্ষী মুখরিত প্রাকৃতিক জগৎ ছাড়াও যে এখানে মানুষেরই সৃষ্টি প্রস্তরমূর্তির মাঝে এমন নীরব বিচিত্র জীবন রয়েছে, এটা তার কাছে এক গভীর ও অমূল্য গোপন তথ্য। প্রায়ই সে ছবি এঁকে অবসর সময় কাটায়। মঠের উপাসনা সঙ্গীতগুলিও তার বড় প্রিয়। মূর্তিগুলির কাছেই সে আত্মসমর্পণ করেছে আর প্রার্থনা-সঙ্গীতের শব্দময় সুরের পিয়াসী তার অন্তর।

মাঝে মাঝেই সে তার সহপাঠীদের সঙ্গে বিরোধ ভুলে গিয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার চেষ্টা করত। বেশিদিন একটা নির্লিপ্ত, বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশে থাকা বিরক্তিকর আর বিড়ম্বনা বলে মনে হত তার। তাই সে স্কুলে কোনো

একগুঁয়ে গম্ভীর সঙ্গীকে হাসাত, রাতে শোবার হলঘরে কোনো নীরব সহপাঠীকে গল্প করতে বাধ্য করত। তাদের ভালবাসা পাবার জন্য একত্রে একটানা ঘুরে বেড়াত কখনও। আর এভাবেই কয়েকজনের মন জয় করে ফেলল সে। তার এইভাবে যেচে বন্ধুত্ব করার প্রতিদান হিসাবে দু-দুবার তার কাছে সেই গাঁয়ে যাবার প্রস্তাব করা হল। ভয় পেয়ে সে আবার নিজেকে গুটিয়ে নিল। না, আর সে কখনও গাঁয়ে যাবে না। কালচুলের সেই মেয়েটিকে অনেক চেষ্টা করে সে ভুলতে পেরেছে। এখন খুব কমই তার কথা ভাবে। একদিন হয়তো একেবারেই ভুলে যাবে তাকে।

চার

তাদের দুজনের আলাপ আলোচনায় গোল্ডমুণ্ড তার বাড়ির কোনো স্পষ্ট ছাব নরজিসের চোখের সামনে তুলে ধরেনি, মঠে আসবার আগেকার ফেলে-আসা জীবনের কোনো কথাই তাকে বলে নি। বাবাকে সে শ্রদ্ধা করলেও তার ভাষায় বাবার অস্পষ্ট রূপই ফুটে উঠেছে। অনেককাল আগে তার মৃত, বিস্মৃত মায়ের রহস্যঘন কাহিনী শুনিয়েছে সে কিন্তু তার স্মৃতিতে মায়ের বিস্মৃতপ্রায় নামটি ছাড়া আর কোনো কিছুই আজ জড়িয়ে নেই।

লোক-চরিত্র-অভিজ্ঞ নরজিস দিনে দিনে বুঝতে পেরেছে জীবন-পথে চলতে চলতে জীবনের কোনো কোনো অংশ নিঃশেষে হারিয়ে ফেলে যারা, গোল্ডমুণ্ড তাদেরই দলে। হয়তো বা কোনো প্রয়োজনের তাগিদে কিংবা কোনো যাদুমন্ত্রবলে অতীতের বিশেষ কোনো ঘটনা তারা চিন্তাও করতে পারে না। নরজিস বুঝতে পারল উপদেশ দিয়ে বা প্রশ্ন করে কোনো লাভই হবে না। যুক্তিতর্কের ক্ষমতায় অতিরিক্ত আস্থা রেখে এতদিন সে অকারণে অনেক বৃথা বাক্যব্যয় করে এসেছে। কিন্তু গোল্ডমুণ্ডের প্রতি তার ভালবাসা, তাদের দুজনের একত্রে থাকবার অভ্যাস, কোনোটাই ব্যর্থ হয়নি। তারা অনেক সময়েই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও একে অপরের সাহচর্য থেকে অনেক কিছু শিখেছে। যুক্তিবহ ভাষা ছাড়াও ধীরে ধীরে তাদের দুজনের মধ্যে অন্য আর একটা ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, অন্তর দিয়ে অন্তরকে স্পর্শ করবার ভাষা সেটা।

তারা দুজনে একত্রে বসে কত কথা বলেছে। গোল্ডমুণ্ডের মনের কথা স্পষ্ট ছবির মত করে ফুটিয়ে তোলবার বিচিত্র ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে তার বন্ধুর ভাবনা-কল্পনাকেও এমনভাবে প্রভাবিত করল যে নরজিস নীরবে আপন অন্তরকে অনুভব করতে শিখল। গোল্ডমুণ্ডের স্বভাব ও অনুভূতিপ্রবণতাকেও বিশ্লেষণ করতে জানল। এভাবে ধীরে ধীরে দুটি অন্তরের মাঝখানে একটা ভালবাসার সেতু গড়ে উঠল, মনের ভাষাও সেই সেতুকে কেন্দ্র করে প্রকাশ হবার পথ পেল খুঁজে। আর তাই শেষ পর্যন্ত একদিন এক উৎসবদিনে তারা দুজন যখন পাঠাগারে বসেছিল তখন তাদের মধ্যে হঠাৎ যে প্রসঙ্গের অবতারণা হল সেটাই তাদের বন্ধুত্বের মর্ম ও গভীরতা উদ্ঘাটন করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনধারাকে যেন আলোকিত করে দিল একনিমেষে।

তারা জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করছিল। মঠে এই বিজ্ঞানটির চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। বিচিত্র মানবজীবনের বিভিন্নতাকে, নির্দিষ্ট চরিত্র ও ভাগ্যকে একটা বিশেষ ছকে ফেলে বিশ্লেষণ করতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা, নরজিস সে কথাই বলছিল। গোল্ডমুণ্ড ঠিক তখনই উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'তুমি কেবলই বিভিন্নতার কথা বল। এটা তোমার একটা বিশেষ খেয়াল। আমাদের দু জনের মধ্যে বিরাট একটা পার্থক্য রয়ে গেছে, তোমার এই বদ্ধমূল ধারণাকে একেবারে নিরর্থক বলে মনে করি আমি। এ শুধু বিভিন্নতা দেখবার, পার্থক্য খুঁজে বের করবার জন্য তোমার মনের বিচিত্র এক আকাঙ্ক্ষা।'

নরজিস বলল, 'ঠিক কথাই বলেছ। আমিও এ কথাই বলতে চাই। তোমার কাছে বিভিন্নতার, পার্থক্যের কোনো মূল্য না থাকলেও আমার কাছে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃত শিক্ষার্থীর স্বভাব আর বিজ্ঞানই আমার শিক্ষণীয় বিষয়। এই বিজ্ঞান তোমার ভাষায় বলতে গেলে সত্যিই 'বিভিন্নতা, পার্থক্যের জন্য মনের বিচিত্র এক আকাঙ্ক্ষা' ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মর্মকে এছাড়া অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবও নয়। বিজ্ঞানপিপাসুদের কাছে এই বিভিন্নতার সংজ্ঞা নিরূপণ করাটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে কি বিশেষত্ব রয়েছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। আর এভাবেই প্রত্যেকটি মানুষকে জানা যাবে।'

গোল্ডমুণ্ড বলল, 'কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? একজন চাষার জুতো দেখেই বোঝা যায় সে চাষা আর রাজা মুকুট মাথায় আছে বলেই রাজা। তোমার মতে এই তো পার্থক্য। কিন্তু এই পার্থক্য তো শিশুরাও বুঝতে পারে। এজন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।'

নরজিস বলল, 'তবুও চাষা ও রাজা যখন একই রকম পোশাক পরবে তখন শিশুরাও বুঝতে পারবে না তাদের পার্থক্য।'

গোল্ডমুণ্ড বলল, 'তখন বিজ্ঞানও তা বুঝতে পারবে না।'

নরজিস বলল, 'হয়ত বিজ্ঞান তা পারবে। অবশ্য স্বীকার করছি শিশুর চাইতে বিজ্ঞান বেশি বোঝে না। কিন্তু বিজ্ঞান অনেক বেশি ধৈর্যশীল। অনেক সুন্দরভাবে স্পষ্ট করে পার্থক্যকে বিজ্ঞানের সাহায্যে ঠিক জানা যাবে।'

গোল্ডমুণ্ড বলল, 'আর প্রত্যেক বুদ্ধিমান শিশুও তা বুঝতে পারে। অভিজাত ভাবভঙ্গি আর দৃষ্টি দেখেই সে প্রকৃত রাজাকে চিনতে পারে। কিন্তু সে কথা থাক। সত্য কথা বলতে কি, তোমার মত বিদ্যার্থীরা বড় দাম্ভিক।'

নরজিস বলল, 'আমি যখন আমাদের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলি তখন প্রতিভা বা বুদ্ধি ও ছল-চাতুরির বিভিন্নতার প্রসঙ্গ তুলি না।' আমি এ কথা বলি না, 'তুমি অনেক বেশি বুদ্ধিমান বা তুমি আমার চাইতে অনেক ভাল বা মন্দ।' আমি শুধু বলি, 'তুমি তুমিই, তুমি আমি নয়।'

গোল্ডমুণ্ড বলল এবার, 'কিন্তু আমাদের একই লক্ষ্য—চিরন্তন সুখ বা আনন্দের সাধনা। আমাদের সংকল্পও একই—ঈশ্বরকে জীবনে লাভ করা, সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করা।'

নরজিস বলল, 'উপদেশ ও নীতির বইয়ে একজন মানুষ অন্য আরেক-জন মানুষেরই মত, একথা সত্য। কিন্তু বাস্তব জীবনে এই সত্য খাটে না।'

গোল্ডমুণ্ড বলল, 'তুমি বড় কূটতার্কিক নরজিস। এভাবে চললে আমাদের দুজনে কোন দিনই মিল খুঁজে পাব না'।

নরজিস বলল, 'আমরা দুজনে একত্রে মিলতে পারি এমন কোন পথ আমাদের সামনে নেই গোল্ডমুণ্ড।'

'এমন কথা বোলো না, নরজিস।'

'এটাই আমার একমাত্র কথা, প্রাণের সহজ সত্য কথা, বন্ধু। একই পথে একসঙ্গে চলতে চাওয়া আমাদের উচিত নয়। সূর্য আর চন্দ্র, সাগর ও সৈকতের পথ যেমন এক হতে পারে না, এও ঠিক তেমনি। এক হওয়া আমাদের নিয়তি নয়। একে অন্যের পার্থক্যকে মেনে নিয়ে পরস্পরকে বুঝতে পেরে, যথাযোগ্য সম্মান করে যার যার নির্দিষ্ট জীবনপথে এগিয়ে চলতে হবে শুধু আপন পূর্ণতাকে অর্জন করবার জন্য।'

গোল্ডমুণ্ড তর্কে পরাজিত হয়ে বিষণ্ন মুখে মাথা নত করে রইল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'একারণেই বুঝি তুমি আমার চিন্তাধারাগুলিকে ব্যঙ্গ কর?'

নরজিস তখনই কোন উত্তর দিতে পারল না। তারপর স্পষ্ট, কঠিন স্বরে বলল, 'হাঁ, তাই। তোমার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত জীবনীশক্তি রয়েছে তাকেই আমি সত্য বলে মনে করি।'

গোল্ডমুণ্ড ম্লান হেসে বলল, 'আমি জানি আমাকে তুমি সর্বদাই শিশুর মত মনে কর।'

নরজিস তেমনি অনমনীয় স্বরে বলল, 'তোমার কোনো কোনো ভাবনাকে শিশুর ভাবনা বলেই মনে হয়।'

গোল্ডমুণ্ড অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, 'আমার ঈশ্বরপ্রেম, পড়াশোনায় উন্নতি করবার অদম্য আগ্রহ, সন্ন্যাসী হবার কামনা—সবকিছুকেই তুমি শিশুর প্রলাপ বলে ভাব।'

নরজিস গম্ভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'শোন, আমি মাত্র একটি বিষয়ে তোমার চাইতে বড়। আমি নিজেকে জেনেছি, আমি জেগেছি। কিন্তু তুমি এখনও সম্পূর্ণভাবে জাগনি। মাঝে মাঝে তোমার সমস্ত জীবনটাকে একটা স্বপ্ন বলেই মনে হয় তোমার। আমার মতে যে লোক জেগেছে সে তার বিবেক, জ্ঞান, বুদ্ধি আর সমস্ত সত্তা দিয়ে আপন অন্তরের গভীর অদম্য অন্তর্নিহিত শক্তিকে জানতে পারে; মনের সকল কামনাবাসনা দুর্বলতাকে জেনে সেগুলিকে জয় করবার ক্ষমতাও রাখে সে। তোমার মধ্যে তোমার স্বভাব আর মেধা, আত্মজ্ঞান ও স্বপ্নাবেশ একে অন্যের থেকে অনেক বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে গোল্ডমুণ্ড। তুমি তোমার শৈশবকে ভুলে গেছ। কিন্তু তোমার মনের একান্ত গভীরে তোমার শৈশব এখনও তোমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই আর নয় বন্ধু, এবার জাগ, নিজেকে জান। এই দিকে আমি তোমার চাইতে বড়। তাই আমার সাহায্যে তুমি জেগে ওঠ শুধু। অন্য

সব বিষয়ে তুমি আমারই মত, এমনকি নিজেকে জানতে পারলে আমার চাইতে একদিন অনেক বড়ও হবে তুমি।'

গোল্ডমুণ্ড সাগ্রহে তার কথা শুনছিল এতক্ষণ। কিন্তু, 'তুমি তোমার শৈশবকে ভুলে গেছ,' নরজিসের এই একটি কথায় চমকে উঠল সে। একটা তীর অতর্কিতে যেন তার বুকে এসে বিঁধেছে। অভ্যাসমত নরজিস কখনো নিমীলিত হয়ে কখনো আনমনে দূরের দিকে চেয়ে কথা বলছিল বলে এসব কিছুই তার চোখে পড়ল না। গোল্ডমুণ্ডের মুখখানি ম্লান, বিবর্ণ হয়ে গেল, তার ঠোঁটদুটি থরথর করে কাঁপতে লাগল, এ সব কিছুই নরজিসের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। গোল্ডমুণ্ড অস্ফুট, স্খলিত স্বরে বলল এবার, 'আমি······ আমি······তোমার চাইতে বড হব আমি?' মুখ দিয়ে এই কথাটি কোনো-রকমে বের হলেও তার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে।

নরজিস বলল, 'হাঁ, ভাবপ্রবণ, স্বপ্নালু, প্রেমিক এবং কবিরা আমার মত বুদ্ধিজীবী লোকদের চাইতে অনেক বিষয়ে অনেক বড। তোমার মাঝে তোমারই মায়েব প্রভাব রয়েছে। তুমি পরিপূর্ণভাবে বাঁচবার জন্যই জন্মেছ। সমস্ত সত্তা দিয়ে জীবনকে ভালবেসে, জীবনকে জেনে তাকে উপভোগ করবে তুমি। আমার জীবন নীরস, নিরানন্দ আর তোমার জীবন সুন্দর, আনন্দময়। তুমি এই মাটির পৃথিবীর সহজ মানুষ। তুমি কবি, আমি চিন্তাশীল। তুমি তোমার স্নেহময়ী মায়ের বুকে ঘুমাও আর আমি শুষ্ক মরুভূমির শূন্যতায় পড়ে থাকি। সূর্যের প্রখরতায় আমি জ্বলে পুড়ে মরি আর তোমার জীবনে চাঁদ ও তারার স্নিগ্ধতার কোমল পরশ। তুমি স্বপ্ন দেখ মেয়েদের, আমার সকল ভাবনা ঘিরে রয়েছে ছেলেরা······,'

তার অনেক কথা তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত গোল্ডমুণ্ডের বুকে গিয়ে বিঁধতে লাগল। নরজিসের কথা শেষ হলে গোল্ডমুণ্ড বিবর্ণ হয়ে চোখ বুজল। হঠাৎ তা দেখতে পেয়ে নরজিস উঠে দাঁড়াতেই গোল্ডমুণ্ড অস্ফুট স্বরে বলল, 'তোমার হয়তো মনে আছে, একদিন আমি তোমার সামনে কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু আর তার পুনরাবৃত্তি হতে দেব না। তুমি চলে যাও। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।'

নরজিস দুঃখ পেল। তার মনের কথাগুলি ভাষায় সুন্দর ও স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পেরে এতক্ষণ সে আপন ভাবনাতেই মগ্ন ছিল। এবারে বুঝতে পারল গোলমুণ্ডকে চরম আঘাত দেবার মত কিছু বলে ফেলেছে সে। এ

অবস্থায় তাকে একলা ফেলে রেখে যাওয়া উচিত হবে কি না ভেবে এক-মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াতেই গোল্ডমুণ্ডের ভ্রূকুটি দেখে নিজেকে আবার সামলে নিল। দ্বিধাভরা মনে গোল্ডমুণ্ডকে সেখানে একলা ফেলে রেখেই চলে গেল সে। গোল্ডমুণ্ড কাঁদতে লাগল, কিন্তু চোখের জল তার অন্তরের রুদ্ধ বেদনাকে আজ মুক্ত করতে পারল না।

বেদনার্ত গোল্ডমুণ্ড একাকী দাঁড়িয়ে রইল। তার নিশ্বাস মৃত্যুর শীতল স্পর্শে রুদ্ধ হয়ে আসছে বুঝি, মুখখানি মোমের মত সাদা হয়ে গেছে। তার বুকে যে মর্মান্তিক তীরের ফলা বিঁধেছে তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে—এই একটি মাত্র ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। টলতে টলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অনেক দিন ধরে তার মন যা করতে চেয়েছে আজ নিজের অজ্ঞাতেই নরজিস তা করে ফেলেছে। তার বন্ধুর সত্যিকারের স্বরূপ সে প্রকাশ করে দিয়েছে। তার কোনো কথা গোল্ডমুণ্ডের অন্তরের কোন গোপন তন্ত্রীতে আঘাত করেছে বলেই ভেতরকার সেই দানব যন্ত্রণায় কেঁদে উঠেছে। কিছুক্ষণ পর নরজিস প্রতিটি স্কুল ঘরে গোল্ডমুণ্ডকে উদ্‌ভ্রান্তের মত খুঁজে বেড়াল। কিন্তু কোথাও পেল না তাকে।

গোল্ডমুণ্ড তখন মঠের ছোট্ট বাগানে তোরণের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথার ওপরে একটা স্তম্ভের গায়ে কুকুর কিংবা নেকড়ে জাতীয় তিনটি জানোয়ারের পাথরের মাথা তার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যেন। অন্তরের সেই বেদনাকে আবার তীব্রভাবে অনুভব করল গোল্ডমুণ্ড। কাঁপতে কাঁপতে সেখানে বসে পড়ে হঠাৎ উবু হয়ে স্তম্ভের সামনে লুটিয়ে পড়ল সে। যে বিস্মৃতি আর অন্ধকারকে এতক্ষণ কামনা করছিল তারই অতল তলে সে তলিয়ে গেল এবার।

মহান্ত ড্যানিয়েল প্রার্থনার পরে বেড়াতে বেড়াতে মঠের বাগানে যেয়ে গোলাপের মৃদুমন্দ সুবাস বুকভরে গ্রহণ করবার জন্য এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন। গোল্ডমুণ্ডকে সেখানে অজ্ঞান অবস্থায় মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলেন মহান্ত। গোল্ডমুণ্ডের সুন্দর, যৌবনদীপ্ত মুখখানিকে মৃতের মত স্থির, বিবর্ণ দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন।

দুজন তরুণ ব্রহ্মচারীকে ডেকে এনে অসুস্থদের থাকবার ঘরে গোল্ডমুণ্ডকে নেবার ব্যবস্থা করে মহান্ত মঠের চিকিৎসক ফাদার আনসালেমকে ডেকে

পাঠালেন। সবশেষে নরজিসকে ডেকে পাঠাতেই নরজিস তাঁর কাছে এল। তিনি প্রশ্ন করলে নরজিস তার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য নিয়ে গোল্ডমুণ্ডের সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে, অতর্কিতে তার কোন্ কথা কেমন করে তাকে আঘাত করেছে—সবই সংক্ষেপে বলল। মহান্ত বিরক্ত হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'কারও স্বীকারোক্তি শোনবার অধিকার তোমার নেই। এখনও তুমি দীক্ষিত হও নি নরজিস। তাহলে কেন তুমি এই ছাত্রটির সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা বললে? তাকে কেন উপদেশ দিতে গেলে তুমি? এখন দেখ, তার পরিণাম কত খারাপ হয়েছে।'

নরজিস শান্ত, স্থির স্বরে উত্তর দিল, 'পরিণাম বিচার করবার সময় এখনও আসে নি, ফাদার। কিন্তু গোল্ডমুণ্ডের সঙ্গে আমার এই আলোচনা একদিন না একদিন তার মঙ্গল করবেই এই আমার দৃঢ় ধারণা। আপনি জানেন সে আমার বন্ধু। আমি তাকে বড় ভালবাসি। তাকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি বলেই অমনভাবে আলোচনা করেছি। মন তার সুস্থ নয় ফাদার। আপনি তো জানেন মানুষ যে বয়সে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় গোল্ডমুণ্ড অনেক কাল আগেই সেই বয়সে পৌঁছে গেছে।'

'জানি। তার বয়স সতের।'

'আঠার, ফাদার।'

'আঠার! তা বেশ, কিন্তু এ তো প্রত্যেক মানুষের জীবনের অতি স্বাভাবিক, সাধারণ ব্যাপার। এজন্য তার মন অসুস্থ হয়েছে এ কথা তুমি বলতে পার না।'

'না, ফাদার, জীবনের সহজ, স্বাভাবিক ব্যাপার হলে ভাবনা কিছুই ছিল না। আমার মনে হয় তার জীবনের কোনো অতীত অধ্যায়কে ভুলে গেছে বলেই আজ এই যন্ত্রণা ভোগ করছে সে।'

'তা সম্ভব। কিন্তু জীবনের কোন্ অংশকে সে ভুলে গেছে?'

'তার মাকে, মায়ের সমস্ত স্মৃতিকে। তার মায়ের কথা তার চেয়ে আমিও বেশি কিছু জানি না। আমি শুধু বুঝেছি মায়ের স্মৃতির সঙ্গেই তার অন্তর-বেদনার একটা গভীর যোগাযোগ রয়ে গেছে। অনেক ছেলেবেলায় মাকে সে হারিয়েছে। তবুও মায়ের কথা মনে করতেই যেন তার লজ্জা হয়। কিন্তু মায়ের কাছ থেকেই সে তার সমস্ত প্রতিভার উত্তরাধিকার পেয়েছে।'

গোল্ডমুণ্ডের বাবার কথা মনে পড়ল মহান্তের। বিরসবদন, চালবাজ সেই

নাইটের চেহারা স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে উঠল। তিনি ছেলেটির মায়ের কথাও কি যেন বলেছিলেন, মনের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে এখন তাও মনে পড়ে গেল তাঁর। তিনি বলেছিলেন গোল্ডমুণ্ডের মা তাঁর নাম ডুবিয়েছে, তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে গেছে। তাই ছেলের মন থেকে মায়ের সমস্ত স্মৃতি তিনি উপড়ে ফেলেছেন। কলঙ্কিনী মায়ের বিষাক্ত সংস্পর্শ থেকে ছেলেকে বাঁচিয়েছেন। তাঁর ছেলে নিজের জীবনকে ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী হয়েছে।

নরজিস বলতে লাগল, 'গোল্ডমুণ্ডের ভেতরকার গভীর দুঃখ ও বেদনাকে জাগাবার কোনো বাসনাই আমার ছিল না। আমি শুধু তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম সে নিজেকে জানে না। বলেছিলাম, সে তার মাকে, তার শৈশবকে ভুলে গেছে। আমার এসব কথার মধ্যে হয়তো কোনো একটা কথা তার অন্তরে আঘাত করেছে। তার মনের ভেতরকার যে অন্ধকারের আবরণ মুক্ত করতে আমি এতকাল চেষ্টা করে এসেছি তা আপনা থেকেই সরে গিয়েছে। এখন সে জেগেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।' নরজিসকে মহান্ত এবার চলে যেতে বললেন। তাকে আদেশ করলেন গোল্ডমুণ্ডের সঙ্গে যেন সে এখন কিছুদিন দেখা না করে।

ফাদার আনসেলম গোল্ডমুণ্ডকে বিছানায় শুইয়ে পাশে বসে তাকে লক্ষ্য করছেন। কুঞ্চিত, দয়ালু দুটি চোখের নত দৃষ্টি দিয়ে গোল্ডমুণ্ডের মৃতপ্রায়, বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বৃদ্ধ কত কি ভাবছেন।

আনসেলম গোল্ডমুণ্ডকে পছন্দ করতেন কিন্তু তার বন্ধু নরজিসকে সহ্য করতে পারতেন না মোটেই। তাঁর মতে গর্বিত এই বিদ্যার্থীটি এত তরুণ বয়সে শিক্ষকের মর্যাদা পাওয়াতেই যত ঝঞ্ঝাট বেধেছে। আজকের এই অঘটনের জন্য নিশ্চয়ই নরজিসও কিছুটা দায়ী। জগতে গ্রীক ছাড়া যেন আর কিছু নেই এমনই তার মনোভাব। এই দুর্বিনীত, পণ্ডিতম্মন্য সঙ্গীটির সঙ্গে সহজ সরল, সুন্দর এই ছেলেটির এতটা মেলামেশা করবারই বা প্রয়োজন কি?

অনেকক্ষণ পর মহান্ত রোগীর ঘরে ঢুকে দেখলেন বৃদ্ধ আনসেলম চিন্তিত ভাবে তখনও গোল্ডমুণ্ডের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। তরুণ গোলমুণ্ডের মুখখানি কেমন সুন্দর, কোমল আর সরল। ছেলেটির মধ্যে আবার জীবনের স্পন্দন ফিরে আসার কামনা নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে তাকে লক্ষ্য করা ছাড়া আর কিছুই যে তাঁর করবার নেই।

মহান্ত বিছানার কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে তার একটি চোখের পাতা টেনে তুলে বললেন, 'ওকে জাগাতে পারবেন?'

'আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এখন জোর করে জাগাবার চেষ্টা করা উচিত হবে না।'

'জীবনের আশঙ্কা নেই তো?'

'না, তা মনে হচ্ছে না। শরীরে কোনো আঘাত বা ক্ষত নেই। পড়ে যাবার লক্ষণও নেই। শুধু অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

যাবার আগে বৃদ্ধ মহান্ত গোল্ডমুণ্ডের ওপর আবার ঝুঁকে পড়লেন। তার বাবার কথা মনে পড়ল তাঁর। যেদিন এই সুন্দর কিশোরটিকে তার বাবা মঠে পড়বার জন্য দিয়ে যান সে-দিনটি স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে উঠল। তাঁরা সকলেই ছেলেটিকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজেও তাকে দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন। একটা বিষয়ে নরজিস কিন্তু খুব সত্য কথাই বলেছে। ছেলেটির সঙ্গে তার বাবার সত্যিই কোনো সাদৃশ্য নেই।

এক সময়ে অর্ধচেতন অবস্থায় গোল্ডমুণ্ড অনুভবে বুঝল সে বিছানায় শুয়ে আছে কিন্তু কোথায় আছে তা বুঝতে পারল না। অনেক চেষ্টা করেও কিছু মনে করতে পারছে না। এখানে সে এল কেমন করে? অনেক দূরে কোথায় কোন্ অজানা রাজ্যে যেন সে ছিল এতক্ষণ। অদ্ভুত, বিরল, সুন্দর, ভয়ানক সব দৃশ্য দেখেছে সেখানে। বিষাদময়ী, অপূর্ব সুন্দরী, মহিমাময়ী একটি মূর্তি তার চোখের সামনে ভেসে উঠে আবার নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল? তার মা! আর সেই মুহূর্তে সে যেন একটি স্বর শুনতে পেল। তাকে বলছে, 'তুমি তোমার ছেলেবেলাকে ভুলে গেছ।' কান পেতে সে শুনল, ভাবতে চেষ্টা করল। স্তূপীকৃত জঞ্জালের আস্তরণ ঘুচিয়ে তার বিস্মৃতির সমুদ্র যেন শুকিয়ে গেল তখনই। নীলাভ উজ্জ্বল দুটি চোখের সহাস্য দৃষ্টি মেলে তার হারিয়ে যাওয়া মা, তার সবচেয়ে প্রিয় সেই মূর্তিটি রাণীর মত, সম্রাজ্ঞীর মত তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তার বিছানার একপাশে ফাদার আনসেলম ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এবার তিনি জেগে উঠলেন। তাঁর মনে হল অসুস্থ ছেলেটি জেগে উঠে যেন হাঁপাচ্ছে। খুব সন্তর্পণে তিনি উঠলেন। গোল্ডমুণ্ড প্রশ্ন করল, 'কে ওখানে?'

'ভয় পেওনা। আমি—আমি ফাদার আনসেলম। এই যে, আলো জ্বালছি।'

আলোর পলিতায় আগুন জ্বালিয়ে দিতেই তাঁর মমতা-ভরা কোঁচকানো মুখখানিকে স্পষ্ট দেখা গেল।

'কিন্তু আমি কি অসুস্থ?' গোল্ডমুণ্ড প্রশ্ন করল।

'তুমি শুধু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। আচ্ছা, হাতটা দাও তো লক্ষ্মী ছেলে, নাড়ি দেখব। এখন কেমন বোধ করছ?'

'ভাল। ধন্যবাদ, ফাদার, আমার জন্য অনেক কষ্ট করছেন আপনি। আমার আর কিছুই দরকার নেই। আমি বড় ক্লান্ত।'

'হ্যাঁ, তুমি সত্যিই বড় ক্লান্ত। এখনই আবার ঘুমিয়ে পড়বে। তার আগে এই পানীয়টুকু খেয়ে নাও তো। অনেকক্ষণ হল তোমার জন্য তৈরি করে রেখেছি। তোমার স্বাস্থ্য কামনা করে এইযে আমিও পান করছি।'

গোল্ডমুণ্ড হেসে তাঁর পাত্রের সঙ্গে নিজের পাত্রটি ঠুং করে স্পর্শ করিয়ে পানীয়টুকু খেয়ে ফেলল।

'পেট ব্যথা করছে তোমার?' ফাদার প্রশ্ন করলেন।

'না।' গোল্ডমুণ্ডের দৃষ্টি এবার স্বচ্ছ, উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে।

বৃদ্ধ ফাদার শুতে চলে গেলেন। গোল্ডমুণ্ড আরও কিছুক্ষণ জেগে রইল। ধীরে ধীরে আবার সে তার স্বপ্নরাজ্যে চলে গেল। আনন্দোজ্জ্বল মায়ের মূর্তিখানি প্রাণময়ী হয়ে তার অন্তরে আলোড়ন তুলল। শুকনো শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে মৃদুমন্দ বাতাসের মধুর হিল্লোলের মতই তার মায়ের উপস্থিতি, মায়ের কোমল স্পর্শ তাকে ভাবিয়ে তুলল, পূর্ণ করল কানায় কানায়। পরিপূর্ণ জীবনরসে, মমতায়, উৎসাহে সে নূতন করে বেঁচে উঠল যেন।

'উঃ! মাগো, কেমন করে তোমায় আমি ভুলে ছিলাম এত কাল?'

৫

এতদিন পর্যন্ত গোল্ডমুণ্ড তার মায়ের কথা যতটুকু জানত, লোকমুখে শোনা কাহিনীই ছিল তার একমাত্র ভিত্তি। মায়ের মূর্তি কবে তার মন থেকে মিলিয়ে গেছে। তাঁর বিষয়ে যতটুকু সে জানে তাও নরজিসের কাছ থেকে গোপন করে এসেছে এতদিন। মায়ের কথা ভাবা বা বলা তার পক্ষে যেন নিষিদ্ধ ছিল। এককালে তার মা নাকি বাঁধনহারা নর্তকীর জীবনকে বরণ করেছিল। অপূর্ব সুন্দরী হলেও সে ছিল নীচ-বংশজাত। বাবার কাছে শুনেছে তার মাকে তিনি দারিদ্র্য আর অপমানের সেই ঘৃণিত জীবন থেকে উদ্ধার করতে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে নিয়ে আপন সহধর্মিণীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। মাত্র কয়েকটি বছর সংযত, সহজ জীবন কাটাবার পর আবার সে তার পুরানো ছলাকলাকে আশ্রয় করে পুরুষ মানুষদের প্রলুব্ধ কববার খেলায় মাতল। আর এভাবেই হল বিবাদের সূত্রপাত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বাড়ির বাইরে রাত কাটাতে আরম্ভ করল। কলঙ্কিনী কুহকিনীর অপযশ অর্জন করে শেষ পর্যন্ত একদিন ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল, আর ফিরে এল না। ধূমকেতুর পুচ্ছের সর্বনেশে আগুনের মত তার কলঙ্ককাহিনী কিছুদিন লোকের মুখে মুখে ফিরল। তারপর একদিন তাও নিঃশেষে সবার মন থেকে মুছে গেল। তার স্বামী কয়েকটি বছরের সেই ভয়াবহ অবিশ্বাস, লজ্জা আর অপমানজনক জীবনের তিক্ততা কাটিয়ে উঠলেন ধীরে ধীরে। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর বদলে ছেলেটিকেই ভালবাসতে শুরু করলেন। চেহারা আর ভাবভঙ্গিতে ছেলেটি তার মায়ের পূর্ণ প্রতীক। মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ছেলেকেই তার জীবন উৎসর্গ করতে হবে, দিনে দিনে নারস, অনুতপ্ত নাইট গোল্ডমুণ্ডের মনের মধ্যে একটু একটু করে এই বিশ্বাসই সংক্রামিত করে দিলেন। কিন্তু যা তার মন থেকে মুছে গিয়েছিল, সে সত্যিই যা হারিয়ে ফেলেছিল তা হল তার আপন দরদী মনের একান্ত কল্পনার মাতৃরূপটি। তার অন্তরের এই মাতৃমূর্তি একেবারেই ভিন্ন, নাইটের কাহিনীর সঙ্গে তার এতটুকু মিল নেই। তার এই সত্য উপলব্ধিকে সে হারিয়ে ফেলেছিল এতদিন। তাই তার

বাঞ্ছিত মাতৃমূর্তি, তার বাল্যের ধ্রুবতারা তারই সামনে এসে দাঁড়াল আবার।

একদিন তার বন্ধুকে গোল্ডমুণ্ড বলেছিল, 'কি করে যে আমি তাকে ভুলে গেলাম বলতে পারি না। মাকে আমি যেমন ভালবেসেছি এ জীবনে এমন আর কাউকেই ভালবাসি নি, তার মত শ্রদ্ধা আর কাঁউকেই করি নি কোনো দিন। এমন সুন্দরও আমার চোখে আর কেউ নেই। আমার জীবনে মা একাধারে সূর্য আর চন্দ্রের মত। আমার অন্তরের এই আকুল সুন্দর ভাল-বাসাকে ক্রমে স্তিমিত, বিকৃত করে, আমার চোখে তাকে কলঙ্কিনী, কুরূপা করে তুলে ধরে তাকে নিঃশেষে ভুলে যেতে কেমন করে তারা সম্ভব করল, একমাত্র ঈশ্বরই তা জানেন।'

কিছুদিনের মধ্যেই নরজিস শিক্ষানবিসী ব্রহ্মচর্যের পর্যায় শেষ করে যথারীতি দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হল।

সেদিনকার সেই বেদনাময় উপলব্ধির পর থেকে আজকাল এই শিক্ষকটির প্রতিভা এবং জ্ঞানের জন্য তার প্রতি বিচিত্র এক কৃতজ্ঞতা গোল্ডমুণ্ড অনুভব করছে মনে মনে। সেদিনের অসুস্থতার কোনো চিহ্নই এখন আর তার মধ্যে নেই, এমনকি তার স্বভাবেরও যেন কত রূপান্তর ঘটেছে! সন্ন্যাসী হবার জন্য একটা অদম্য ব্যর্থ প্রয়াস, অতি-ভক্তির অস্বাভাবিক চাপল্য —এ সমস্তই তার স্বভাবের মধ্য থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু সন্ন্যাসী হওয়াই নয়, তার চেয়েও অনেক উঁচু স্তরে পৌঁছানই বুঝি তার একমাত্র কর্তব্য—এই অহেতুক ধারণা আর রইল না তার মনে। নিজেকে উপলব্ধি করবার পর থেকেই একাধারে সে বৃদ্ধ এবং শিশুর মত সরল হয়ে উঠল। সে জানে এজন্য নরজিসকেই ধন্যবাদ জানাতে হবে।

কিন্তু কিছুদিন হল নরজিস তার সঙ্গে আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত সংযত, মিতভাষী হয়ে উঠেছে। গোল্ডমুণ্ড তার একান্ত অনুগত ভক্ত হয়ে উঠলেও সে কিন্তু তার প্রতি শিক্ষক ও গুরুজনের মত ব্যবহার না করে নির্লিপ্তভাবে তাকে লক্ষ্য করছে। সে ঠিকই বুঝতে পেরেছে গোল্ডমুণ্ডের ভেতরকার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভা আর মানসিক বৃত্তিগুলির মত সম্পদ তার কোনো কালেই হবে না। গোল্ডমুণ্ডের প্রতিভাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করাই শুধু তার কাজ, তার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগই তার থাকবে না। বন্ধুকে তার পূর্ণ সত্তায় জাগিয়ে তুলে স্বাধীন, মুক্ত হবার পথে সাহায্য

করতে তার যে আনন্দ, তার মধ্যে কেমন একটা ব্যথার রেশও লুকিয়ে আছে বুঝি। তাদের দু জনের মধ্যে যে বন্ধন গড়ে উঠেছে তার সমাপ্তি ঘটবে শীঘ্রই, নরজিস দূরদৃষ্টি দিয়ে তাও বুঝতে পারল। গোল্ডমুণ্ড আপন অন্তরকে জানতে পেরে তার নির্দেশে চালিত হতে চাইলেও ঠিক তখনও জানত না কোন্ নির্দিষ্ট পথে তাকে তার অন্তর নীরব আহ্বান জানাবে। কিন্তু নরজিস ঠিকই বুঝতে পেরেছে তার বন্ধু জীবনে যে-পথকে অনুসরণ করবে সেই পথে তার নিজের প্রবেশাধিকার নেই কোনোকালেই।

এদিকে নরজিসের ব্রহ্মচর্যের প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে। নরজিস আজকাল সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করে আত্মবিশ্লেষণে আর যোগ-সাধনায় আপনাকে মগ্ন রাখতে চাইল। গোল্ডমুণ্ডও এ দিকে মন দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করল। সেদিনের অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করবার পর তার সহজাত বৃত্তিগুলি আরও অনেক বেশি অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠেছে। দূর ভবিষ্যতে তার ভাগ্যে কি ঘটবে সে বিষয়ে কোনো সংকেত না পেলেও প্রতি দিন সে আরও স্পষ্টকরে যেন উপলব্ধি করতে পারছে, কখনও বা গভীর একটা আতংক মনে নিয়ে অনুভব করছে এবার তার নিয়তিই তাকে গ্রাস করবে। তার জীবন আপন ভাগ্যের সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এক এক সময় ভবিষ্যতের পূর্বাভাসগুলিকে বড় সুখকর, আনন্দদায়ক বলে মনে হত তার। তখন প্রায় সমস্ত রাত্রি মধুর, বিচিত্র এক আবেশে বিনিদ্র কাটিয়ে দিত। কিন্তু অনেক সময়েই সেগুলিকে আবার বড় বিভীষিকাময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন বলেও মনে হত।

তার বহুকালবিস্মৃত মা আবার তার জীবনে ফিরে এসেছে। মা তাকে অনাবিল আনন্দের সন্ধান দিয়েছে, কিন্তু মায়াবিনী মায়ের বিচিত্র এই আহ্বান তাকে কোথায় কোন অপরিবর্তিত জগতে নিয়ে যাচ্ছে কে জানে! হয়তো-বা মৃত্যুর দিকেই তাকে নিয়ে চলেছে। নিরাপদ জীবনধারায়, সন্ন্যাসীদের চির সাহচর্যে তাকে আর থাকতে দেবে না বুঝি! বাবার যে আদেশকে সে এতদিন আপন ইচ্ছা বলেই জেনেছে তার সঙ্গে মায়ের এই আহ্বানের এতটুকুও যোগাযোগ নেই। তবুও তার এই নূতন অনুভূতি এক এক সময় প্রবল আর স্পষ্ট হয়ে উঠে তার সমস্ত কর্তব্যানুরাগ ও ঈশ্বরপ্রেমকে জাগিয়ে তোলে। জগন্মাতার কাছে তার অবিরাম আকুল প্রার্থনার মধ্য দিয়ে

সে তার মায়ের একান্তে এগিয়ে গেল ক্রমে ক্রমে। তার এই প্রাণঢালা প্রার্থনা তাকে শেষ পর্যন্ত বিচিত্র আনন্দময় এক স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে গেল। আধ-জাগা অবস্থায় সুখস্বপ্নের মত মায়ের ছবি তার সামনে ভেসে ওঠে। তার সমস্ত অনুভূতিকে স্পন্দিত করে পরিপূর্ণ রূপ, রস, গন্ধ আর কামনা নিয়ে শুধুই মায়ের স্মৃতিময় হয়ে উঠল গোল্ডমুণ্ডের পৃথিবী। মায়ের চোখদুটি সাগরের গভীরতাকেও বুঝি হার মানায়; স্বর্গোদ্যানের মতই চিরন্তন ও সুন্দর তারা। মায়ের অধর স্পর্শে তিক্ত-মধুর জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদন পায় সে। মায়ের রেশমী চুলের রাশি তার মুখে চোখে সোহাগস্পর্শ বুলিয়ে দেয়। মা যে তার শুধু পবিত্রতা, কোমলতা, সৌন্দর্য, ভালবাসা আর অনাবিল আনন্দ ও সুখের প্রতীক, তাই নয়; তার প্রলোভনের অন্তরালে বিশ্বের যত ঝড়ঝঞ্ঝা, অন্ধকার, লোভ, ভয়, পাপ, হাহাকার, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু—মানবজাতির সমস্ত নশ্বরতাই যেন লুকিয়ে রয়েছে।

গোল্ডমুণ্ড তার এইসমস্ত স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই স্বপ্নমায়া জড়িয়ে আছে। কোন্ যাদুমন্ত্রবলে তার ভালবাসা-জড়ানো অতীত, তার শৈশব আবার তার মনে ফিরে এল! তার :মাকে কুমারী মেরীর মত কল্পনা করতে করতে তার ব্যভিচারিণী রূপও ফুটে উঠছে তার মনে আর সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানক একটা অন্যায়বোধ, পবিত্র কোনো কিছুকে অপবিত্র করার বেদনাময় অনুভূতিতে গোল্ডমুণ্ড শিউরে ওঠে। কখনো আবার গভীর প্রশান্তি আর মুক্তির আস্বাদনে মন তার ভরে যায়। মায়ের রহস্যময় গোপন জীবনধারা যেন সর্বদা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে স্বপ্ন দেখে বিচিত্র এক উদ্যানে মন্ত্রপূত গাছগুলির শাখায় শাখায় পৃথিবীর ফুলের চাইতে অনেক বড় আকারের ফুল ফুটে আছে; রহস্য-ভরা গভীর কত গহ্বর সেখানে। ঘাসের বুকে অজানা জন্তুজানোয়ারদের হিংস্র চোখগুলি জ্বল জ্বল করছে যেন, গাছের শাখাপ্রশাখায় শান্তভাবে জড়িয়ে আছে বিরাটাকার কত সাপ: প্রতিটি শাখা থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ উজ্জ্বল, সুন্দর বেরিফল ঝুলছে। গোল্ডমুণ্ড সেগুলি তুলে হাতের মুঠোয় নিয়ে ভেঙ্গে ফেললে, তার ভেতর থেকে ঈষদুষ্ণ রস বের হয়ে পড়ছে-রক্তের ধারার মত অথবা তারা চক্ষুষ্মান হয়ে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

আবার একদিন স্বপ্ন দেখল, সে যেন পূর্ণ যুবক হয়ে উঠেছে। কিন্তু

তবুও শিশুর মত মাটিতে বসে এক তাল কাদা নিয়ে মাখামাখি করে কত মূর্তি গড়ে চলেছে। কাদা নিয়ে এই খেলা তাকে বড় আনন্দ দেয়। তারপর এক সময় এই খেলাও আর ভাল লাগল না। ক্লান্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতেই সহসা যেন অনুভব করল বিরাট, নিস্পন্দ কিছু একটা তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। পেছন ফিরে তাকাতেই অবাক বিস্ময়ে ভীত চকিত মনে দেখল তারই সৃষ্ট পুরুষ ও নারীর প্রতিকৃতিগুলি বিরাট আকার নিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অসীম শক্তিমান নির্বাক সেই দানবেরা তার সামনে দিয়ে সারি বেঁধে একে একে বিশ্বের দরবারে প্রবেশ করল।

রূঢ় বাস্তবের চেয়ে এই স্বপ্নরাজ্যেই গোল্ডমুণ্ড সত্যি করে বেঁচে ওঠে যেন। বিদ্যালয়, প্রাঙ্গণ, শোবার হল ঘর, পাঠাগার, মঠের ভজনালয়—এসমস্তই যেন বাস্তবের বহির্ভাগ শুধু, তার ক্ষণিক বাস্তব জীবনের বহির্দৃশ্য মাত্র। জীবনের গভীরতাকে, পরম সত্যকে, তার স্বপ্নের মায়াময় পরিবেশ ও কল্পনার রাজ্যকে সন্তর্পণে আবৃত করে রেখেছে এরা। অতি তুচ্ছ কারণেই বাইরের এই আবরণ ঘুচে যায় একনিমেষে। জানলার খিলানের ওপরে নুয়ে-পড়া একগুচ্ছ পাতার দিকে দৃষ্টি পড়লেই মন তার উধাও হয়ে যায় কোথায় কোন্ সুদূরে! এমনি করে কারণে অকারণে গোল্ডমুণ্ডের বাস্তব জীবনের স্থূলতার সকল আবরণ ঘুচে গিয়ে তার জীবনজিজ্ঞাসা আর অন্তরের নিবিড় আকুলতা তার প্রাণের পরশ-দেওয়া স্বপ্নরাজ্যের মধ্যেই আপন পরিণতিকে খুঁজে পায়। অধ্যয়নের মাঝে হঠাৎ এক সময়ে একটি ল্যাটিন অক্ষর তার মায়ের উজ্জ্বল, সুন্দর চোখদুটিকে সৃষ্টি করে দেয়। একটি প্রার্থনা-সঙ্গীতের বিলম্বিত সুরঝংকার স্বর্গের দরজা খুলে দেয় তার কাছে। একটি গ্রীক অক্ষর ঘোড়ায় পরিণত হয়ে ছুটতে থাকে যেন। আবার কখনো সাপ হয়ে ফুলের বুকে লুকিয়ে থাকে। তারপর সহসা কখন্ এই স্বপ্নমায়া ঘুচে গিয়ে তাকে ব্যাকরণের নীরস পাতার মধ্যে ফিরিয়ে দিয়ে যায় আবার।

গোল্ডমুণ্ড কখনো কাউকে তার এসব ভাবনার কথা বলে না। কেবল মাঝে মাঝে নরজিসকে আভাসে কিছু বলত। একদিন তাকে সে বলল, 'তোমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের পেছনে আমি আর ছুটছি না। একদিন আমার বাবার কথা যেমন করে ভেবেছিলাম এখন বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান আর মেধার বিষয়েও তেমনি ভাবি আমি। ভাবতাম আমার বাবাকে বুঝি প্রাণভরে

ভালবাসি আমি। তাঁরই মত হব, এই আশাও করেছিলাম। তিনি যা বলতেন সমস্তই মনে প্রাণে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আমার জীবনে আমার মা ফিরে এসে সত্যিকারের ভালবাসা কেমন তা আমাকে বুঝিয়ে দিল। তার প্রতিমূর্তির কাছে বাবার স্মৃতি একেবারেই স্তিমিত, ম্লান। বাবার স্মৃতি এখন আমাকে কেবল অসুখীই করে তোলে। তাঁকে যেন ঘৃণা করতে শুরু করেছি। এখন আমি ঠিকই জানি বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা আমার বাবার মতই অর্থহীন আমার জীবনে।'

গোল্ডমুণ্ড হালকা-সুরে এসব কথা বললেও নরজিসের ব্যথিত মুখে এতটুকুও হাসির রেখা ফোটাতে পারল না। নরজিস নীরবে তাকে লক্ষ্য করছে, তার দৃষ্টিতে দরদ আর স্নেহ ঝরে পড়ছে। তারপর সে বলল, 'তাহলে এখন তুমিও উপলব্ধি করতে পারছ তোমার মঠের জীবন, সন্ন্যাসী হবার আকাঙ্ক্ষা কত ভ্রান্ত। এ শুধু তোমার বাবার চাতুরি। তোমার বাবা তোমার মায়ের স্মৃতিকে তোমার মন থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। হয়তো এটা কেবল তার উপর প্রতিশোধ নেবার একটা ছলনা মাত্র। তোমার সমস্ত জীবনটা এই মঠে কাটিয়ে দেবার কথা এখনও কি চিন্তা করতে পার তুমি?'

মৃদু স্বরে গোল্ডমুণ্ড উত্তর দিল। সে বলল, 'জানি না। তবে তুমি আমার বাবার প্রতি হয়তো একটু অবিচারই করছ। তিনি জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। একটা কথা তুমি ঠিকই বলেছ। কত বছর হল আমি মঠে আছি, কিন্তু তিনি একবারও আমাকে দেখতে আসেন নি। তিনি আশা করেন আমি এখানেই চিরকাল থেকে যাব। হয়তো সেটাই আমার পক্ষে সঙ্গত হবে। আমিও তাই কামনা করেছি এতদিন। কিন্তু আজ আর নিজেকে চিনতে পারছি না, বুঝতে পারছি না। আমার কি ইচ্ছা, কি কামনা কিছুই যেন জানি না। একদিন সমস্ত কিছুই কত সহজ সরল ছিল। কিন্তু এখন কিছুই তেমন নেই। আমার জীবনের কি পরিণতি হবে আমিই তা বলতে পারি না।

নরজিস বলল, তোমার পথ তোমার সামনে স্পষ্ট হয়েই দেখা দেবে। তোমার জীবনের পথ তোমাকে তোমার মায়ের কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার বাবার প্রতি আমি অবিচার করিনি। আচ্ছা, তুমি কি তাঁর কাছে ফিরে যেতে চাও?'

'না, বাবার কাছে ফিরে যেতে চাই না আমি।' আনমনে সে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

নরজিস একটু হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'এতদিন তুমি ঘুমিয়েছিলে বন্ধু, আমিই তোমাকে জাগিয়েছি। তোমার মাকে তোমার মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনবার জন্য তোমাকে আঘাতও করেছি আমি। এখন আর আমি তোমাকে পরিচালনা করতে পারি না, তোমার সঙ্গীও হতে পারি না। তোমার মাকে জিজ্ঞেস কর। তার প্রতিকৃতিকে প্রশ্ন কর, কান পেতে তার নির্দেশ শোন। আমার জীবনের লক্ষ্য অনির্দিষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন নয়। এই মঠের মধ্যেই আমাকে ঘিরে তারা রয়েছে, প্রতি মুহূর্তে আমার কাছ থেকে নূতন সাধনা, কঠিন ত্যাগ দাবি করছে। আমি সন্ন্যাসী, ঈশ্বরের সেবায়েত। আমার সর্বশেষ ব্রত উদ্‌যাপন করার আগে আমি শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়ে নির্জনে গিয়ে কঠোর সাধনা করব। তোমার সঙ্গেও তখন কোনো কথা বলতে পারব না।'

গোল্ডমুণ্ড দুঃখিত স্বরে প্রশ্ন করল, 'তোমার নির্জনবাসের শেষে তোমার লক্ষ্য কি হবে?'

নরজিস ম্লান হেসে বলল, 'শেষে কি করব কে জানে? স্কুলের প্রধান অধ্যক্ষ অথবা মহান্ত বা বিশপ হয়েও মরতে পারি। তবে যেখানেই আমার প্রতিভা ও কর্মশক্তি পরিপূর্ণভাবে সার্থক হবার সুযোগ পাবে সেখানেই জীবনটাকে উৎসর্গ করে দেব আমি। আমি চাই আমার আপন আত্মাকে, আমার জীবনদেবতাকে, আমার চেতনাকে উপলব্ধি করে তাঁরই সেবা করতে, তাঁর নির্দেশের মর্ম উদ্ঘাটন করতে। এই আমার জীবনের লক্ষ্য।'

গোল্ডমুণ্ড বাধা দিয়ে ব্যঙ্গভরা স্বরে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে? আমাকে আমার জীবনের হারানো স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে, আমার আত্মাকে মুক্ত করে, আমাকে সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে সত্যিই কি তুমি সেই পরমাশক্তির সেবা করলে? মঠের একজন আগ্রহশীল, আজ্ঞাবহ, কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষার্থীকে কি তুমি কেড়ে নাও নি? তোমার কাছে যা কিছু পবিত্র, সুন্দর তাকেই বিপরীতভাবে ভাবতে শেখাওনি কি আমাকে?'

নরজিস গম্ভীরভাবে বলল, 'তাতে কি হয়েছে? তুমি আমাকে এখনও ঠিক বুঝতে পার নি। একথা হয়তো সত্যি, তোমার মধ্যে ভাবী সন্ন্যাসীর সম্ভাবনাকে আমি চিরতরে নষ্ট করে দিয়েছি। তার পরিবর্তে এমন পথের

সন্ধান তোমাকে দিয়েছি যে পথ ধরে তুমি তোমার জীবনকে এক অসাধারণ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারবে। কাল যদি তুমি এই সুন্দর মঠটিকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দাও অথবা জগতে একটা বিরুদ্ধ ধর্মমতের প্রচার করতে থাক তাহলেও আমি তোমাকে তোমার জীবনপথে চলার জন্য সাহায্য করেছি বলে এতটুকুও অনুতপ্ত হব না।'

গোল্ডমুণ্ডের কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে নরজিস বলতে লাগল, 'শোন গোল্ডমুণ্ড, এটাও আমার জীবনের উদ্দেশ্যের একটা অংশ। আমি শিক্ষক অথবা মহান্ত যা-ই হই না কেন, সত্যিকারের প্রতিভাবান, শক্তিমান কোনো লোক আমার জীবনপথে এলে তাকে বুঝবার চেষ্টা করব। তার প্রতি মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করব না কোনো দিন। তুমি এবং আমি জীবনে যা-ই হই না কেন, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যেটাই নেমে আসুক আমাদের জীবনে, তুমি মনে প্রাণে আমার সাহায্য চাইলে আমি চিরদিনই তোমাকে সাহায্য করব। কোনো দিন তোমার বিরুদ্ধাচরণ করব না।'

নরজিসের এই কথাগুলির মধ্যে বিদায়ের সুর বেজে উঠল। গোল্ডমুণ্ড তার বন্ধুর দিকে অপলক তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখদুটির স্থির দৃষ্টি যেন অনেক দূরে আনমনে নিবদ্ধ হয়ে আছে। মনে মনে সে অনুভব করতে পারছে তারা দুজনে এখন আর বন্ধু নেই। তাদের নিজস্ব জীবনধারা দু জনকে বিযুক্ত করে দিয়েছে। গোল্ডমুণ্ড এখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারল এখানে আর তার স্থান নেই। সে গৃহহীন, ভবঘুরে। এক অজানা পৃথিবী তাকে ডাকছে। তার মায়ের জীবনেও তাই ঘটেছিল। সে তার ঘর ছেড়ে, স্বামী, পুত্র, সমাজ ছেড়ে জীবনের যাকিছু সুন্দর, সহজ, সব ত্যাগ করেছিল। নিয়ম, নীতি, শ্রদ্ধা, কর্তব্য—সব ছেড়ে এক অচেনা বিশাল পৃথিবীর অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারপর কোথায় তলিয়ে গেল চিরতরে। তারই মত তার মায়েরও কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল না; নরজিস অনেক আগেই একথা বুঝতে পেরেছিল। তার প্রতিটি ধারণা কত সত্য!

ক্রমে নরজিস গোল্ডমুণ্ডের জীবন থেকে মুছে যেতে লাগল। তার সর্বশেষ ব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্য আজকাল সে সমস্ত কাজ আর দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়ে নির্জনবাস করছে। কঠোর উপবাস করে রাত্রি জেগে সে ধ্যান, আরাধনা করছে। মঠে থেকেও সে যেন অন্য এক জগতে বাস করছে

আজকাল। দু'একবার তাকে দেখা গেলেও তার কাছে আর যাওয়া যায় না। তাদের দুজনের মধ্যে কথাও হয় না এখন। নরজিস আর তার কেউ নয়, তার জীবন থেকে সে হারিয়ে গেছে চিরতরে। এই সকল ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এটাও তার কাছে স্পষ্ট হল যে নরজিসের জীবনাদর্শ তাকে মুগ্ধ করে নরজিসের মত হবার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছে। মহান্তকে গোল্ডমুণ্ড ভালবেসেছে, তাঁর মত হবার আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করেছে মনে মনে তবু তার কাছে মেরিয়াব্রোনের সবকিছুই নরজিস ছাড়া সম্পূর্ণ অর্থহীন। তা হলে সে কেন আর এখানে থাকবে?

আজকাল গোল্ডমুণ্ডের মঠের দিনগুলি বিদায়ের সুরে বেজে উঠে বড় মন্থর হয়ে পড়েছে যেন। মঠের কি কি জিনিস এবং কাকে সে ভালবেসেছে ভাবতে চেষ্টা করল। মঠ থেকে চলে গেলে মাত্র দু-একজন ছাড়া অন্য কারও জন্যই তার প্রাণ কাঁদবে না। নরজিস, মহান্ত ড্যানিয়েল আর সৌম্য, শান্ত, বৃদ্ধ ডাক্তার ফাদার আনসেলমকে সে ভালবেসেছে। তার বন্ধু দারোয়ান, হাসি-খুশি-ভরা প্রতিবেশী মিলচালক—এদের কথাও সে ভুলতে পারবে না হয়তো। ছোট্ট ভজনালয়ে মাতা মেরীর বিরাট প্রস্তরমূর্তি আর তোরণপথের খিলানের ওপর খ্রীষ্টের দ্বাদশ জন প্রিয় শিষ্যের মূর্তিগুলির কাছ থেকে বিদায় নিতে মন চায় না তার। এদের দেখে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। মঠের প্রাঙ্গণে লেবু আর বাদাম গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে মন চায়। এখান থেকে চলে গেলে এ সমস্ত শুধুই স্মৃতি হয়ে দাঁড়াবে তার অন্তরের মণিকোঠায়। ছোট্ট ছবির বইয়ের মত এখনও তারা তাকে ঘিরে রয়েছে, তবুও কেমন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

এখন শুধু একটি ভাবনাই তার মন জুড়ে রয়েছে। দুরু দুরু বুকে আপন অন্তরের দুর্নিবার কামনা, তার স্বপ্নের আনন্দ আর আশঙ্কার অনুভূতিকে উপভোগ করাই তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপন অন্তরের গহনে ডুব দিয়ে আপনাতে আপনি মগ্ন রয়েছে সে। তার সহপাঠীদের কথাও সে নিঃশেষে ভুলে গেল। অনুচ্চারিত সঙ্গীতের গভীরে সে ডুবে যাচ্ছে বুঝি। বিচিত্র রহস্যময় সুরের ঝঙ্কার আর রূপকথার দেশের ঘটনা-প্রবাহ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মায়ের স্বর বেজে উঠছে চারদিকে, মায়ের দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়।

৬

একদিন ফাদার আনসেলম গোল্ডমুণ্ডকে তাঁর ফার্মেসিতে ডেকে পাঠালেন। তাঁর ছোট্ট ঘরখানিতে সর্বদাই মৃদু মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়ায়। এই ঘরটিতে থাকতেই ভালবাসেন তিনি। গোল্ডমুণ্ড এলে বৃদ্ধ ডাক্তার সযত্নে রক্ষিত একটি শুকনো ফুল দেখিয়ে তার নাম সে জানে কি-না জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে গোল্ডমুণ্ড এই ভেষজসম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ যথাযথ বলতে পারল দেখে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী খুব খুশি হলেন। এই ভেষজ লতা আর ফুলগুলি যেখানে যেখানে যথেচ্ছ বেড়ে উঠেছে সেখানকার পথের নিশানা বলে দিয়ে সেদিন দুপুরবেলাতেই কিছু ফুল লতা তুলে আনবার জন্য তিনি গোল্ডমুণ্ডকে আদেশ করলেন। স্কুলঘরের বেঞ্চের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকার পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টা বেশ মনের আনন্দে ফুল, লতাপাতা তোলা যাবে, তাই এমন মজার কাজের দায়িত্ব পেয়ে ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাল সে। তার আনন্দকে সম্পূর্ণ করবার জন্য ব্রাদার অসলারের কাছ থেকে তার টাট্টুঘোড়া ব্লেসকে দুপুরের খাওয়ার পর আনল চেয়ে সে। ব্লেস তাকে দেখে নিঃশ্বাস ছেড়ে আনন্দ প্রকাশ করল যেন। গোল্ডমুণ্ড এক লাফে ব্লেসের পিঠে চড়ে গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত উজ্জ্বল দুপুরে আনন্দিত মনে উধাও হয়ে গেল। একটি ঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল উদ্দেশ্যহীনভাবে; নির্মল হাওয়া আর ক্ষেতখামারের সুবাস গ্রহণ করল বুকভরে। তারপর হঠাৎ তার কাজের কথা মনে পড়ল। ফাদার আনসেলমের বর্ণনা অনুসারে একটি জায়গাও খুঁজে বের করল এবার।

একটা গাছের ছায়ায় ঘোড়াটাকে বেঁধে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলে তাকে রুটি খেতে দিয়ে ভেষজ ফুল, লতা সংগ্রহ করবার জন্য পথ চলতে লাগল। এদিকে বেশ খানিকটা পতিত জমি ছড়িয়ে রয়েছে। রকমারি ভেষজ ওষধির লতাপাতা অবাধে বেড়ে উঠেছে সেখানে। শুকনো পপি-বৃন্তদের বিবর্ণ পাঁপড়িগুলি তখনো সব ঝরে পড়েনি মাটির বুকে। কলাই গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাকা পাকা মটরশুঁটির গাছ উঁকি ঝুঁকি মারছে। আকাশের মত নীল রঙের বন্য চিকরি আর গুচ্ছ গুচ্ছ আগাছার রঙ্গিন মেলা চারদিকে।

দুটি ক্ষেতের মাঝখানে স্তূপীকৃত পাথরের আনাচে কানাচে সবুজ রঙের কাঠবিড়ালীরা খেলা করছে। ঠিক সেই জায়গাটিতেই ওষধির পুষ্পিত হলদে বর্ণের ঝোপ দেখতে পেয়ে গোল্ডমুণ্ড সেগুলি সংগ্রহ করতে লাগল। দুহাত ভরে ওষধি সংগ্রহ করবার পর সে পাথরের স্তূপের উপর বিশ্রাম করতে বসল। এখানটায় বেশ গরম। দূর বন-প্রান্তের গভীর নীলাভ ছায়ার মায়া তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু ওষধি ফুল, লতাপাতা আর ব্লেসকে এখানে ফেলে রেখে অত দূরে যেতেও তার মন চায় না। এখানে বসে থেকেই ঘোড়াটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাই পাথরের স্তূপের ওপর সে স্থির হয়ে বসে রইল, একটা কাঠবিড়ালী এই পথে দৌড়ে এসে ওষধির গন্ধ শুঁকবে এই আশা নিয়ে। ফুলের ছোট ছোট পাপড়ি-গুলিকে আলোর দিকে তুলে ধরে প্রতিটি পাপড়ির বুকে অসংখ্য সূক্ষ্মাগ্র কারুকার্য দেখতে লাগল গোল্ডমুণ্ড। আপন মনে ভাবল সে, 'কী বিচিত্র এরা।'

গোল্ডমুণ্ড একটা শূন্য শামুকের খোসা তুলে নিল। পাথরের ওপর থেকে টুং টাং শব্দ করে গড়িয়ে পড়ে সেটা সেখানেই রোদের তাপে গরম হচ্ছিল এতক্ষণ। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গোল্ডমুণ্ড শামুকটির বুকের শঙ্খিল রেখাগুলির দিকে তাকিয়ে রইল। শামুকটির ছোট্ট মুকুটের কী বিচিত্র পেঁচালো কারুকার্য! বুকের ভেতরটা শূন্য, আলোর দ্যুতি মুক্তা বিন্দুর মত টলমল করছে সেখানে। গোল্ডমুণ্ড চোখ বুজে আঙুল বুলিয়ে শামুকটিকে অনুভব করতে লাগল এবার। এটা তার একটা পুরানো খেলার রীতি। হাতের মুঠোয় আঙুলের ফাঁকে খুব আস্তে শামুকটিকে ধরে ধীরে ধীরে সে ঘোরাতে লাগল আর এভাবেই সেটার সমগ্র আকার অনুভব করতে করতে যেন পৃথিবীর সমস্ত দেহী পদার্থের অলৌকিক রহস্য উপলব্ধি করছে সে। হঠাৎ তার মনে হল, 'আমরা তো আমাদের মন দিয়ে, ভাবনা দিয়ে প্রত্যেকটি পদার্থের স্বরূপ বুঝতে পারি।' এভাবে কত কি ভেবে চলেছে গোল্ডমুণ্ড। শামুকের খোসাটা তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল এবার। গভীর তন্দ্রার আবেশে চোখদুটি জড়িয়ে আসছে, ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে। তার মাথা ভেষজ ফুল আর লতাপাতার ওপর ঝুঁকে পড়ল। সেগুলি তখন শুকনো হতে আরম্ভ করেছে, তাই একটা তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আর সেই গন্ধের নেশায় গোল্ডমুণ্ড ঘুমিয়ে পড়ল রৌদ্রতপ্ত

পাথরটির ওপরেই। তার জুতোর ওপর পিঁপড়েরা জড়ো হয়েছে, বিবর্ণ ভেষজের বাণ্ডিল হাঁটু-তুটির ওপর পড়ে আছে। ব্লেস দূরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে চিবোচ্ছে আর মাঝে মাঝে গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ করছে।

এমন সময় দূরের ঐ বন থেকে একটি যুবতী কৃষক মেয়ে এদিকে এগিয়ে এল। তার পরনে নীলাভ পোশাক, কাল চুলে লাল রুমাল বাঁধা। রোদে পুড়ে মুখখানি তামাটে দেখাচ্ছে। ঠোঁট তুটি লাল ফুলের রসে রক্তিম। মেয়েটি ঘুমন্ত গোল্ডমুণ্ডকে দেখে থমকে দাঁড়াল। একটু দূর থেকে সে তাকে কৌতূহলী, অবিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর সে ঘুমিয়ে আছে সে বিষয়ে নিঃসংশয় হয়ে মেয়েটি খালি পায়ে খুব সন্তর্পণে তার কাছে এগিয়ে গেল। আর তার কোনো ভয় নেই। সুন্দর ঘুমন্ত ছেলেটিকে দেখতে তার বেশ ভাল লাগছে। এখন তাকে আর বিপদ-জনক মনে হচ্ছে না। এই প্রান্তরের মধ্যে কেমন করে এল সে ? মৃদু হেসে আপন মনে ভাবল, ছেলেটি তাহলে ফুল তুলছিল। কিন্তু তার ফুলগুলি যে এরই মধ্যে সব শুকিয়ে গেছে !

গোল্ডমুণ্ড চোখ খুলল, স্বপ্নরাজ্য থেকে যেন সে ফিরে এল। অনুভব করল কোমল কিছুর ওপর মাথা রেখে শুয়েছে সে। পরমুহূর্তেই বুঝল একটি মেয়ের কোলে সে শুয়ে আছে। তার তন্দ্রালু, বিস্ময়-ভরা চোখের ওপর অজানা তুটি দরদী বাদামী চোখ ঝুঁকে পড়েছে। গোল্ডমুণ্ড চমকে উঠল না। সে জানে ভয়ের কোনো কারণ নেই। তুটি বাদামী রঙের উজ্জ্বল তারা যেন তার ওপর আলো বিকীরণ করছে। গোল্ডমুণ্ডের বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি দেখে মেয়েটি মৃদু হাসল। গোল্ডমুণ্ড তার সেই হাসিতে একটা শান্ত, সহজ ভাব দেখে হাসতে লাগল। তার হাসি-মাখা ঠোঁট তুটির ওপর মেয়েটি তার মুখ নামিয়ে আনতেই সে আত্মসমর্পণ না করে পারল না। গোল্ডমুণ্ডের মনে গাঁয়ের সেই রাতের স্মৃতি ভেসে উঠল। কাল চুলের এলো খোঁপা-বাঁধা সেই কুমারী মেয়েটির কথা ভাবল সে। মেয়েটির মুখ তার মুখকে তখনও স্পর্শ করে আছে। তার ঠোঁট তুটি গোল্ডমুণ্ডের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিল, দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিহরণ জাগাল। কৃষক মেয়েটির কোলের ওপরেই মাথা রেখে চোখ বুজে সে শুয়ে রইল। তুজনের একজনেও একটি কথা বলছে না। মেয়েটি স্থির, নিশ্চল হয়ে ধীরে ধীরে গোল্ডমুণ্ডের চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে শুধু। গোল্ডমুণ্ড একটু একটু করে নিজেকে ফিরে

পাচ্ছে আবার। একসময় সে চোখ খুলল। 'কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ?' প্রশ্ন করল গোল্ডমুণ্ড।

'আমি লিসা,' মেয়েটি উত্তর দিল।

'লিসা', গোল্ডমুণ্ড খুশি-ভরা স্বরে বলল, 'লিসা, তুমি ভারী সুন্দর!'

লিসা গোল্ডমুণ্ডের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'আমার আগে কাউকে তুমি ভালবাসনি?'

গোল্ডমুণ্ড মাথা নাড়ল। তারপর সহসা উঠে বসে নিজের চারধারে একবার তাকিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। 'ও, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আমাকে এখনই ফিরতে হবে।'

'কোথায় যাবে?'

'মঠে।'

'মেরিয়াব্রোনে? সেখানেই থাক বুঝি? তুমি কি ব্রহ্মচারী?'

'না। আমি শিক্ষার্থী। কিন্তু সেখানে আর থাকব না। তোমার কাছে আবার আসতে পারব কি লিসা? কোথায় থাক তুমি? বাড়ি কোথায় তোমার?'

'আমার বাড়ি নেই। কিন্তু তোমার নামটি আমায় বল।

'গোল্ডমুণ্ড'।

'ও, তোমাকে সকলে বুঝি গোল্ডমুণ্ড বলে ডাকে?'

'হাঁ কোথাও তোমার বাড়ি নেই? তাহলে কোথায় থাক?'

'তুমি চাইলে আমি তোমার সঙ্গে বনের মধ্যে বা যেখানে হোক্ থাকব। আসবে?'

'হাঁ, আসব। কোথায় দেখা পাব তোমার?'

'আচ্ছা, আজ রাত্রে মঠ থেকে বেরিয়ে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

গোল্ডমুণ্ড মঠে ফিরে এল। ফাদার আনসেলমকে ব্যস্ত দেখে খুশি হল সে। একজন ব্রহ্মচারী নদীতে দাঁড় টানতে টানতে চকমকি পাথরে পা কেটে ফেলেছে। এবারে নরজিসকে খুঁজে বার করতে হবে। গোল্ডমুণ্ড তাড়াতাড়ি তার খোঁজে চলল। নরজিস প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য নির্দিষ্ট ছোট্ট একটি ঘরে রাত্রিবাস করে। নিয়ম কানুনের কথা চিন্তা না করেই গোল্ডমুণ্ড দৌড়ে সেদিকে গেল। পা টিপে টিপে চুপিসারে সে ঘরের ভেতর ঢুকল। ঘরের

ভেতরে আধো আলো আধো অন্ধকারে, সংকীর্ণ খড়ের গদির ওপর নরজিস মৃতের মত স্থির হয়ে শুয়ে আছে। হাত-দুখানি বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রয়েছে। কিন্তু সে ঘুমায় নি। কিছু না বলে গোল্ডমুণ্ডের দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টিতে জীবনের কোনো স্পন্দন নেই। বাইরের সবকিছু থেকেই তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন।

'নরজিস! নরজিস! তোমাকে জাগাচ্ছি বলে ক্ষমা কর। জানি তোমার সঙ্গে এখন কথা বলা বারণ, তবু অনুরোধ করছি সে কথা ভুলে গিয়ে তুমি আমার সঙ্গে একটিবার কথা বল।'

অবাক বিস্ময়ে চক্ষু মিট মিট করে নরজিস উঠে বসল। অনেক কষ্টে যেন সে তার জীবনীশক্তি ফিরিয়ে এনেছে। 'আমাকে কি খুবই প্রয়োজন?' নির্লিপ্ত ক্ষীণ স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ। আমি তোমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে এসেছি।'

খাটিয়ার ওপর ক্ষীণ-দেহ নরজিস বসে আছে. বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। গোল্ডমুণ্ড তার পাশে বসল।

অপরাধীর সুরে গোল্ডমুণ্ড বলল, 'আমাকে ক্ষমা কর, বন্ধু'।

'ক্ষমা করবার কিছু নেই। আমার কাছে কোনো কথা গোপন করো না। বিদায় নিতে এসেছ বলছ, তাহলে কি মঠ থেকে চলে যাচ্ছ তুমি?'

'হ্যাঁ, আজই চলে যাব। ওঃ, কেমন করে তোমাকে সব কথা বলব? হঠাৎই স্থির করেছি।'

'তোমার বাবা এসেছেন? না লোক মারফত কোনো খবর পাঠিয়েছেন?'

'না, সেসব কিছু নয়। আমি জীবনের ডাক শুনতে পেয়েছি। মহান্ত আর আমার বাবাকে না জানিয়েই আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব। মঠ থেকে পালিয়ে গিয়ে তোমাদের ওপর আমি হয়তো কলঙ্ক লেপন করব নরজিস।'

নরজিসের কঠিন, ক্লান্ত মুখে হাসি না থাকলেও কথার সুরে প্রসন্নতার আভাস। 'শোন বন্ধু, আমাদের সময় খুবই অল্প। আমাকে যা বলবার সংক্ষেপে স্পষ্ট করে বলে ফেল। আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে আমিই বলব কি?'

'বল,' অনুনয়ের স্বরে গোল্ডমুণ্ড বলল।

'তুমি প্রেমে পড়েছ।'

'আশ্চর্য, কেমন করে আমাকে তুমি বুঝতে পার, আমার সবকিছু জানতে পার!'

'এটা খুবই সহজ। তোমার মুখ এবং ভাবভঙ্গিই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছে তুমি প্রেমে পড়েছ। প্রেমে পড়লে যে উদ্দাম মাদকতা মানুষকে বিভোর করে দেয় তারই পূর্ণ প্রকাশ দেখছি তোমার চোখে মুখে, ভাবভঙ্গিতে। কিন্তু তুমি নিজেই সব খুলে বল বন্ধু।'

গোল্ডমুণ্ড তার বন্ধুর কাঁধে লজ্জিতভাবে হাত রাখল। 'কিন্তু নরজিস, এবার তোমার ধারণা সম্পূর্ণ সত্য হয় নি। এটা মাতলামির পর্যায়ে পড়ে না, বরং ঠিক তার বিপরীত। আমি মাঠের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠে দেখলাম একটি মেয়ের কোলে আমার মাথা রয়েছে। মেয়েটিকে দেখেই মনে হল, আমার মা আমার কাছে ফিরে এসেছে, আমাকে কোলে তুলে নিয়েছে। এই মেয়েটিকেই যে আমি মা ভাবলাম তা অবশ্য নয়। তার দুটি চোখ নিবিড় বাদামী রঙের, চুল কাল, আর আমার মায়ের চুল আমারই মত স্বর্ণাভ। মায়ের চেহারাও একেবারে অন্য রকম। কিন্তু তবুও যেন মা-ই ফিরে এসেছে মনে হল। মা আমাকে ডাক দিয়েছে। এই মেয়েটি যেন মায়েরই দূতী হয়ে এসে আমাকে কোলে শুইয়ে ফুলের কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দেবার মত করে আমাকে সন্তর্পণে চুমু খেল। সে আমার সঙ্গে শান্ত, সুন্দর ব্যবহার করল। তার প্রথম চুম্বনস্পর্শে আমার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিচিত্র এক বেদনার শিহরণ জাগল। আমার জীবনের সকল চাওয়া, ভেতরকার সুপ্ত গোপন রহস্য এবং মধুর ভয়ভাবনা সবই অন্য এক অর্থ নিয়ে নূতনভাবে ধরা দিল আমার কাছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সে যেন আমার বয়স অনেক বাড়িয়ে দিল। এখন আমি অনেক কিছুই বুঝি। এই মঠে আর একদিনও বাস করতে পারি না। এ বিষয়েও সহসা যেন নিশ্চিত হলাম। আঁধার ঘনিয়ে এলেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি পালিয়ে যাব।'

নরজিস তার কথা শুনছে। মাথা নেড়ে বলল এবার, 'তোমার মধ্যে এই ভাবান্তর হঠাৎই হয়েছে। এটাই আমি আশঙ্কা করছিলাম।'

'মহান্তকে আমার হয়ে বলবে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। মঠের মধ্যে তোমাদের দুজনকেই আমি শ্রদ্ধা করি। আমার কথা যখনই ভাববে তখনই আমার জন্যে প্রার্থনা করবে। আর···তোমাকে অনেক ধন্যবাদ নরজিস।'

‘কিসের জন্য গোল্ডমুণ্ড ?’

‘তোমার ধৈর্য, তোমার বন্ধুত্বের জন্য। তোমার এত অসুবিধা সত্ত্বেও আজকে আমার কথা শুনছ এবং আমার কাজে বাধা দিচ্ছ না বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

‘আমি কেন বাধা দেব ? এসব ব্যাপারে আমার মতামত তো তুমি জানই। কিন্তু তুমি এখন কোথায় যাবে গোল্ডমুণ্ড ? মেয়েটির কাছে যাচ্ছ ? কোনো উদ্দেশ্য আছে কি ?’

‘হাঁ, আমি তার সঙ্গে যাব। এ ছাড়া আমার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। মেয়েটি ভবঘুরে। তার নাকি ঘরবাড়ি নেই। হয়ত জিপসী।’

‘আমার মনে হয় তাকে বেশি বিশ্বাস করা উচিত হবে না। হয় ত তার স্বামী পুত্র পরিজন সবই আছে। তারা তোমাকে কেমন অভ্যর্থনা জানাবে কে বলতে পারে !’

গোল্ডমুণ্ড বন্ধুর কাছে এগিয়ে এসে বলল, ‘এখন পর্যন্ত ওসবকিছুই ভাবিনি। তোমাকে বলেছি তো আমার কোন উদ্দেশ্য নেই। আমাকে যেতে হবে বলেই আমি যাচ্ছি। আমি যে জীবনের ডাক শুনেছি।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সে নীরব হল। তারা দুজনে ঘন হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তাদের চেহারায় বেদনার ছায়া পড়েছে। গোল্ডমুণ্ডই আবার কথা বলল, ‘আমি এখানে থাকতে পারব না নিশ্চিত জেনেই খুশি মনে চলে যাচ্ছি। আজ আমি বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আমি নিজেকে প্রতারণা করি না। মঠের বাইরেই কেবল আনন্দ এ কথাও কল্পনা করিনা। আমার পথ কঠিন, অসরল হবে তাও আমি অনুভব করতে পারি। এখন তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় এসেছে। আমি তোমাকে ভালবাসি নরজিস। আচ্ছা, তুমি কি আমাকে ভুলে যাবে ?’

‘আমি তোমাকে কখনো ভুলব না। তুমি আমার কাছে আবার ফিরে আসবে। তোমার ফিরে আসার প্রার্থনাই আমি করব সর্বদা। তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব। কখনও যদি কোনো বিপদ বা অসুবিধায় পড় তাহলে আমার কাছে চলে এসো বা খবর পাঠিও। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন বন্ধু।’

নরজিস উঠে দাঁড়াল। গোল্ডমুণ্ড তাকে আলিঙ্গন করল। নরজিস তার হাতদুটিকে গভীর ভাবে জড়িয়ে ধরল।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। নরজিস তার ঘরের দরজা বন্ধ করে মঠের ভেতরকার চার্চের দিকে চলল। দুচোখ-ভরা ভালবাসা নিয়ে গোল্ডমুণ্ড নরজিসের ক্ষীণ দেহটিকে বারান্দার গোলাকৃতি বাঁক ঘুরে চার্চের নিঃসীম অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল।

ক্লান্তিতে অর্ধমৃত নরজিসের বিবর্ণ রক্তহীন মুখ, ফ্যাকাশে ক্ষীণ দুটি হাত, তবুও সে তার বন্ধুকে সহৃদয় দরদ দেখাতে কার্পণ্য করে নি! তার আশা-নিরাশার কথা শোনবার জন্য কঠোর সাধনার অন্তবর্তী স্বল্পকালের বিশ্রামটুকুকেও ত্যাগ করতে দ্বিধা করে নি সে। এই জগতে এমন নিঃস্বার্থ, আত্মিক ভালবাসা আছে এ কথা ভাবতেও মন গৌরবে ভরে ওঠে। রোদ-ভরা প্রান্তরের মাঝে রক্তমাংসের সেই উদ্দাম মত্ত ভালবাসার চাইতে এই ভাল-বাসা কত ভিন্ন। তবুও দুই-ই তো ভালবাসা, ভালবাসার দুই রূপ। নরজিস এখন তার কাছ থেকে কত দূরে চলে গেছে। শেষের এই একঘণ্টা একসঙ্গে থেকে আরও স্পষ্ট করে তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে তাদের দুজনের স্বভাব কত বিপরীত। প্রতীক্ষমাণা লিসার কোমল দেহের উষ্ণতাকে যেমন করে ভালবাসে সে, ঠিক তেমনই গভীরভাবে ঐ অন্ধকার চার্চের নিঃসঙ্গতায় তার প্রিয়তম বন্ধুকেও ভালবাসে। কিন্তু আপন ভাগ্যের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেওয়া ছাড়া এখন অন্য কিছু করবার নেই তার।

পরস্পর-বিরোধী অসংখ্য আশা-নিরাশা বুকে নিয়ে দ্বন্দ্ব-ভরা মনে চুপিসারে সে মঠের লেবুবাগান পেরিয়ে মিল ঘরের উপর উঠল পালিয়ে যাবে বলে। অনেকদিন আগে কনরাডের সঙ্গে সেই সন্ধ্যাবেলার স্মৃতি সহসা তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠতেই সে মনে মনে হাসল। মঠ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য সেদিনও তারা এই একই গোপন পথে গাঁয়ের দিকে গিয়েছিল। ছোট্ট গর্তের মধ্য দিয়ে একে একে হামাগুড়ি দিয়ে যখন তারা বের হচ্ছিল সেদিন, তখন তার মন কী এক আতঙ্ক আর উত্তেজনায় ভরে উঠেছিল! কিন্তু এখন সে অনেক বেশি নিষিদ্ধ আর বিপদজনক পথে অনায়াসে চলে যেতে পারে, এতটুকুও ভয় পাবে না। এবার মিল ঘরে কোনো তক্তা ছিল না, তাই সেতু ছাড়াই তাকে ঝরনা পার হতে হল। বরফের মত ঠাণ্ডা জলে তার বুক পর্যন্ত ডুবে গেল। ঝরনা পার হয়ে যখন পোশাক পরল তখন চিন্তাশীল নরজিস আবার তার ভাবনায় ফিরে এল। তার কাছে

সে বোকার মত কত কথাই না বলে ফেলেছে। এক চরম মুহূর্তে নরজিসই তার দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল। নরজিসের কয়েকটি কথা এখনো যেন তার কানে বাজে : '…তুমি তোমার মায়ের বুকে ঘুমাও আর আমি শূন্য মরুভূমিতে বিনিদ্র জেগে থাকি।'…'তুমি কেবল মেয়েদের কথা ভাব, তাদেরই স্বপ্ন দেখ। আর আমার ভাবনা শুধু ছেলেদের ঘিরে।…'

সহসা গোল্ডমুণ্ডের বুকটা ভয়ে আতঙ্কে শুকিয়ে উঠল যেন। রাত্রির অন্ধকারে একাকী সে দাঁড়িয়ে রইল ভীত, শঙ্কিত মনে। তার পেছনে পড়ে রয়েছে মেরিয়াব্রোনের মঠ। সেটা তার স্থায়ী আবাস না হয়ে উঠলেও সেখানে সে অনেক দিন থেকেছে, ভালবেসেছে তাকে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অনুভূতিও এল তার মনে। নরজিস এখন আর তার অভিভাবক, পথপ্রদর্শক ও বন্ধু নয়। আজই সে বুঝতে পেরেছে তার জীবনের পথ তাকে একেলাই খুঁজে নিতে হবে, সেখানে নরজিসের কিছুই করবার নেই। এখন আর সে মঠের ছাত্র নয় ; শিশুও নয় সে।

সব বুঝতে পেরেও বিদায় নিতে কত কষ্ট হচ্ছে তার। অন্ধকার চার্চের মধ্যে প্রার্থনারত নরজিসের কথা চিন্তা করতেও মন ব্যথায় ভরে উঠছে। দীর্ঘদিনের জন্য, হয়তো বা চিরকালের জন্যই তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। তাকে আর দেখতে পাবে না, তার স্বর শুনতে পাবে না, এই চিন্তা যে বড় বেদনাময়! এসব ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গোল্ডমুণ্ড এবার পথ চলতে লাগল। মঠের প্রাচীর পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে সে থামল।

লিসা বন থেকে বেরিয়ে তারই দিকে এগিয়ে এল। গোল্ডমুণ্ড হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করল। মাথা, হাত, চুল, কাঁধ—সর্বাঙ্গ স্পর্শ করে মেয়েটির তন্বী, তরুণ দেহখানিকে শান্তভাবে অনুভব করল গোল্ডমুণ্ড। তারপর তার কোমর জড়িয়ে ধরে তারা দুজনে নীরবে পথ চলতে লাগল বনভূমির নিবিড় অন্ধকার ভেদ করে।

বেশ কিছুক্ষণ পর তারা একটি খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল ; মাথার ওপরে পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখা যাচ্ছে, সামনে তৃণাচ্ছাদিত উপত্যকা। অদূরে ঝির ঝির করে নীরবে বয়ে চলেছে একটি ছোট্ট নদী। সেটা তারা হেঁটেই পার হল। এই খোলা জায়গাটি বনের চাইতেও অনেক বেশি নীরব, নিথর। লিসা একটা বিরাট খড়ের গাদার কাছে এসে থামল।

'আমরা এখানে থাকব', লিসা বলল।

তারপর খড়ের ওপর দুজনে পাশাপাশি শুয়ে পড়ে বিশ্রাম করতে লাগল। ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে তারা রাত্রির নীরবতা উপভোগ করতে করতে অনুভব করল তাদের কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম আস্তে আস্তে শুকিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। গোল্ডমুণ্ড খুশি-ভরা মনে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খড়ের গন্ধ বুক ভরে গ্রহণ করতে লাগল। অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো কথাই সে এখন আর চিন্তা করছে না। তার প্রেমিকার দেহের বিচিত্র ঘ্রাণ আর উষ্ণতা একটু একটু করে তাকে প্রেমের মাদকতার মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছে কেবল। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সে লিসার ঠোঁটে চুমু খাবার জন্য মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়তেই সহসা এক ঝলক ম্লান আলোর ঝিকিমিকি দেখতে পেল লিসার চোখে, কপালে। অবাক হয়ে সে থেমে গেল। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পেছন ফিরে দেখল অন্ধকার বনভূমির মাথার ওপরে নীল আকাশের বুকে চাঁদ তখন জেগে উঠেছে। তারই মৃদু আলোর আভা লিসার কপালে, গালে, গলায় ছড়িয়ে পড়েছে। গোল্ডমুণ্ড লিসার কানে কানে বলল, 'তুমি কী সুন্দর!'

পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি ফুটে উঠল লিসার মুখে। তার মধ্যে কেমন এক বিচিত্র মধুর ভাব ফুটে উঠেছে। মনে হচ্ছে মুহূর্তে তার নিজের কাছেও যেন তার আপন সৌন্দর্য, মাধুর্য ধরা পড়ল এই প্রথম।

সাত

আকাশের বুকে রাত্রিশেষের চাঁদ ঢলে পড়ল নির্জন প্রান্তরে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে। দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের সুখশয্যায় শুয়ে আছে পাশাপাশি। কখনো ঘুমিয়ে, কখনো জেগে তারা পরস্পরকে অনুভব করছে। লিসা খড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে শুয়ে রইল, গোল্ডমুণ্ড নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে। গভীর এক বেদনাবোধ দুজনেরই মনকে ছেয়ে ফেলেছে। তার থেকে মুক্তি পাবার জন্যই যেন কখন তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। গোল্ডমুণ্ড জেগে উঠে দেখল লিসা তার লম্বা কাল চুল বাঁধছে। তন্দ্রালু চোখে সে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'জেগে গেলে এরই মধ্যে?'

লিসা চমকে ফিরে তাকাল। অপরাধীর মত ক্ষীণ স্বরে সে বলল, 'আমাকে এখনই যেতে হবে। তোমাকে জাগাতে চাইনি।'

'কিন্তু আমি তো জেগে গেছি। আমরা একই পথের সাথী, তাই নয়কি? আমাদের দুজনেরই কোনো ঘরবাড়ি নেই।'

'হাঁ, বাড়ি আছে আমাদের। আর তুমি তো মঠ থেকেই এসেছ।'

'আমি মঠে আর কোনোদিন ফিরেই যাব না। আমি তোমারই মত একা, আমার কোনো ঘর নেই, তাই তোমার সঙ্গেই আমি যাব।'

লিসা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগল, 'না, তুমি আমার সঙ্গে আসতে পার না। আমাকে আমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে হবে। বাইরে রাত কাটাবার জন্য সে আমাকে মারবে হয়ত। তাকে বলব আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু তবু সে আমার কথা বিশ্বাস করবে না।'

এবার গোল্ডমুণ্ডের মনে পড়ল নরজিস ঠিক এরকম ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিল সেদিন। উঠে দাঁড়িয়ে লিসার দিকে হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে তার হাত ধরে গোল্ডমুণ্ড বলল, 'আমি তাহলে ভুল করেছি? ভেবেছিলাম আমরা দুজনে চিরদিন একসঙ্গে থাকব। কিন্তু তুমি কি সত্যিই আমাকে এভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে একটি কথাও না বলে লুকিয়ে চলে যেতে চেয়েছিলে?'

'আমি ভেবেছি তুমি জানতে পারলে অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে হয়তো মারবে। আমার স্বামী আমাকে মারধোর করে। সেটা তার ন্যায্য অধিকার, তাতে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু তুমি আমাকে মারবে তা আমি চাই নি।'

গোল্ডমুণ্ড তার হাতখানি শক্ত করে ধরে রইল।

'লিসা, আমি তোমাকে কখনো মারব না। আজ নয়, কোনদিনই নয়। যে স্বামী তোমাকে মারে তার কাছে ফিরে না গিয়ে আমার সঙ্গেই তুমি এস, আসবে?'

লিসা তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠল, 'না, না, না।

গোল্ডমুণ্ড বুঝল লিসা সত্যই তার কাছ থেকে চলে যেতে চাইছে। তাই এবার তার হাতখান সে ছেড়ে দিল। লিসা কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতেই সে দৌড়ে চলল। দুহাতে চোখ মুখ ঢেকে সে তার কাছ থেকে ছুটে পালাচ্ছে। গোল্ডমুণ্ড আর একটি কথাও বলল না, নীরবে লিসাকে চলে যেতে দেখছে শুধু। নূতন ফসল কাটা ক্ষেতের ওপর দিয়ে তাকে দ্রুত পায়ে দৌড়ে চলে যেতে দেখে গোল্ডমুণ্ড ভাবতে লাগল কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন লিসাকে তার কাছ থেকে টেনে দূরে নিয়ে চলেছে।

গোল্ডমুণ্ড একাকী বসে রইল। নিজেকে কেমন নিঃস্ব, অসহায়, বিপন্ন মনে হল তার। কিন্তু এখনো সে বড় ক্লান্ত। আবার ঘুমুতে চায় সে। এমন ক্লান্তি জীবনে বুঝি আর কোনো দিনই অনুভব করে নি। তার চোখ দুটি ঘুমের আবেশে বুজে আসছে।

মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে সে জেগে উঠল। তারপর একলাফে খড়ের গাদা থেকে উঠে নদীর দিকে দৌড়ে গেল। ভাল করে স্নান করল, জল খেল। সহসা স্মৃতিগুলি মনের পটে আবার ভেসে উঠছে। অজানা দেশের ফুলের মতই কত সৌরভ সে সব স্মৃতির। ক্ষেত-খামারের উপর দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলতে চলতে তার মন স্মৃতি মন্থন করে চলেছে। প্রতিটি আনন্দের মুহূর্তকে আবার সে অনুভব করতে পারছে, তার রূপ-রস-গন্ধ বার বার আস্বাদন করতে পারছে। সুন্দরী মেয়েটি তার মনে কত না সুখস্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছিল, মনের কামনার কুঁড়িতে কত ফুল ফুটিয়ে তার অতৃপ্ত বাসনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল বার বার।

সামনেই ছড়িয়ে আছে বিস্তৃত বন আর অনুর্বর প্রান্তর। সমস্ত বিশ্ব যেন আজ উন্মুক্ত হয়ে গেছে তাকে তার আপন সুখ দুঃখ, আনন্দ-

বেদনা সহ সানন্দে গ্রহণ করবে বলে। তার চলার পথ আর কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডি দিয়ে বাঁধা নয়। এই বিপুল বিশ্বই তার একান্ত আপন। এই আকাশ বাতাস সবই তার আপনার। বিস্তৃত প্রান্তরের বুকে ছোট্ট একটা খরগোসের মতই সে ছুটে চলেছে। চলতে চলতে সহসা তার ক্ষুধা অনুভব হতেই আধখানা বার্লি রুটি, একবাটি দুধ, ঝোল—মঠের এসব খাবারের স্মৃতি তার মনে জাগল। শেষে একটা গমক্ষেতে এসে পড়ে সে আধ-পাকা গমের শিষগুলি দাঁত আর আঙ্গুল দিয়ে টেনে নিয়ে পকেটে পুরল।

আবার বন শুরু হল। পাইন আর ওক গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে এদিক ওদিকে ছাই ছড়ান। চারদিকে বেরিফলের ছড়াছড়ি। গোল্ডমুণ্ড শুয়ে পড়ল সেখানেই। কত নীল ফুল ঘাসের বুকে ফুটে রয়েছে। বাদামী, সোনালী রঙের কত সুন্দর প্রজাপতি তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সহসা গোল্ডমুণ্ড শুনতে পেল কাঠঠোকরা ঠুকঠুক করছে কোথায়। সন্তর্পণে এগিয়ে সে সেটাকে দেখবারও চেষ্টা করল।

মাথার ওপরে কাঠঠোকরার ঠোঁটের ঠুকঠুক শব্দ বেশ ভাল লাগছে তার। বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে গোল্ডমুণ্ড আরও কত রকম পশুপাখি দেখতে পেল। ক্ষেতের ভেতর থেকে খরগোশ বেরিয়ে এসে তাকে দেখা মাত্রই তীরের মত অন্য দিকে ছুটে যাচ্ছে কানগুলি নিচু করে। একবার ফাঁকা জায়গায় এসে সে বিরাট একটি সাপ দেখতে পেল। কিন্তু সেটা একটুও নড়ল না দেখে বুঝল জীবন্ত সাপ নয় সেটা, সাঁপের খোলস মাত্র। খোলসটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। তার বুকে বাদামী আর সবুজে অপূর্ব কারুকার্য। সূর্যের আলো তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে কী চমৎকার দেখাচ্ছে! হলদে ঠোঁটওয়ালা কত আউজেল পাখি দেখতে পেল এবার। গোলাকার কাল, শঙ্কিত ছোট ছোট চোখ মেলে তারই দিকে তাকিয়ে আছে তারা। মাটির বুক ছুঁয়ে একঝাঁক পাখি উড়ে গেল। রেডব্রেষ্ট আর ফিঙ্গে পাখির মেলা চারদিকে। বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা পুকুর। কর্দমাক্ত, বদ্ধ সবুজ ভারী জলের এই ডোবার ওপরে কর্মব্যস্ত মাকড়সার দল একেঅন্যকেঅনুসরণ করছে বিচিত্র এক খেলায় মত্ত হয়ে। আর তাদের ওপরে একজোড়া গঙ্গা-ফড়িং গভীর নীল পাখা দুলিয়ে এদিক ওদিক উড়ছে কেবল।

রাত্রি ঘনিয়ে এলে গোল্ডমুণ্ড আরও অনেক কিছু দেখতে পেল। ঝরা

পাতার মর্মর শব্দ হচ্ছে চারদিকে। কর্কশ, শুকনো মাটি ধপ্ করে ধ্বসে পড়ার শব্দ হচ্ছে। বিরাট, অদৃশ্য একটা জন্তু যেন গাছের পাতাগুলি সরিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করতে করতে এ দিকে আসছে। আবার একসময় সব নিস্তব্ধ হয়ে গেলে তার বুক দুরু দুরু কাঁপতে লাগল। বনের মধ্যে সে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। রাত্রিটা বনের মধ্যেই কাটাতে হবে নাকি? ঘুমোবার জায়গা খুঁজতে লাগল সে। স্তূপীকৃত শৈবালগুচ্ছ সংগ্রহ করল বিছানা পাতবার জন্য। কোনো দিন পথ না খুঁজে পেয়ে যদি চিরকাল এখানেই থাকতে হয় তাহলে কি উপায় হবে ভাববার চেষ্টা করল গোল্ডমুণ্ড।

নীরব, ঘুমন্ত গাছ পালার মাঝে এভাবে একাকী বাস করা সত্যিই অসহ্য। তখন বনের পশুরাই হবে তার একমাত্র সাথী। কিন্তু তার ছায়া দেখা মাত্রই তারা ছুটে পালিয়ে যাবে, তাদের সঙ্গে একটিও কথার আদানপ্রদান হবে না। কোনোদিন একটি লোককেও সে দেখতে পাবেনা।

তৃণশয্যায় ঘুমিয়ে পড়বার আগে গোল্ডমুণ্ড শঙ্কিত অন্তরে নিশুতি রাতের অরণ্যের কত বিচিত্র ভীতিময় দুর্বোধ্য শব্দ কান পেতে শুনল।

ভাবতে ভাবতে গোল্ডমুণ্ড ঘুমিয়ে পড়ল। পশু পাখি আর মানুষের কত স্বপ্ন দেখতে লাগল সে। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে জেগে উঠে মনের মধ্যে গভীর বেদনা অনুভব করল। অনেকক্ষণ এভাবে শুয়ে থেকে কত কি ভেবে চলল। আবার ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

সকালবেলা জেগে অবাক হল সে। কোথায় সে আছে কিছুই যেন মনে করতে পারছেনা। অরণ্যের ভয় আর নেই। মনে মনে বিচিত্র এক নূতন আনন্দ অনুভব করে সে অরণ্যের জীবনকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তবুও এই জীবন থেকে সরে যাবার জন্য চেষ্টা করছে সে। সূর্যের দিকে মুখ করে পথ চলতে লাগল গোল্ডমুণ্ড।

তিনদিন তিনরাত্রি সে বিভ্রান্ত হয়ে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াল। হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করল মানুষের রাজ্যের সীমানায় এসে পড়েছে সে। চাষ করা জমিতে কত বার্লি গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষেতের মধ্য দিয়ে একটু এগিয়ে সে একটা মেঠো পথ দেখতে পেল।

তার দীর্ঘ একঘেয়ে পথ চলার শেষে এখন এই ক্ষেতখামারই যেন বন্ধুর মত তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। পায়ে চলার সঙ্কীর্ণ পথ, শস্যের শুকনো সাদা ফুলগুলি—এ সবই তার বড় ভাল লাগল।

মেঠো পথটি ধরে সে বনের এক প্রান্তে একটি কুটিরের সামনে এসে দাঁড়াল। কুটিরের দরজায় একটি ছোট্ট ছেলে আপন মনে কাদা মাটি নিয়ে খেলা করছে। গোল্ডমুণ্ড এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা করলে সে একজন অপরিচিতকে দেখে চোখমুখ কুঁচকে দরজা দিয়ে দৌড়ে পালাল। গোল্ডমুণ্ড তাকে অনুসরণ করে তাদের রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। সেখানকার আলো এত কম যে বাইরের উজ্জ্বল সূর্যের আলো থেকে এসে প্রথমে কিছুই সে দেখতে পেল না। কিন্তু নিরাপদ হবার জন্যই সে বাড়ির সকলের উদ্দেশ্যে বড়দিনের অভিনন্দন জানিয়েও কোনো উত্তর পেল না। ছেলেটির চীৎকারে শেষ পর্যন্ত একজন বেঁটে বৃদ্ধা অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে চোখের ওপর হাতের আড়াল দিয়ে আগন্তুককে দেখতে লাগল। গোল্ডমুণ্ড বলল, 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনাকে দেখে বড় ভাল লাগছে। বহুদিন কোনো মানুষের চেহারা আমি দেখিনি।'

বৃদ্ধাটি তার কৌতূহল ভরা দৃষ্টি দিয়ে গোল্ডমুণ্ডকে দেখছে। 'কি চাও তুমি?'

গোল্ডমুণ্ড তার দিকে আপন হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার একখানি হাত ধরে আস্তে নেড়ে বলল, 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, শুধু এই কথাটুকুই বলতে চাই মা। আর আপনার রান্নাঘরে একটু বিশ্রাম করতে চাই। চুল্লি ধরাতে আপনাকে আমি সাহায্য করব। এক টুকরো রুটি পেলে খুবই খুশি হব।'

দেওয়ালের গায়ে একটা বেঞ্চ দেখতে পেয়ে গোল্ডমুণ্ড বিশ্রাম করতে বসল। বৃদ্ধা তখন ছেলেটির জন্য রুটির টুকরো কাটছে। ছেলেটি এবারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। আগন্তুকটির দিকে তাকিয়ে সে বৃদ্ধার পাশে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে। বৃদ্ধা রুটির আরেকটি টুকরো কেটে গোল্ডমুণ্ডকে দিলে সে বলল, 'ধন্যবাদ, ঈশ্বর আপনাকে প্রতিদান দেবেন।'

'কোথা থেকে আসছ?'

'মেরিয়াব্রোনের মঠ থেকে।'

'তুমি কি সন্ন্যাসী?'

'না, আমি ছাত্র। দেশভ্রমণে বেরিয়েছি।'

বৃদ্ধা তার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে কিছুটা ব্যঙ্গ ফুটে উঠল। ক্ষীণ দুর্বল ঘাড়ের ওপর মাথাটি একটু একটু কাঁপছে। ছেলেটিকে নিয়ে সে বেরিয়ে গেলে গোল্ডমুণ্ড রুটিটা খেল। একটু পরে বৃদ্ধা ফিরে এসে বলল, 'আমাকে এখন রান্না করতে হবে। উনুনটা ধরাতে আমাকে সাহায্য কর তো!'

গোল্ডমুণ্ড সব কাঠ টুকরো করে দিল। বৃদ্ধার নির্দেশ মত নদী থেকে জল এনে তার দুধের ভাণ্ড থেকে দুধের সর তুলে দিল। তারপর সেই আলো-আঁধারী পরিবেশে বসে বৃদ্ধার কোঁচকানো তোবড়ানো মুখে আগুনের লাল আভার কাঁপন দেখতে লাগল।

বৃদ্ধা গৃহস্বামীর ঠাকুরমা আর সেই ছোট্ট কাঁদুনে ছেলেটির প্রপিতামহী। ছেলেটির নাম ভুনো। গোল্ডমুণ্ডের দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে সে তাকাচ্ছে কিন্তু আর কাঁদছে না। গৃহস্বামী ও তার স্ত্রী এসে অপরিচিত অতিথিটিকে দেখে অবাক হয়ে রইল। লোকটি দ্বিধা-ভরা মনে গোল্ডমুণ্ডের হাত ধরে বাইরে টেনে এনে দিনের আলোয় ভাল করে দেখতে লাগল। এবার সে হেসে গোল্ডমুণ্ডের কাঁধে একটা চাপড় মেরে তাকে ভেতরে এসে খাবার জন্য অনুরোধও জানাল। তারা সব একত্রে খেতে বসল। গোল্ডমুণ্ড সকাল পর্যন্ত তাদের কাছে থাকতে পারবে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে লোকটি জানাল তার থাকবার মত কোন ঘর নেই, তবে বাইরে বিরাট খড়ের গাদা আছে, সেখানেই সে বিছানা করে নিয়ে সহজেই রাত কাটাতে পারে।

তার স্ত্রী পাশে ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে বসেছে। তাদের কথাবার্তায় কোনো অংশ গ্রহণ করছে না সে। কিন্তু তার চোখ-দুটি কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। গোল্ডমুণ্ডের সুষম, সুন্দর গঠন দেখে সে মুগ্ধ হল। বুঝতে পারল আগন্তুকটি শহুরে এবং অভিজাত বংশীয়। এই নবীন যুবকটির গলার স্বরই তাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে। তার কথায় যেন গানের সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে।

তাদের খাওয়া শেষ হলে গোল্ডমুণ্ড হাত ধুতে বাইরে কলের ধারে গেল।

মেয়েটিও তখন কলসী কাঁখে জল ভরতে এসেছে। নিচু স্বরে সে বলল, 'আজ রাত্রে এখানেই যদি থাক তাহলে তোমার জন্য আমি নিজেই রাত্রির খাবার নিয়ে আসব।'

গোল্ডমুণ্ড মেয়েটির তামাটে মুখখানির দিকে তাকাল। কলসী কাঁখে নিলে তার সবল হাত-দুখানির দিকেও তার দৃষ্টি পড়ল। মেয়েটির বড় বড় উজ্জ্বল দুটি চোখে গোল্ডমুণ্ড তার প্রাণের উষ্ণ পরশ অনুভব করছে। একটু হেসে মাথা নাড়ল সে। মেয়েটি ভরা কলসী কাঁখে ততক্ষণে প্রায় দরজার কাছে চলে গেছে। মনে মনে খুশি হয়ে গোল্ডমুণ্ড আরও কিছুক্ষণ সেখানে বসে অদূরে ছোট্ট নদীটির কলতান শুনতে লাগল। কিছুক্ষণ পর গৃহস্বামীকে খুঁজে বের করে তাকে এবং বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে ধন্যবাদ ও অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিল সে।

কিছুদূর এগিয়ে একটা ছোট্ট ভজনালয় দেখতে পেল। অনেক দিনের পুরান শক্ত সবল ওক গাছের সারি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ওক গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের আস্তরণে ঢাকা মাটির কোলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিল সে। মনে মনে ভাবতে লাগল মেয়েদের ভালবাসা কি অদ্ভুত, কি বিচিত্র! কোন কথা বলার প্রয়োজনই হয় না তাদের। এই মেয়েটি একবার মাত্র তার কাছে এসে কোথায় তার সঙ্গে দেখা করবে সেই কথাটি বলে গেল। বাকিটুকু চোখের ভাষায়, তার মৃদু স্বরের বিচিত্র সুরে ধরা পড়েছে। অব্যক্ত এই বিচিত্র গোপন ভাষ্যকে গোল্ডমুণ্ড কত সহজেই না জেনে গেল! রাত্রির কথা চিন্তা করে আনন্দে তার মন নেচে উঠছে। এই সুন্দর মেয়েটিকে নিয়ে মধুর কল্পনায় মেতে উঠে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে সে। হয়তো লিসার চাইতে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির হবে এ মেয়েটি।

কাল চুল আর বাদামী রঙের মেয়ে লিসা এখন কোথায়? কত দ্রুত এ সমস্ত ঘটল আবার শেষও হয়ে গেল! পথের ধারে এমনই কত আনন্দ ছড়িয়ে আছে, তাকে কুড়িয়ে নিলেও আবার তা হারিয়ে যায় কত তাড়াতাড়ি! এ সমস্তই হয়তো পাপ, অন্যায়, ব্যভিচার। কিছুদিন আগে হলেও সে এমন অন্যায় করার চাইতে মৃত্যুকে বরণ করে নিত। কিন্তু এই যে আজ সে তার জীবনের দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের জন্য অপেক্ষা করছে এজন্য মনে এতটুকুও গ্লানি নেই, অশান্তি নেই। মন তার শান্ত, সমাহিত হয়ে আছে।

আবার কখনো কখনো তার মন অকারণেই কেমন দ্বিধাগ্রস্ত, ক্লান্ত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তার এই অনুভূতিকে সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। বিচিত্র এক অপরাধবোধের এই অনুভূতি সে ইচ্ছা করে জীবনে জড়িয়ে ফেলে-নি। মানুষ এই পৃথিবীতে সঙ্গে করে এসব দুঃখ যন্ত্রণাকে নিয়ে এসেছে। শাস্ত্রবিদরা হয়তো একেই পাপ বলেন। এ যেন বেঁচে থাকার পাপ। হাঁ, জীবনের মধ্যেই যেন এই অন্যায়ের, এই পাপের বীজ লুকান আছে। তা না হলে নরজিসের মত পবিত্র, জ্ঞানী মানুষ কেন গুরুতর অপরাধীর মত প্রায়শ্চিত্ত করছে?

ঘাসের বুক থেকে একটি লাল ফুল তুলে চোখের সামনে নিয়ে গোল্ডমুণ্ড দেখতে লাগল কত সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা ফুলটির ছোট্ট বুকের এদিক থেকে ওদিকে চলে গেছে। কামনাবাসনাপূর্ণ এ জীবনের স্পন্দনও কি বিচিত্র! আনন্দের আবেগে লিসার চোখ দুটি কেমন অর্ধনিমীলিত হয়েছিল! হাজার হাজার জ্ঞানের কথা, কবির ভাষা, কোনোটাই লিসার তখনকার অনুভূতিকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারবে না। প্রণয় লীলার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো কথা নয়, কোনো ভাবনা নয়। তবুও তারা দুজনেই কথা বলার, ভাববার চিরন্তন আগ্রহকে মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছে সেদিন।

ছোট্ট ফুলটির পাতাগুলি গোল্ডমুণ্ড পরীক্ষা করতে লাগল। বোঁটার ওপরে পর পর কেমন সুন্দর আর অদ্ভুতভাবে পাতাগুলি সাজানো রয়েছে। ভার্জিলের সুন্দর রেখাগুলিকেও সে ভালবাসে কিন্তু বোঁটার ওপর এই ছোট ছোট পাতাগুলির মত এত অর্থপূর্ণ, আনন্দময় নয় তারা। মানুষ এমন ফুলের সৃষ্টি করতে পারলে তা তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হত। অন্ধকার নেমে আসছে। এবার সে উঠে একটি জায়গা খুঁজে বের করে মেয়েটির জন্য সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল। বুকভরা ভালবাসা নিয়ে একটি মেয়ে অভিসারে আসছে একথা জেনে এমনভাবে প্রতীক্ষা করার মধ্যে আনন্দ আছে।

মেয়েটি এল। একটি বাণ্ডিল খুলে রুটি আর মাংস গোল্ডমুণ্ডের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার জন্য এনেছি, খাও।'

'আমি তোমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি, রুটির জন্য নয়।' গোল্ডমুণ্ড তাকে স্পর্শ করলে আনন্দ আবেশে রোমাঞ্চিত হয়ে মেয়েটি জড়িয়ে ধরল তাকে।

তাকে শিশুর মত লোভী আর সরল বলেই গোল্ডমুণ্ডের মনে হল।

বেশিক্ষণ থাকতে সাহস না করে সে হঠাৎ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোল্ডমুণ্ডের বুক থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে পালাল। গোল্ডমুণ্ড তখন একাকী বসে কেমন একটা বেদনা অনুভব করল। নিবিড় আঁধার নেমে এসেছে তার চারিদিকে।

আট

কতদিন হয়ে গেল গোল্ডমুণ্ড পথে পথেই ঘুরছে। এক জায়গায় এক সঙ্গে দুই রাত্রি সে কাটায় নি। যেখানেই সে যায়, মেয়েরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাকে ভালবাসা জানায়। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, পায়ে হেঁটে, অর্ধাহারে, অনাহারে গোল্ডমুণ্ড ক্রমেই শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

পথের জীবনে অনেক মেয়ের সংস্পর্শে এল সে। কেউ সকাল হতে না হতেই তাকে ছেড়ে চলে যায়, আবার কোনো মেয়ে কেঁদে বিদায় নেয়। গোল্ডমুণ্ড অবাক হয়ে অনেক সময় ভাবে: 'কেউ তো আমার সঙ্গে থাকতে চায় না! আমাকে ভালবেসে তারা তাদের বিবাহিত জীবনের পবিত্র বন্ধনকেও অগ্রাহ্য করে, কিন্তু তবুও কেন তারা সেখানেই আবার ফিরে যায়?'

সত্যিই, কোনো মেয়ে তাকে কোনদিন বলেনি, 'আমাকে ছেড়ে যেও-না।' কেউ তার সঙ্গে যেতে চায় নি। তাকে ভালবেসে তার ভবঘুরে জীবনের অংশ গ্রহণ করতে চায় নি। সে নিজেও এই প্রস্তাব কাউকে করে নি। তবে মনকে বিশ্লেষণ করে সে বুঝেছে, অবাধ স্বাধীনতা আর ঘরছাড়া মুক্ত-জীবনই তার একান্ত প্রিয়। নর্মসহচরীদের একের আবির্ভাবে অন্যকে ভুলে গেছে গোল্ডমুণ্ড। তবুও একথা ভাবতে মন তার বেদনা ও বিস্ময়ে ভরে ওঠে। ভালবাসা কেন এমন ক্ষণস্থায়ী, এমন ভঙ্গুর হয়? নিজের অজান্তেই গোল্ডমুণ্ড প্রত্যেক মেয়ের সুপ্ত কামনা-বাসনাকে জাগিয়ে তোলে। তাদের স্বপ্ন, তাদের কল্পনা তারই মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে যেন। মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে গোল্ডমুণ্ড কখনো কোমল, ধৈর্যশীল, আবার কখনো গভীর আবেগে আকুল। নূতন উৎসাহ উদ্দীপনায় শিশুর মত সরলতা আর নির্মলতা নিয়ে সে

প্রতিটি মেয়েকে একান্ত আপন করে গ্রহণ করেছে। প্রেমের খেলায় প্রকৃত শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছে সে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রেমের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠল গোল্ডমুণ্ড। নারী-চরিত্রের বৈচিত্র্য ও রহস্য বোঝবার ক্ষমতাও অর্জন করল। ভ্রাম্যমাণ জীবনের বিচিত্র ভালবাসার অভিজ্ঞতাই তার অনুভব-শক্তিকে আরো শানিত করে তুলেছে। তার ভবঘুরে জীবন তাকে কী উদ্দেশ্যে কোথায় নিয়ে চলেছে সে কিছুই জানে না। পথ চলার আনন্দে পথ চলেছে সে, জীবনকে প্রাণভরে উপভোগ করছে।

ছু-বছর পথে পথে ভবঘুরে জীবন কাটিয়ে একদিন গোল্ডমুণ্ড এক ধনী নাইটের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হল। তখন শরতের শেষ, শীত এল বলে। সূর্যাস্তের পর বরফ পড়তে শুরু করেছে। তাই নাইটের প্রাসাদে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করল গোল্ডমুণ্ড। গোল্ডমুণ্ড পড়াশোনা করেছে, গ্রীক ও ল্যাটিন পড়তে পারে এই সংবাদ জেনে নাইট তাকে সাদরে আশ্রয় দিলেন। গোল্ডমুণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে নাইট ও তার ছুটি তরুণী মেয়ে খেতে বসল। বড়টির বয়স আঠার আর তার ছোট বোন ষোড়শীও হবে না হয়তো। নাম লিডিয়া আর জুলিয়া।

পরদিন গোল্ডমুণ্ড চলে যেতে চাইল। খাওয়া শেষ হলে নাইট তাকে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন। তিনি তাঁর বিদ্যানুরাগের কথা জানিয়ে অসংখ্য বই দেখালেন। পড়াশোনা করবার জন্য একটা টেবিলের উপর লেখনী আর চমৎকার কাগজ গুছানো রয়েছে। বৃদ্ধ নাইট গোল্ডমুণ্ডকে তাঁর জীবন-কাহিনী শোনালেন। যুবা বয়স থেকেই তিনি গভীর বিদ্যানুরাগী। কিন্তু জ্ঞানের চর্চা স্থগিত রেখে একসময় যুদ্ধেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তারপর আবার ধর্মকর্মে মন দিয়ে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন তাঁর বাবা মারা গেছেন। প্রাসাদ শূন্য। স্ত্রীকে তিনি অনেক আগেই হারিয়েছিলেন। এবার মাতৃহারা ছুটি কন্যাকে প্রতিপালন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল। আর এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তের উপর একখানি বইও লিখতে শুরু করেছেন। তিনি কোথায় কি দেখেছেন তারই বর্ণনা বইখানির বিষয়বস্তু। বইটি লেখা আরম্ভ করলেও ল্যাটিন সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা নাকি বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করছে। গোল্ডমুণ্ড তাঁর লেখা সংশোধন করে দিলে তিনি তাকে অনেক দিনের জন্য আশ্রয় দেবেন জানালেন।

গোল্ডমুণ্ড জানে ভবঘুরে জীবনে শীত কত বড় অভিশাপ। শীতটা এখানে কাটিয়ে গেলে মন্দ হয় না। তাছাড়া দুটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে একই প্রাসাদে বাস করার চিন্তা তাকে বেশ আনন্দ দিল। তাই নাইটের প্রস্তাবে সে রাজী হয়ে গেল। কয়েকদিন যেতে না যেতেই তাকে সুন্দর পোশাক তৈরি করিয়ে দেওয়া হল।

লেখায় ল্যাটিন সংশোধন করার কাজটা ভালভাবেই চলেছে। বৃদ্ধ নাইট তার উপর খুব খুশি হলেন, তাকে প্রশংসা করলেন। প্রতিদিন অন্তত দুটি ঘণ্টা তারা এভাবে কাজ করতে লাগল। প্রাসাদে গোল্ডমুণ্ডের সময় বেশ ভালভাবেই কাটতে লাগল। শিকারী হেইনরিসের কাছ থেকে তীর ধনুক ছুঁড়তে শিখে, শিকার বাহিনীর সঙ্গে শিকারে গেল। কুকুর-গুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাল। ইচ্ছা হলেই যখন তখন ঘোড়ায় চড়তে পারে সে। কোনো সময়েই তাকে একলা থাকতে হয় না। লিডিয়া আর জুলিয়ার সঙ্গেও গোল্ডমুণ্ডের আলাপ হল। ছোট মেয়েটি দেখতে বেশি সুন্দরী, কিন্তু নির্লিপ্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির। কেমন একটা অসহজ ভাব নিয়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে সে। তাদের দুজনের সঙ্গেই গোল্ডমুণ্ড একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু গোল্ডমুণ্ডের উপস্থিতি সম্বন্ধে তারা দুজনেই বিশেষ সচেতন। বড় বোন লিডিয়ার আচরণ একেবারেই অন্যরকম। কিছুটা শ্রদ্ধা, কিছুটা পরিহাস মিশিয়ে বেশ সহজভাবে সে গোল্ডমুণ্ডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। লিডিয়ার চোখে গোল্ডমুণ্ড একটা বিদ্যার জাহাজ। মঠের জীবনধারা সম্বন্ধে সে গোল্ডমুণ্ডকে নানা প্রশ্ন করে। তার কথায় পরিহাসের তরল সুর বেজে ওঠে। একটা আভিজাত্য আর আত্মপ্রত্যয়ের সুরও মাঝে মাঝে ঝঙ্কৃত হয়। গোল্ডমুণ্ড দুই বোনকেই তার মঠের কত কাহিনী সুন্দর করে শোনায়। খাবার টেবিলে বসে মন্ত্রমুগ্ধের মত তারা সেই গল্প শোনে।

প্রাঙ্গণের দীর্ঘকায় অ্যাশ গাছের শাখায় শাখায় শরতের জীর্ণ পাতারা তখনো জড়িয়ে আছে, বাগানে গোলাপও অজস্র ফুটছে। শরৎ-কালটা এবার বেশ দেরি করেই বিদায় নিচ্ছে। এমনই সময়ে একদিন পাশের গাঁ থেকে একজন নাইট তাঁর গৃহিণী ও পরিচারককে সঙ্গে নিয়ে এই প্রাসাদে এক রাত্রির জন্য আতিথ্য গ্রহণ করলেন। অতিথিশালা থেকে গোল্ডমুণ্ডকে সরিয়ে সেখানেই তাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হল। গোল্ডমুণ্ডকে পড়বার ঘরে শুতে দেওয়া হল। তাঁরা সবাই খাবার টেবিলে খেতে বসলে গোল্ডমুণ্ড

হঠাৎ লক্ষ্য করল নবাগতা মহিলাটি তার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। গোল্ডমুণ্ডকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে, কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি দিয়ে তা বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছে। গোল্ডমুণ্ড আরো লক্ষ্য করল তার প্রতি লিডিয়ার ব্যবহারও আচমকা কেমন বদলে গেছে। লিডিয়া স্থির প্রতিমার মত বসে অতিথি ভদ্র-মহিলার সঙ্গে গোণ্ডমুণ্ডের আচরণ, কথাবার্তা লক্ষ্য করছে শুধু। মহিলাটির একটি পা টেবিলের নিচে গোল্ডমুণ্ডের পা স্পর্শ করবার জন্য অনেক কৌশলে তার দিকে এগিয়ে গেল দেখে গোল্ডমুণ্ড বেশ মজা পেল। লিডিয়াও তা দেখতে পেয়ে অব্যক্ত এক রোষে, ঈর্ষায়, অপমানে বিবর্ণ হয়ে অপলক তাদেরই দিকে তাকিয়ে রইল সজোরে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে। গোল্ডমুণ্ড এবার তার মঠের গল্প বলতে আরম্ভ করল। তার মধুর স্বর, সুন্দর বচনভঙ্গি আর দেহগঠনের দিকেই নবাগতার বেশি মনোযোগ। প্রত্যেকেই তার কথার ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হয়ে রয়েছে। তরুণী জুলিয়া নির্বিকার-ভাবে আনত মুখে বসে আছে।

নাইটের স্ত্রী আনন্দে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল আর লিডিয়ার সমস্ত অন্তর গভীর এক বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল। এই বেদনার মধ্য দিয়েই তীব্র এক কামনাকেও অনুভব করে, তার মন ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠল। গোল্ডমুণ্ড তাদের মনের এই বিচিত্র ভাবধারা তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারছে।

সেই রাত্রে লিডিয়া ভাল ঘুমাতে পারল না। অনেক রাত্রি পর্যন্ত অস্থির মনে বিছানায় শুয়ে এ পাশ ও পাশ করল। পরদিন আকাশ ঘনমেঘে ঢাকা রইল। চারদিকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে হু হু করে। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও অতিথিরা আর থাকতে চাইল না। যাত্রা করবার সময় লিডিয়া তাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাল। কিন্তু তার একাগ্র দৃষ্টি লক্ষ্য করছিল গোল্ডমুণ্ড মহিলাটিকে তার টাট্টু ঘোড়ায় উঠিয়ে বসিয়ে দেবার সময় কত সন্তর্পণে তার সুগঠিত, দৃঢ় হাতের কোমল স্পর্শ মহিলাটির পায়ের পাতার উপর বুলিয়ে দিয়ে তার পা-টিকে কেমন করে এক মুহূর্তের জন্য হাতের মুঠোয় জড়িয়ে ধরল।

অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে গোল্ডমুণ্ড নাইটের লেখা সংশোধন করবার জন্য পড়বার ঘরে ঢুকল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে শুনতে পেল লিডিয়া উদ্ধত স্বরে সহিসকে ডেকে তার ঘোড়া নিয়ে আসবার জন্য আদেশ

দিচ্ছে। আস্তাবল থেকে ঘোড়াটাকে আনবার সময় তার পায়ের খুরের শব্দও শুনতে পেল গোল্ডমুণ্ড। নাইট জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে মাথা নাড়লেন। তারা দু-জনেই লিডিয়াকে ঘোড়ায় চড়ে উধাও হয়ে যেতে দেখল। গোল্ডমুণ্ডকে আনমনা দেখে নাইট অনেক আগেই তাকে ছেড়ে দিলেন। ছাড়া পেয়ে গোল্ডমুণ্ড সবার অলক্ষ্যে একটা ঘোড়ায় চড়ে শরতের সেই হিমেল হাওয়ার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। অনুর্বর প্রান্তরের উপর দিয়ে জোর কদমে সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। দূরে একটি পাহাড় মেঘে ঢাকা আকাশের কোল ঘেঁষে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে-দিকে তাকাতেই তার চোখে পড়ল ছোট্ট একটি ঘোড়ার পিঠে লিডিয়া ধীর গতিতে চলেছে। দূর থেকে তার সে মূর্তিটিকে ছবির মত দেখাচ্ছে। লিডিয়ার কাছে যাবার জন্য গোল্ডমুণ্ড তার ঘোড়ার গতিবেগ বাড়ালে, দূর থেকে তা বুঝতে পেরে লিডিয়াও তার ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে দুরন্ত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর লিডিয়া তার ঘোড়ার গতিবেগ কমিয়ে দিল। কিন্তু তার অনুসরণকারীর দিকে পেছন ফিরে তাকাল না। গোল্ডমুণ্ডকে যেন সে দেখতেই পায়নি, যেন কিছুই ঘটেনি এমনই নির্লিপ্তভাবে, গর্বিত ভঙ্গিতে লিডিয়া চলেছে। গোল্ডমুণ্ড তার কাছে এসে পৌঁছুলে তাদের ঘোড়া দুটি পাশাপাশি বন্ধুর মত চলতে লাগল। ঘোড়া দুটি আর তাদের আরোহী দু-জনও তখন পথ-শ্রমে হাঁপাচ্ছে।

'লিডিয়া', গোল্ডমুণ্ড কোমল স্বরে তাকে ডাকল। লিডিয়া কোন উত্তর দিল না।

'লিডিয়া',—তবুও সে নীরব।

'দূর থেকে তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল লিডিয়া। তোমার সোনার বরণ চুলের রাশি বিদ্যুৎ চমকের মতই বাতাসের সঙ্গে উড়ছিল! সত্যিই কত সুন্দর তুমি! আমাকে ফেলে তুমি এমনি করে পালিয়ে এসেছ বলেই বুঝতে পারলাম তুমি আমাকে ভালবাস। গত রাত্রেও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আজই সহসা এই সত্যকে উপলব্ধি করলাম। লিডিয়া, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তুমি! এস, আমরা একটু বিশ্রাম করি।' ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে গোল্ডমুণ্ড লিডিয়ার ঘোড়ার বল্গা শক্ত করে চেপে ধরল। লিডিয়ার মুখখানি তখন বরফের মত সাদা দেখাচ্ছে।

গোল্ডমুণ্ড দু-হাতে তাকে তুলে ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামিয়ে আনতেই তার চোখ জলে ভরে গেল। একটা পাথরের উপর বসে দু-হাত দিয়ে মুখখানি ঢেকে অঝোরে কাঁদতে লাগল সে। তারপর একটু সামলে নিয়ে ক্ষীণ স্বরে বলল, তুমি এমন নীচ হলে কেন?'

'আমি কি খুবই খারাপ লোক?'

'হাঁ, তুমি লম্পট, দুশ্চরিত্র। এইমাত্র যেসব কথা তুমি আমাকে বললে তা নিঃশেষে ভুলে যেতে দাও। এমন সব নির্লজ্জ কথা বলবার কোনো অধিকারই তোমার নেই গোল্ডমুণ্ড। আমি তোমাকে ভালবাসব একথা কেমন করে ভাবতে পার? ওসব কথা ভুলে যাও। গতরাত্রে যা দেখেছি তা আমি ভুলি কেমন করে?'

'গতরাত্রে? কি দেখেছ?'

'আর ছলনা কোরোনা, মিথ্যা কথা বোলোনা। আমারই চোখের সামনে ঐ মহিলাটির সঙ্গে তুমি যে আচরণ করেছ, নির্লজ্জতায়, নিষ্ঠুরতায় তার কোনো তুলনা হয়না। গোল্ডমুণ্ড, তোমার কি লজ্জা বলে কিছু নেই? আমার বাবার ঘরে আমারই চোখের সামনে টেবিলের নিচ দিয়ে কি করে তুমি সেই মহিলাটির পায়ে তোমার পা ছোঁয়ালে? আর এখন সে চলে গেছে বলে আবার আমার পেছনে তাড়া করেছ? এর চেয়ে চরম লজ্জার ব্যাপার আর কি হতে পারে?'

গোল্ডমুণ্ড হাঁটু গেড়ে লিডিয়ার একান্ত কাছ ঘেঁষে বসে তার বিষাদ-ভরা সুন্দর মুখখানির দিকে অনিমেষ তাকিয়ে রইল। সে জানে লিডিয়া মুখে এসব কথা বললেও অন্তরে অন্তরে তাকে ভালবেসে ফেলেছে। তার বেদনার্ত চোখের ভাষায় ভালবাসাই ফুটে উঠেছে। তার মুখের ভাষার চেয়ে চোখের ভাষাই সত্য। লিডিয়া গোল্ডমুণ্ডের উত্তরের আশায় উৎকর্ণ হয়ে আছে। কোনো উত্তর না পেয়ে ছলছল চোখে বলল, 'তাহলে তোমার কি সত্যিই কোন লজ্জা নেই?'

শান্ত স্বরে গোল্ডমুণ্ড উত্তর দিল এবার, 'আমায় ক্ষমা কর লিডিয়া। এসব কথা নিয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। আমারই সব দোষ মেনে নিচ্ছি। তবে আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি লিডিয়া আর এছাড়া আমি কিছুই জানিনা। আমার উপর রাগ করে থেকো না লক্ষ্মীটি।'

লিডিয়া তার কথা যেন শুনতেই পেল না। বিষাদ প্রতিমার মত স্থির, নিথর হয়ে বসে দূরের পানে তার শূন্য দৃষ্টি মেলে দিল।

গোল্ডমুণ্ড ধীরে ধীরে তার মুখখানিকে লিডিয়ার হাঁটুর উপরে রাখল।

লিডিয়া তাকে আর ঠেলে সরিয়ে দেবে বলে মনে হল না। চোখ বুজে নিজের মুখখানিকে সে লিডিয়ার হাঁটুর উপরে রেখে হাঁটু-দুটিকে আদরে জড়িয়ে ধরে গাল ও ঠোঁটের উষ্ণ পরশবুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে তার চুলের উপর লিডিয়ার কোমল স্পর্শ অনুভব করল। ছোট্ট নরম একটি ভীরু পাখির মতই লিডিয়ার হাতখানি তার মাথার উপর এসে বসল যেন। গোল্ডমুণ্ড মনে মনে বলল, 'কী সুন্দর হাতখানি! কী মধুর তার পরশ।' সংকোচে, শিশুর মত সহজ, সরল ও অনভিজ্ঞ ভাবে সে তার মাথায়, চুলে হাতের পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। লিডিয়ার সুগঠিত, সুন্দর দুখানি হাতের দিকে এর আগেও গোল্ডমুণ্ড কতদিন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। চাঁপার কলির মত নিটোল, দীর্ঘ আঙ্গুল, রক্তিমাভ, অপূর্ব, সুন্দর নখাগ্রভাগ—তার নিজের সুডৌল সুগঠিত হাতের কথাই গোল্ডমুণ্ডকে মনে করিয়ে দিয়েছে কতবার। আর এখন সেই চম্পককলিরাই তার চুলের উপর মৃদু, মদির-বিহ্বল ভাষায় কত কথা বলে যাচ্ছে নীরব স্পর্শের অপূর্ব সুরঝঙ্কারে; শিশুর অস্ফুট কথার মতই তা সুললিত, সুমধুর। প্রেমের অব্যক্ত বাণী এরা। কৃতজ্ঞ অন্তরে গোল্ডমুণ্ড এবার মাথা উঠাল। লিডিয়ার হাতখানি হাতে তুলে নিয়ে তার গালের ওপর, কাঁধের কাছে চেপে ধরল। অনেকক্ষণ পর লিডিয়া কথা বলল, 'আমাদের এবার যেতে হবে। সময় হয়ে গেছে।' গোল্ডমুণ্ড নীরবে তার দিকে তাকিয়ে তার চাঁপার কলির মত আঙ্গুল গুলিতে ধীরে চুম্বন স্পর্শ বুলিয়ে দিল।

লিডিয়া আবার বলল, 'ওঠ, লক্ষীটি। এবার আমাদের ফিরতে হবে।'

গোল্ডমুণ্ড নীরবে উঠে ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদের দিকে রওনা হল।

গোল্ডমুণ্ডের মন এবার কানায় কানায় ভরে উঠেছে। সে কেবলই ভাবছে লিডিয়া কী অপরূপ দেখতে, শিশুর মতই সরল আর কোমল! প্রাসাদের ফটকের কাছে এসে লিডিয়া চমকে উঠে ভীত স্বরে বলল, 'এভাবে একসঙ্গে প্রবেশ করা তো উচিত নয়। আমরা কি পাগল হয়ে গেলাম?' আস্তাবল থেকে সহিসরা এ দিকে আসার আগেই

লিডিয়া চুপি চুপি বলল, 'বল, সত্যি করে বলতো, কাল কি সেই মহিলাটির সঙ্গে রাত্রিবাস করেছ ?' গোল্ডমুণ্ড কয়েকবার মাথা নেড়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল।

সেদিন অপরাহ্ণে লিডিয়ার বাবা বেড়াতে বের হলে তার পড়বার ঘরে প্রেমিক যুগল আবার মিলিত হল। দেখা হওয়া মাত্রই লিডিয়া আবার প্রশ্ন করল, 'সত্যিই কি আমাকে ভালবাস গোল্ডমুণ্ড ?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'কিন্তু এর পরিণাম কি হবে ?'

'আমি তোমাকে ভালবেসেই সুখী! তারপর কি হবে না হবে সে সব ভেবে আমি দুঃখ পেতে চাই না। তোমাকে দেখলে, তোমার কথা শুনলে, আমার চুলের উপর তোমার কোমল অঙ্গুলিস্পর্শ পেলেই আমি খুশি হব, তৃপ্ত হব, নিজেকে ধন্য মনে করব। তোমাকে চুমু খেতে পেলে আমার সেই আনন্দ ষোল কলায় পূর্ণ হবে। আর কিছুই আমি চাই না।'

'গোল্ডমুণ্ড, একজন পুরুষ তার স্ত্রীকেই শুধু চুমু খেতে পারে। তুমি কি একবারও তা ভাবনি ?'

'না, আমি তা কোনোদিনই ভাবিনি। আর কেনই-বা ভাবব ? তুমি আমি দুজনেই ভাল করে জানি তুমি কোনোদিনই আমার স্ত্রী হবে না।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু তুমি আমার স্বামী না হতে পারলে, চিরকাল আমার পাশে না থাকতে পারলে এভাবে ভালবাসার কথা আমাকে শোনাচ্ছ কেন ? এটা কি ভাল ? টেবিলের তলায় যার পায়ে পা লাগিয়েছিলে, আমি সেই দুশ্চরিত্রা মেয়েটির মত নই, বুঝলে ? কেবল ওদের মত মেয়েদেরই বোধহয় চেন তুমি ?'

'ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ, তুমি তার চাইতে অনেক বেশি সুন্দরী। রুচি এবং আভিজাত্যে তোমার সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলেনা। তুমি কতবড় সুন্দরী তাকি নিজে জান ?'

'আমার আয়না আছে।'

'আয়না সবকিছু বলতে পারেনা। আয়নাতে তোমার কপালখানি কোনোদিন ভাল করে দেখেছ লিডিয়া ? তোমার কাঁধ দুটি আর নখের

অগ্রভাগ, হাঁটুদুটি দেখেছ কি কোনোদিন? তোমার দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই কত নিটোল, সুন্দর তা কি তুমি জান? বল।'

'না, আমি এর আগে কোনোদিনই এসব চোখ মেলে দেখিনি। কিন্তু এখন তুমি যখন বলছ, সব স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। শোন, তুমি সত্যিই লম্পট, দুশ্চরিত্র। আমাকে তোষামোদ করে স্বার্থসিদ্ধি করতে চাও, আমাকে দাম্ভিক করে তুলতে চাও, তাই না?'

'তোমাকে দাম্ভিক করে তুলতে পারলে খুশিই হতাম! তুমি সত্যিই সুন্দর আর আমি চাই তোমার সেই সৌন্দর্য তুমিও দেখ; অকারণ কথার মালা গেঁথে তোমাকে তা বোঝাতে বাধ্য করছ আমাকে। কিন্তু তার চেয়েও অনেক সুন্দর করে, নিপুণভাবে এই পরম সত্য তোমায় আমি বুঝিয়ে দিতে পারি লিডিয়া। কথা বলে, ভাষা দিয়ে তোমাকে আমার দেবার কিছুই নেই। কথা বলে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে কেউই কিছু শিখতে পারব না।'

'তোমার কাছ থেকে আমার শিখবার কিই-বা আছে শুনি?'

'তোমার কাছ থেকে আমি শিখব, আমার কাছ থেকে তুমি। কিন্তু তুমি তা জানতে চাও না। তুমি কেবল একটি পুরুষকেই—যে পুরুষ তোমার স্বামী হতে পারবে তাকেই ভালবাসতে চাও। তুমি কিছুই শেখ নি, এমনকি চুমু খেতেও জান না এ কথা যখন তোমার স্বামী বেচারী জানবে তখন সেও কিন্তু হাসবে লিডিয়া।'

'ও, তাহলে ওগো বিদ্যাবিশারদ, তুমি বুঝি আমাকে চুম্বনরীতির শিক্ষাই দিতে চাও?'

গোল্ডমুণ্ড মৃদু হাসল। লিডিয়া এভাবেই পরিহাসের সুরে কথা বলে অনেক সময়। তবুও লিডিয়ার এই প্রগল্‌ভতার পেছনই যে সহসা তার এতদিনকার কুমারীত্ব, অনাঘ্রাত পবিত্র, যৌবন কামনা-বাসনার যাদু স্পর্শে চমকে উঠছে বার বার, আর সেই সুপ্ত কামনার অতর্কিত দংশনকে আপ্রাণ চেষ্টায় দমিয়ে রাখতে চাইছে, গোল্ডমুণ্ড তা অনুভব করতে পারল। এবারও গোল্ডমুণ্ড কোন উত্তর দিল না। মৃদু হেসে লিডিয়ার চঞ্চল দৃষ্টিতে তার একাগ্র প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি মিলিয়ে ধীরে ধীরে নিজের মুখখানি তার মুখের কাছে নামিয়ে আনতে লাগল। লিডিয়া নিজেকে সংবরণ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সকল

সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেও তার মুখখানি তুলে ধরল সেই তৃষিত দুটি অধরোষ্ঠের দিকে। গোল্ডমুণ্ড লিডিয়াকে দুবাহুর নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল। অনভিজ্ঞ লিডিয়াও ছোট মেয়ের মত তাকে একটি চুমু খেয়ে মুখ সরিয়ে আনবার চেষ্টা করতেই গোল্ডমুণ্ড আবার তার ঠোঁট-দুখানিকে আপন ঠোঁটের দৃঢ় বাঁধনে জড়িয়ে ধরে রাখল। গোল্ডমুণ্ড তাকে ছেড়ে দিচ্ছে না দেখে লিডিয়া অবাক বিস্ময়ে আপনাকে তার সবল আলিঙ্গনের মধ্যে সমর্পণ করল বাধ্য হয়ে। লিডিয়া এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার মুখখানি এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে। ডাগর, সুন্দর দুটি চোখের ভাষায় গভীর প্রেমের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি।

বলল, 'গোল্ডমুণ্ড, এবার আমাকে যেতে দাও। আজ আর নয়।'

তারপর থেকে প্রতিদিনই তারা গোপনে মিলিত হতে লাগল। গোল্ডমুণ্ড তার নূতন প্রেমিকার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে চাইছে। লিডিয়া অনেক সময়েই গোল্ডমুণ্ডের হাত-দুখানি আপন হাতের মুঠোয় বন্দী করে, তার চোখে চোখ রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে শুধু বসে থাকতেই ভালবাসে। পবিত্র বিবাহ বন্ধনে তাদের জীবন কোনোদিনই একসূত্রে গ্রথিত হতে পারবে না এই কথাটি ভাবলেই লিডিয়া বড় ম্লান, বিষণ্ণ হয়ে পড়ত। তার মনের এই গোপন বেদনা আর অন্যায়বোধ তার বুকের উপর পাষাণ হয়ে চেপে থেকে চোখের সামনে একটা কাল আবরণ তুলে ধরত।

জীবনে এই প্রথম গোল্ডমুণ্ড অনুভব করল তাকে সত্যি করে কেউ ভালবেসেছে, অনাঘ্রাত এক কুমারীর স্নিগ্ধ ভালবাসা তাকে ঘিরে রেখেছে। একদিন লিডিয়া তাকে বলল, 'বাইরের দিক থেকে তুমি কত হাসিখুশি গোল্ডমুণ্ড, কিন্তু তোমার সুন্দর চোখদুটির অতল গভীরে আনন্দের কোনো রেশ নেই। সেখানে শুধু বিষাদ, বেদনা ও দুঃখ জমাট বেঁধে রয়েছে। তুমি যেন তোমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছ, এ জগতে সুখ বলে কিছু নেই, ভালবাসা বলে কিছু নেই। তোমার চোখদুটির মত অমন সুন্দর, অপরূপ চোখ খুব কম লোকেরই আছে। তবুও তারা বড় বিষণ্ণ, বেদনাতুর। তুমি গৃহহারা ছন্নছাড়া বলেই হয়তো এমন হয়েছে। পথের জীবন থেকেই তুমি আমার কাছে এসেছ। আবার একদিন সেখানেই হয়তো ফিরে যাবে। পথ চলতে চলতে বনের ধারে ঘাসের কোলে, শেওলার বুকেই হয়তো

ঘুমাবে। মাঝে মাঝে আমার জানতে সাধ যায় তোমার ঘর কোথায় ছিল। তুমি চলে গেলে আমি আবার আমার একঘেয়ে জীবনে ফিরে যাব। একলা ঘরে জানলার ধারে বসে তোমারই কথা ভাবতে ভাবতে সময় কাটিয়ে দেব। আর তুমি কেবল পথে পথে ঘুরবে। ঘরের নিশ্চিন্ত আরামের জীবনকে কোনোদিনই বুঝি পাবে না!'

লিডিয়া এমনই করে অনর্গল কথা বলে যেত মাঝে মাঝে, গোল্ডমুণ্ড একমনে শুনত আর মৃদু হাসত। এক এক সময় আবার লিডিয়ার এসব কথায় তার মন দুঃখে কেঁদে উঠত। লিডিয়া দুঃখ পেলে বা কাঁদলে গোল্ডমুণ্ড তার সর্বাঙ্গে স্নেহ স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে মৃদু অস্ফুট ভাষায় তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত। লিডিয়া বলে, 'তোমার জীবনের পরিণতি কি হবে জানতে বড় সাধ হয় আমার। আমি প্রায়ই তা ভাবি। তোমার জীবন সহজ, সরল হবে না। আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে কামনা করছি তুমি সুখী হও, আনন্দ পাও। মাঝে মাঝে ভাবি তুমি হয়তো কবি হবে, তোমার স্বপ্ন ও কল্পনাকে ভাষা দিয়ে অমর করে রেখে যাবে। আবার কখনো ভাবি তুমি অবিরাম ভ্রমণ করবে এই পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে। যে মেয়ে একবার তোমাকে দেখবে সে-ই তোমাকে ভালবাসবে। কিন্তু তবুও তোমার একাকীত্ব ঘুচবে না। সহস্র জনের মাঝে থেকেও চিরদিন একেলা, নিঃসঙ্গ থাকবে। তার চেয়ে তোমার সেই বাল্যের মঠেই ফিরে যাও গোল্ডমুণ্ড। মঠের সেই বন্ধু, যার কথা কতবার বলেছ আমায়, তারই কাছে ফিরে যাও তুমি। সবার অলক্ষ্যে তুমি হয়তো একদিন বনের মধ্যে বা পথের ধারে একেলা মরে পড়ে থাকবে এই ভাবনা আমি কিছুতেই সইতে পারি না। তা যেন না হয়, কেবল এই প্রার্থনাই করছি আমি।' সমস্ত অন্তর ঢেলে ব্যাকুল স্বরে এসব কথা লিডিয়া বলত কত সময়। আবার কখনো বা তারা আনন্দে ছেলে মানুষের মত মেতে উঠত, ঘোড়া ছুটিয়ে শুষ্ক প্রান্তরের উপর দিয়ে কোথায় চলে যেত। রহস্য-ভরা—পরিহাস-তরল কত কথা বলে লিডিয়া গোল্ডমুণ্ডকে হাসাত, ওক ফল বা গাছের শাখা ছুঁড়ে তাকে আক্রমণ করত ছোট্ট চঞ্চল মেয়ের মত।

এক রাত্রে গোল্ডমুণ্ড তার বিছানায় শুয়ে ঘুমের প্রতীক্ষা করছে। তার মন নূতন এক ব্যথার ভারে, গভীর উত্তেজনায় উতলা হয়ে আছে। আনন্দ-বেদনা সুখ-দুঃখ মেশানো ভালবাসার এক অপূর্ব অনুভূতির আবেগে মন তার দুলে দুলে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। শীতের হিমেল হাওয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলছে

বাইরে। অনেকক্ষণ হল সে ঘুমের সাধনা করছে ; কিন্তু ঘুম আর আসছে না। হঠাৎ অবাক বিস্ময়ে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল দরজা ঠেলে অন্ধকারের মধ্যে সাদা পোশাক-পরা লিডিয়া নীরবে, সন্তর্পণে, শূন্য পায়ে তার বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে। আস্তে দরজাটি বন্ধ করে সে তার বিছানার পাশে এসে বসল।

আবেগ-বিহ্বল অস্ফুট স্বরে বলল, 'শোন, তোমার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে পারছি না বলে আমিও কি কম দুঃখ পাচ্ছি ? কিন্তু আমাদের এই গোপন সান্নিধ্য আর বেশিদিন স্থায়ী হবে না। জুলিয়া সন্দেহ করতে সুরু করেছে। বাবাও হয়তো জেনে যাবেন ব্যাপারটা। আমি এভাবে তোমার কাছে আসি একথা বাবা জানতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি পালিয়ে যাও এখান থেকে। আজই চলে যাও। আমাকে ভুলে যাও। কিন্তু তুমি চলে গেলে আমি কেমন করে বাঁচব ?'

'তুমিও আমার সঙ্গে এস লিডিয়া।'

'তাহলে তো ভালই হত গোল্ডমুণ্ড। তোমার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে এই সুন্দর পৃথিবী আর জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে কি আমিই চাই না ? কিন্তু আমি তা করতে পারি না। ভবঘুরে জীবনকে আমি কোনোদিনই মেনে নিতে পারব না। আমার বাবার সম্মান ও আভিজাত্যকে পথের ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে তাঁর নামে কলঙ্ক লেপন করতে আমি কিছুতেই পারব না। না, না, ও কথা আর বোলো না। এ শুধুই কল্পনা, এ স্বপ্নবিলাস। মরে গেলেও তা করতে পারব না। আমরা দু-জন আজীবন দুঃখ পেতেই জন্মেছি : বিলাস, সুখ, আনন্দ এসব কিছুই আমাদের জন্য নয়।'

লিডিয়া আর জুলিয়া, দুটি বোনই তাকে আকর্ষণ করেছে ; প্রথমদিকে জুলিয়াই ছিল বেশি আকর্ষণীয়। তারপর হঠাৎ একদিন লিডিয়াই তাকে জয় করে নিল, তার সকল স্বাধীনতা হরণ করে নিল। গোল্ডমুণ্ড তাকে এমনভাবে ভালবাসল যে তার ইচ্ছার কাছেই আপনাকে সমর্পণ করল। লিডিয়ার শিশুর মত সহজ সরলতা, মাধুর্য আর আত্মার প্রশান্ত বিষাদময় অনন্য রূপকে গোল্ডমুণ্ডের কাছে আপন সত্তার অংশ বলেই মনে হল। তার অন্তরের সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে তার দেহের ভাবভঙ্গির মধ্য দিয়েই সুস্পষ্ট ফুটে উঠতে দেখে গোল্ডমুণ্ড মাঝে মাঝে অবাক হত,

আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত। লিডিয়ার এ রূপ তার শিল্পী-সত্তাকে এই সুধাময়ীর একটি প্রতিমূর্তি গড়বার জন্যও উদ্বুদ্ধ করেছে বার বার।

এদিকে জুলিয়া তাদের কাছে ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠল। বোনের মনের অবস্থা সে বুঝতে পেরেছে। তাদের গোপন প্রেম তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেছে। গোল্ডমুণ্ডের প্রতি তার ব্যবহার বাইরের দিক থেকে খুবই নিস্পৃহ। কিন্তু এক এক সময়ে নিজের অজানিতে, সবার অলক্ষ্যে তার একাগ্র লোলুপ দৃষ্টি গোল্ডমুণ্ডের দেহের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে পড়ে। গোল্ডমুণ্ডের অপরূপ দেহসৌষ্ঠব তাকেও মুগ্ধ করেছে, তার কুমারী মনে কামনার আগুণ জ্বালিয়েছে। লিডিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে সে বেশ সহৃদয়, কোমল ব্যবহারই করে আজকাল। বোনের পাশে শুয়ে বন্ধুর মত তাদের প্রেম ও গোপন মিলনের অভিজ্ঞতার কথা জেনে নিতে চায়। তার দৃষ্টিতে তখন লোভ, কৌতূহল আর ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠে। কখনও বা এমন ব্যবহার করে যে তারা দুজনেই তাকে সাবধানে এড়িয়ে চলে। জুলিয়া এখন আর ছেলেমানুষ নয়। নীরব এই নাটকের প্রধান এক ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ অভিনয় করছে সে।

গোল্ডমুণ্ড শুধু খাবার টেবিলেই একবার জুলিয়াকে দেখে। তাই তার চাইতে লিডিয়াকেই অনেক বেশি সহ্য করতে হচ্ছে। তাছাড়া লিডিয়া জানে গোল্ডমুণ্ড জুলিয়ার প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছে। মাঝে মাঝেই সে মুগ্ধদৃষ্টিতে জুলিয়ার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। এই ভাবনাও লিডিয়াকে বড় যন্ত্রণা দেয়। একটি কথাও সে বলতে পারে না। অব্যক্ত বেদনার সঙ্গে নীরবে সব সহ্য করতে হয়। জুলিয়াকে কোনমতেই এখন চটান যায় না। যে কোনোদিন যে কোনো মুহূর্তে তাদের গোপন ভালবাসার কথা সবাই জেনে যাবে। আর তখনই ঘটবে সবকিছুর সমাপ্তি। মাঝে মাঝে গোল্ডমুণ্ড অবাক হয়ে ভাবে, কেন সে অনেকদিন আগেই এখান থেকে পালিয়ে যায়নি! এখানে যে জীবন সে কাটাচ্ছে তার কোনো অর্থই হয় না। যে প্রেম তাকে দিনের পর দিন সর্বনাশের দিকে নিয়ে চলেছে তাকে আঁকড়ে কেন সে এখানে পড়ে আছে এখনো? কিন্তু তবুও সে চলে গেল না। ইচ্ছা করেই যেন কষ্ট পেতে লাগল। বেদনার মধ্যেই কী এক বিচিত্র সুখ অনুভব করছে। একান্ত কাছে পেয়েও সম্পূর্ণ না পাওয়ার যে বিড়ম্বনা, তাতে গভীর নিরাশার হাহাকার থাকলেও বিচিত্র

এক আনন্দের রেশ জড়িয়ে আছে। বিনিদ্র রজনীর ব্যাকুল কামনার নিষ্ফলতার মাঝেও গভীর সুখানুভূতি রয়েছে। লিডিয়া তার ভীরু ভালবাসার কথা, আশঙ্কার কথা যখন তাকে শোনায় তখনো গোল্ডমুণ্ড অপূর্ব আনন্দ পায়। কিছুদিনের মধ্যেই আনন্দময়ী লিডিয়া বিষাদপ্রতিমা হয়ে উঠল। প্রেমময়ী এই বিষাদপ্রতিমাকে তুলির রেখায় অমর করে রাখবার ব্যাকুল বাসনা আবার তার শিল্পচেতনাকে আলোড়িত করল।

লিডিয়া বেদনাভরা কোমল স্বরে একদিন তাকে বলল, 'আমার কথা ভেবে তুমি দুঃখ পেও না গোল্ডমুণ্ড, আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই। আমার বেদনাতুর মন তোমার মনকেও স্পর্শ করে বলে আমি দুঃখ পাই। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। প্রতি রাত্রে আমি অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখি আজকাল। গভীর অরণ্যের অন্ধকারে পথ হারিয়ে আমি চলেছি তোমারই খোঁজে। কিন্তু তুমি কোথাও নেই। আমি জানি তোমাকে আমি হারিয়েছি চিরতরে আর তাই আমার পথ চলারও যেন বিরাম নেই।'

কিছুদিন পর এক শীতের রাত্রিতে গোল্ডমুণ্ডের জীবনে একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটল। লিডিয়া আর জুলিয়া সেদিন ঝগড়া করেছিল। একথা গোল্ডমুণ্ড জানত না। গভীর রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে লিডিয়া অন্যদিনের মতই চুপি চুপি গোল্ডমুণ্ডের কাছে এল। জুলিয়ার ভয়ে সেদিন সে সর্বক্ষণ বিষণ্ণ, বিমনা হয়ে আছে। আর তাই সে গোল্ডমুণ্ডের পাশে এসে পাষাণপ্রতিমার মতই স্থির হয়ে বসে রইল। গোল্ডমুণ্ড সস্নেহে তার মাথাটি নিজের বুকে টেনে নিয়ে তাকে আদর করতে লাগল। সহসা লিডিয়া চমকে সোজা হয়ে উঠে বসল। আতঙ্কে আর বিস্ময়ে সে তখন কাঁপছে! গোল্ডমুণ্ড নিজেও অবাক হয়ে লক্ষ্য করল ঘরের দরজা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে আর ছায়ার মত অস্পষ্ট একটি মূর্তি সন্তর্পণে তারই বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে। মূর্তিটি কাছে এসে দাঁড়াতেই তারা তাকে জুলিয়া বলে চিনতে পারল। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে জুলিয়া হঠাৎ গোল্ডমুণ্ডের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবেগভরে তার চোখে মুখে তপ্ত ঠোঁটের পরশ বুলিয়ে দিতে লাগল। গোল্ডমুণ্ডও যেন এরকম একটা কিছুরই অপেক্ষা করছিল এতদিন। তাই সে কোনো বাধা না দিয়ে জুলিয়ার ব্যাকুল যৌবনের মধুর আহ্বানকে নীরবে উপভোগ করতে চাইল। এবারে লিডিয়া তড়িতাহতের মত বিছানা থেকে উঠে তীক্ষ্ণ আর্তনাদের স্বরে বলে উঠল, 'জুলিয়া, চলে

এস', তখন জুলিয়া ভয় পেয়ে দ্বিধাভরে নিজেকে গোল্ডমুণ্ডের কাছ থেকে টেনে নিয়ে লিডিয়ার কাছে আসতেই লিডিয়া তার হাত ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। চুপি চুপি তারা ঘর থেকে বের হয়ে নিজেদের ঘরে এসে অশান্ত মনে বিনিদ্র রজনী নীরবে কাটিয়ে দিল।

ভোরের সূর্যালোক বরফের বুকে পড়ে ঝলমল করে উঠতেই লিডিয়া শয্যা ছেড়ে উঠে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করল। তারপর আবার বিছানায় এসে শূন্য দৃষ্টি বাইরে প্রসারিত করে আনমনে ভাবতে লাগল। লিডিয়া ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে এত রাত্রে তাদের মাঝখানে জুলিয়ার এই আকস্মিক উপস্থিতির পিছনে রয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষা, কুমারী মনের অসীম কৌতূহল আর গোল্ডমুণ্ডের প্রতি তার আসক্তি। সে জানে যদি জুলিয়া একবার এ অনলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে তাকে কিছুতেই সেখান থেকে উদ্ধার করা আর সম্ভব হবে না। তাই লিডিয়া শেষ পর্যন্ত স্থির করল যে এই বিচিত্র নাটকের যবনিকা এখানেই টানতে হবে। এমন সময় সিঁড়িতে বাবার পায়ের শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে সে তার বাবাকে তার কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় কথা শোনবার জন্য অনুরোধ জানাল। তারপর যতটুকু বলা সঙ্গত মনে করল, লিডিয়া সংক্ষেপে ঠিক ততটুকুই নাইটকে জানাল।

সকালবেলা নির্দিষ্ট সময়ে গোল্ডমুণ্ড নাইটের পড়বার ঘরে গিয়ে দেখল বাইরে যাবার পোশাক পরে নাইট গম্ভীর মুখে একমনে কি লিখে চলেছেন। তাকে দেখেই নাইট আদেশের সুরে বললেন, 'টুপি পরে নাও। আমার সঙ্গে বাইরে যেতে হবে তোমাকে।'

গোল্ডমুণ্ড ব্যাপারটা বুঝতে পারল। টুপি পরে নিয়ে সে নাইটের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। নরম বরফের বুকের উপর দিয়ে তারা মচমচ শব্দ করে চলেছে। সকাল বেলাকার রক্তিমাভা তখনও আকাশের কোলে অস্পষ্ট ফুটে রয়েছে। নাইট নীরবে পথ চলছেন। তাঁর যুবক সঙ্গীটি চলেছে পেছনে। এভাবে তারা অনেক দূরে চলে এল। পেছনে যা ফেলে এসেছে, এ জীবনে তার কিছুই আর সে দেখতে পাবেনা ভাবতেই গোল্ডমুণ্ডের মন বেদনায় ভরে উঠল।

নীরবে প্রায় এক ঘণ্টা তারা পথ চলেছে। গোল্ডমুণ্ড তার ভাগ্যের পরিণামের কথা ভাবতে লাগল। নাইটের সঙ্গে অস্ত্র রয়েছে। তাকে

হয়তো তিনি হত্যাই করবেন। কিন্তু তাতেও সে ভয় পায়না। ইচ্ছা করলেই সে পালিয়ে যেতে পারে যেদিকে খুশি। একজন বৃদ্ধ তরবারি নিয়েই বা আর কি করতে পারবে? না, জীবনের জন্য তার এতটুকুও আশঙ্কা নেই। কিন্তু এই গম্ভীর, নীরব বৃদ্ধের পেছনে এভাবে বন্দীর মত হেঁটে যাওয়াটাই বড় বিড়ম্বনা। নাইট শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় এসে থামলেন। ক্ষিপ্তস্বরে বললেন, 'এখন তোমাকে একেলা যেতে হবে। সোজা চলে যাও। আগের মতই ভবঘুরে, লক্ষ্মীছাড়া জীবন কাটাও গে। আবার যদি কোনো দিন এ দিকে তোমাকে দেখতে পাই তাহলে তার পরিণাম খুবই খারাপ হবে। আমি প্রতিশোধ নিতে চাইনা। তাই এবারের মত তোমাকে যেতে দিলাম। ঈশ্বর তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন।'

বরফের ঝিকিমিকি উজ্জ্বল প্রভায় নাইটের মুখখানি মৃত, বিবর্ণ দেখাচ্ছে। সেখানেই তিনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন একটা অশরীরী প্রেতাত্মার মত। গোল্ডমুণ্ড চলতে চলতে একটা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নাইট এক পাও নড়লেন না সেখান থেকে।

আকাশের গায়ে ভোরের সেই লালিমা আর নেই। সূর্যও দেখা যাচ্ছে না। পাতলা নরম পালকের মত তুষার তার চারিদিকে ঝরে পড়ছে।

নয়

ঘোড়া ছুটিয়ে কতবার এই প্রান্তরের উপর দিয়ে গেছে গোল্ডমুণ্ড। তাই সবকিছুই তার চেনা জানা। বরফে জমাট বাঁধা ঐ ডোবার ওধারের গোলাবাড়িটা নাইটের সম্পত্তি। আরও এগিয়ে কিছুদূর গেলে গৃহস্থ চাষার বস্তিতে তার পরিচিত বন্ধুও কয়েকজন আছে। তাদের কারও বাড়িতে রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারবে সে। একটু একটু করে তার মধ্যে আগেকার সেই স্বাধীনতাবোধের চেতনা ফিরে আসছে। অবাধ, উন্মুক্ত, রোমাঞ্চকর জীবনকে জানার, উপভোগ করার যে অদম্য স্পৃহা কিছুকালের জন্য সে ভুলে গিয়েছিল, মুসাফির হয়ে পথের কোলে ফিরে এসে আবার তাকেই আঁকড়ে ধরল। নিদারুণ শীতে দুঃসাহসিক এ পথযাত্রায় বাধা অনেক। অর্ধাহার, অনাহার, অসুস্থতা এবং আরও অনেক বিপদ পদে পদে তার গতিকে ব্যাহত করবে। তবুও এর প্রয়োজনীয়তা আছে তার জীবনে—একথা এবার যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল গোল্ডমুণ্ড। পথকে আশ্রয় করে, দুঃসাহসিক জীবনকে আবার বরণ করতে পেরে গোল্ডমুণ্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। মনের সকল সংশয়, বেদনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে অসীম মুক্তির আনন্দ পেল সে। তার সুপ্ত শিল্পিসত্তার মরচে-ধরা অনুভূতিগুলি আবার নূতন করে জেগে উঠল।

গোল্ডমুণ্ড একভাবে ছুটে চলেছে। ক্লান্তি ও অবসাদ, কোনটাই তার গতি রোধ করতে পারছে না। বরফ আর পড়ছে না এখন। বহুদূরে ধূসর আকাশ যেখানে পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে, ঐ নিবিড় বিক্ষিপ্ত অরণ্যরাজিও বুঝি সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লিডিয়ার ভাগ্যে কি ঘটছে কে জানে! শুকনো নিঃসঙ্গ একটি অ্যাশ গাছের নিচে জমাট বাঁধা ঝরনার ধারে শুয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে লিডিয়ার কথা সে ভাবতে লাগল একমনে। অসহ্য ঠাণ্ডায় সেও জমে যাচ্ছে যেন। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটবার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝতে পারল প্রতিটি অঙ্গ তার শক্ত নিশ্চল হয়ে আসছে। একটু একটু করে হেঁটে সে দৌড়াতে শুরু করল। দিনের ম্লান, আবছা আলো তখন ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। শূন্য, শুষ্ক প্রান্তরের উপর দিয়ে

যেতে যেতে সে কিছুই আর ভাবতে পারছে না। যেভাবেই হক এখন নিজের দেহকে উষ্ণ, উত্তপ্ত রাখতে হবে তাকে, রাত্রির জন্য আশ্রয় খুঁজতে হবে। এ সময়ে বাঁচার অবিরাম চেষ্টা ছাড়া অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই তার কাছে।

অকস্মাৎ সে তার পেছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে অবাক হয়ে চারদিকে তাকাল। তারা কি তাকে আবার ধরে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছে? ছোট্ট থলির ভেতর থেকে সে তার শিকারের ছুরিখানা বের করে একটা কাঠের টুকরোর বুকে পরীক্ষা করে নিল। দূরে সেই অশ্বারোহীকে দেখা গেল। নাইটের আস্তাবলের ঘোড়াটিকে সে এবার চিনতেও পারল। তাকে অনুসরণ করেই সেটা এদিকে জোর কদমে এগিয়ে আসছে। এখন পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা বাতুলতা। তাই সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কেমন একটা কৌতূহল আর উত্তেজনায় তার বুক ধুক ধুক করছে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল তার মাথায়, 'অশ্বারোহীকে হত্যা করতে পারলে ঐ ঘোড়াটা আমি পেতে পারি। তারপর আর কি, এ বিশাল পৃথিবী তখন একান্তই আমার।' কিন্তু অশ্বারোহী কাছে এগিয়ে আসতেই গোল্ডমুণ্ড তাকে চিনতে পারল। সহিসের ছেলে হ্যান্‌স্‌। চঞ্চল, নীলাভ দুটি সরল চোখ আর চাঁদপানা, নির্বোধ, গোবেচারা সেই মুখখানি দেখেই গোল্ডমুণ্ড আপন মনে হেসে উঠল। এমন সরল সহজ বোকা ছেলেটাকে মারতে হলে কঠিন, পাষাণ হতে হবে নিজেকে। গোল্ডমুণ্ড হ্যান্‌স্‌কে হেসে অভ্যর্থনা জানাল। তার ঘোড়া হানিবলকে পিঠ চাপড়ে আদর করল। হানিবলও তাকে চিনতে পারল যেন। গোল্ডমুণ্ড ছেলেটাকে প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাচ্ছ হ্যান্‌স্‌?'

সমস্ত দাঁত বের করে হেসে হ্যান্‌স্‌ বলল, 'আপনারই কাছে। আপনি এরই মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন, তাই না? যাক্‌, দেখা তো পেয়েছি। বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। এই নিন, আপনাকে অভিবাদন জানিয়ে এটা পৌঁছে দিতেই এসেছি আমি।'

'কে পাঠিয়েছে?'

'মাননীয়া লিডিয়া পাঠিয়েছেন। ওঃ, আপনি আমাদের সবাইকে খুব বিপদে ফেলে এসেছেন। কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে আসতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। আমি যে আপনার কাছে এসেছি এ কথা কর্তা জানতে

পারলে আমাকে আর আস্ত রাখবেন না। আচ্ছা, এখন এটা ধরুন।' গোল্ডমুণ্ডের দিকে একটা বাণ্ডিল এগিয়ে দিল সে।

'আচ্ছা হ্যান্স্, তোমার থলিতে কি রুটি আছে?'

'রুটি? আচ্ছা দেখি,—একটুকরো থাকলেও থাকতে পারে।' একটুকরো রুটি বের করে সে গোল্ডমুণ্ডের হাতে দিল। তারপর ঘোড়া ঘুরাল।

'তোমাদের কর্ত্রী লিডিয়া কেমন আছেন? তোমাকে তিনি কিছু বলতে বলে দেন নি? কোনো চিঠিও দেননি?'

'না। মাত্র কয়েক মিনিট তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। বাড়ির আবহাওয়া খুবই খারাপ বললাম তো। কর্তা কেবল এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করছেন। আপনাকে শুধু এটাই দেওয়ার কথা। আর কিছু নয় মাস্টার গোল্ডমুণ্ড। আমি এখন তা হলে আসি। আমাকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

'আর এক মিনিট ভাই। হ্যান্স্, তোমার শিকারের ছুরিখানা আমাকে দেবে? আমার ছুরিটা বড্ড ছোট। যদি নেকড়েরা আমাকে আক্রমণ করে তাহলে বুঝতেই তো পারছ একটা ভাল ছুরি হাতে থাকলে কত উপকার হয় আমার।'

কিন্তু হ্যান্স্ তার কথায় কান দিল না। গোল্ডমুণ্ডের কোনো বিপদ হলে সে বিশেষ দুঃখিত হবে জানাল। কিন্তু তার ছুরিখানি সে কোনো কিছুর বিনিময়েই হাত ছাড়া করতে পারবে না।

তারা দুজন দুজনের হাত জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাল। ছেলেটি ঘোড়ায় চড়ে দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত গোল্ডমুণ্ড ব্যথাতুর মনে তার দিকে তাকিয়ে রইল। শক্ত, সুন্দর একটুকরো চামড়ার ফিতে দিয়ে যত্ন করে বাঁধা বাণ্ডিলটাকে দেখে সে খুশি হল। বাণ্ডিল খুলতেই দেখতে পেল তার মধ্যে রয়েছে একটা ধূসর বর্ণের পশমী জামা। লিডিয়া আপন হাতে তারই জন্য বুনেছে এটা। সেই জামার ভাঁজে শক্ত মত কি একটা তার হাতে ঠেকল। খুলে দেখে একখানি স্বর্ণমুদ্রা। কোনো চিঠি নেই। বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে লিডিয়ার এই উপহার হাতে নিয়ে একটু দ্বিধাভরে কি ভাবল। তারপর পশমী জামাটা গায়ে পরে নিল। তার ঠাণ্ডা শীতল দেহখানিকে এক নিমেষে উষ্ণ করে দিল এই পশমী জামার সস্নেহ স্পর্শ। এবারে আবার সে বরফের উপর দিয়ে পথ চলতে শুরু

করেছে। অসহ ক্লান্তিতে পা আর চলতে চাইছে না। তাই ঘুমোবার একটা জায়গা তাকে খুঁজে বের করতেই হবে এবার। বরফের মধ্যে শুয়েই সে রাত কাটাল। সকাল হতেই আবার হাড়-কাঁপানো হাওয়ার মধ্যে বরফের স্তূপ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে অতি কষ্টে এগিয়ে চলেছে সে নিঃসীম একাকীত্ব আর অব্যক্ত বেদনার ভারে ম্রিয়মাণ হয়ে।

কয়েকদিন পর এক ছোট গ্রামের গরীব চাষীর বাড়িতে আশ্রয় নিল সে। তারা তাকে কিছু খেতে দিল। গোল্ডমুণ্ড এখানেও আর এক নূতন বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল। যে বাড়িতে সে অতিথি সেই বাড়িরই একজন মহিলা সেই রাত্রে একটি সন্তান প্রসব করল। গোল্ডমুণ্ড সন্তানের জন্মমুহূর্তে সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা তাদের সাহায্য করবার জন্য তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে। ধাত্রী তার নিজের কাজ করার সময় গোল্ডমুণ্ডকে শুধু মশালটা তুলে ধরে রাখতে বলেছিল। জীবনে এই প্রথম সে মানুষকে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখল। অবাক হয়ে সে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ভাবী মায়ের দিকে তাকাল। প্রসববেদনার সেই চরম মুহূর্তে মায়ের চোখে মুখে যে ভাবখানি ফুটে উঠেছিল তা যে দু-চোখভরে দেখবার মত, উপলব্ধি করবার মত সম্পদ, গোল্ডমুণ্ড এই প্রথম তা মর্মে মর্মে অনুভব করল। মশালের তীব্র আলোকে তার চোখের সামনে এক পরম সত্যের, পরম উপলব্ধির মর্ম উদ্ঘাটিত হল। ব্যথাকাতর মা আর্তস্বরে কেঁদে উঠছে বার বার। ক্লান্ত চোখে মুখে অসহ, অব্যক্ত বেদনার রেখা ফুটে উঠেছে। প্রেমের পূর্ণতার চরম মুহূর্তে তারই আলিঙ্গনাবদ্ধ মেয়েদের চোখে মুখে যে ভাব ফুটে উঠতে সে দেখেছে, এ যেন তারই আরেক অভিব্যক্তি, তারই রূপান্তর মাত্র। আসন্নপ্রসবা মায়ের সর্বাঙ্গে যেমন ব্যথাবেদনার ছায়াই স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে ঠিক তেমনি যৌবনের পরম সুখানুভূতির উপলব্ধিতে অনাবিল আনন্দেরই পূর্ণ বিকাশ হয় মানুষের চোখে মুখে—সর্বাঙ্গে। এই দুই বিভিন্ন অবস্থার মূল উৎস এক। ভাবী মা আর প্রিয়তমা—দু-জনেরই প্রতি অঙ্গ পরম অনুভূতির চরম মুহূর্তে একই ভাবে দুলে ওঠে, অন্তর-নিংড়ানো আকুলতা একই রকম উজ্জ্বল শিখায় প্রদীপ্ত হয়ে নিমেষে মিলিয়ে যায়। গোল্ডমুণ্ড অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগল। তীর ভাবনার এ নূতন দিকটা তাকে বিহ্বল করে দিল।

দ্বিতীয় দিন সেই গ্রামেই একটি লম্বা-চওড়া দুঃসাহসী লোকের সাক্ষাৎ পেল সে। তার নাম ভিক্টর। আধা-যাজক, আধা-ভবঘুরে এই লোকটি

ল্যাটিন উদ্ধৃতি করে নিজেকে খুব উঁচু দরের বিদ্বান বলে জাহির করে। লোকটার রুক্ষ চেহারা, রোদে-পোড়া বলিষ্ঠ দেহ আর নিচু স্তরের সস্তা রসিকতা গোল্ডমুণ্ডকে সহজেই আকৃষ্ট করেছে। গোল্ডমুণ্ড এখনও সস্তা রসিকতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে না পারলেও তাকে তার পথের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো দ্বিধা করল না। শঠতায়, চতুরতায় ও নীচতায় এই লোকটি অদ্ভুত তৎপর। গোল্ডমুণ্ডের জীবনে এমন চরিত্রের লোকের সংস্পর্শে আসার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। সে বুঝল ভিক্টর রোদে জলে বরফে পথে ঘুরে ঘুরে একেবারে ঝানু ভবঘুরে হয়ে গেছে। বছরের পর বছর ছন্নছাড়া অনিশ্চিত জীবনের সবরকম তিক্ততা সহ্য করে এখন উদ্ধত, ধূর্ত ও প্রবঞ্চক হয়ে গেছে। জীবনের অধিকাংশ সময় এভাবে পথে পথে ঘুরলে এমনই পরিণতি হয় হয়তো। একদিন কি সেও ভিক্টরের মত হয়ে যাবে?

পরদিন সকালে তারা দুজন রওনা হল। এই প্রথম গোল্ডমুণ্ড পথ চলার একজন সঙ্গী পেল তার পথের জীবনে। তার কাছ থেকে গোল্ডমুণ্ড দু-তিন দিনের মধ্যেই অনেক কিছু শেখল। গভীর মনোযোগ দিয়ে তার ভ্রাম্যমাণ জীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনছে পথ চলতে চলতে। মানুষের উদারতায়, বিশ্বস্ততায় বিশ্বাস করে তাদের কাছে কিছু দাবি করলে ঠকতে হয়, প্রবঞ্চিত হতে হয়, ভিক্টরের এই মূল্যবান উপদেশের উত্তরে গোল্ডমুণ্ড তাকে জানাল ভিক্টরের মত বুদ্ধিবিবেচনা তার না থাকলেও মানুষকে বিশ্বাস করে সে ঠকেনি কোনোদিন, মানুষ তাকে অযাচিতভাবেও কতবার সাহায্য করেছে, তাকে আশ্রয় দিয়েছে। গোল্ডমুণ্ডের এই কথা শুনে ভিক্টর হেসে পরিহাসতরল স্বরে বলল, 'বন্ধু গোল্ডমুণ্ডের ভাগ্য তাহলে খুবই ভাল বলতে হবে। তুমি বয়সে নবীন, দেখতেও সুদর্শন। তাই রাত্রির আশ্রয় পেতে তোমাকে কোনোদিনই কষ্ট পেতে হয়নি। মেয়েরা তোমাকে দেখে খুব খুশিই হয় আর পুরুষেরাও ভাবে তোমার মত এমন সুন্দর, নির্মল স্বভাবের ছেলে কারও কোনো অনিষ্ট করতেই পারে না। কিন্তু শোন বন্ধু, মানুষের যৌবন আর কতদিনের? রাজকুমারও তো একদিন রূপ যৌবন হারিয়ে বৃদ্ধ হয়। চোখের কোণে বলিরেখা একদিন ফুটে উঠবে সবারই মুখে, আর তখনই মানুষ এই পৃথিবী ও জীবনের সত্য রূপ দেখতে পাবে, জানতে পাবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি বেশিদিন এইভাবে পথের উন্মুক্ত জীবন কাটাবে না। তোমার হাতদুখানি ভারী সুন্দর, সোনালী পাতলা চুলের মধ্য থেকেও

আভিজাত্য ফুটে বের হচ্ছে। সুযোগ-সুবিধা পেলেই হয়তো তুমি তোমরা জীবনের মোড় ঘুরিয়ে ফেলবে। বিয়ে করে সুখে শান্তিতে ঘর বাঁধবে, না হয়, মোটা সোটা ভালমানুষ একজন মহান্ত হয়ে কোন মঠে আরামে জীবন কাটিয়ে দেবে। তাছাড়া, এমন সুন্দর পোশাক পরে তুমি তো যে-কোনো গাঁয়ের জমিদার বলেই গণ্য হতে পার একদিন।'

হাসতে হাসতে ভিক্টর গোল্ডমুণ্ডের ফতুয়ার উপর হাত বুলাতে লাগল। গোল্ডমুণ্ড অনুভব করল তার হাত ফতুয়ার প্রতিটি পকেটে অনুসন্ধিৎসু স্পর্শ বুলাচ্ছে। স্বর্ণ মুদ্রাটির কথা মনে হতেই গোল্ডমুণ্ড একটু পিছিয়ে গেল। তারপর গল্পচ্ছলে ভিক্টরকে নাইটের প্রাসাদের কথা বলল। শীতের প্রারম্ভেই কেন অমন আরামদায়ক আশ্রয় ও আতিথেয়তা স্বেচ্ছায় ছেড়ে পথের নগ্ন জীবনকে আবার সে বরণ করে নিল, ভিক্টর তার কারণ জানতে চাইল। গোল্ডমুণ্ড কোনোদিন মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত না হওয়ায় নাইটের দুই মেয়ে লিডিয়া ও জুলিয়ার কথাও কিছু কিছু তাকে বলে ফেলল। এ কথা জানাবার পর থেকেই এই দু-জনের মধ্যে প্রথম বিবাদের সুত্রপাত হল। নাইটের প্রাসাদ ও মেয়েদের ওভাবে নীরবে ত্যাগ করে আসায় গোল্ডমুণ্ড ভিক্টরের চোখে নির্বোধ বলেই প্রতিপন্ন হল সেদিন। এখনো গোল্ডমুণ্ডের সেই ভুলের মাশুল আদায় করার সময় হয়তো আছে। ভিক্টর গোল্ডমুণ্ডকে তার একটা পরিকল্পনা জানাল। তারা দু-জনে সেই প্রাসাদে আবার ফিরে যাবে। গোল্ডমুণ্ড আত্মগোপন করে থেকে ভিক্টরকে সব দেখিয়ে দেবে আর ভিক্টরই তারপর যা করার করবে। গোল্ডমুণ্ড শুধু লিডিয়ার কাছে একটা প্রেম-পত্র লিখে তার হাতে দেবে। সেই পত্রখানি দেখালেই হয়ত তার বন্ধু সাদর অভ্যর্থনা পাবে। তারপর বেশ কিছু না হাতিয়ে সেই প্রাসাদ থেকে সে বের হবে না। কিছুক্ষণ শোনার পর গোল্ডমুণ্ড রেগে তাকে সাবধান করে দিল। এ বিষয়ে সে আর একটি কথাও শুনতে চায় না তাও বলল।

গোল্ডমুণ্ড সে দিন ভিক্টরের উপর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিরূপ হয়েই রইল। কিন্তু সূর্য অস্ত যাবার পর অন্ধকার ঘনিয়ে এলে যখন রাত্রির জন্য কোনো আশ্রয়ের আশা দেখল না তখন ভিক্টরকেই তাদের রাত্রিবাসের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে অনুরোধ জানাল সে। বনের এক ধারে দু-টি গাছের গুঁড়ির মাঝখানে পাইন গাছের ডালপালা দিয়ে তাদের শয্যা রচনা করতে ভিক্টরকে সাহায্য করল। তারপর দু-জনে মিলে ভিক্টরের থলির ভিতর থেকে রুটি

আর চীজ খেয়ে নিল পেটভরে। গোল্ডমুণ্ড তার রাগের জন্য লজ্জা বোধ করল। এক রাত্রির জন্য ভিক্টরকে তার পশমী জামাটাও পরতে দিল। পর্যায়ক্রমে জেগে থেকে বন্য পশুদের বিরুদ্ধে একজন অন্য জনকে পাহারা দেবে স্থির হল। প্রথম প্রহরে গোল্ডমুণ্ডই জেগে রইল। কিছুক্ষণ সে পাইনের শাখায় হেলান দিয়ে নীরব, নিথর হয়ে বসে থাকার পর উঠে বনের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। নিবিড় অরণ্যের বুকে শীতার্ত রাত্রির গভীর অন্ধকারের মধ্যে এভাবে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল এ জগতে সে ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই। অশান্ত মনে অফুরন্ত প্রশ্নের বোঝা নিয়ে একটি একেলা, নিঃসঙ্গ জীবন নিরুত্তর এই আকাশের নিচে, নির্বাক পৃথিবীর কোলে অসহায় দাঁড়িয়ে আছে স্থির, নিশ্চল হয়ে।

একটু পরে গোল্ডমুণ্ড ফিরে এসে ঘুমন্ত বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে তার নিঃশ্বাসের শব্দ কান পেতে শুনতে লাগল। ছন্নছাড়া, গৃহহারা ভবঘুরেদের জীবনের মর্মকথা সে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করল। তারা কোনো প্রাসাদ, বাড়ি বা মঠের সস্নেহ আশ্রয়ের বাঁধনে নিজেদের জড়িয়ে রাখেনি। তাদের মাথার উপরে এখন উন্মুক্ত নিঃসীম আকাশের চন্দ্রাতপ, আর পায়ের নীচে শস্য শ্যামলা বিপুলা পৃথিবীর কোমল মাটির পরশ। স্থির, গম্ভীর অরণ্যানীর বুকে আদিম মানবশিশুর মতই তারা অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে অজস্র শত্রুর বিরুদ্ধে। গোল্ডমুণ্ড ভাবল এবার, সে কখনও ভিক্টরের মত হবে না। সমস্ত জীবনভর পথে পথে কাটালেও সে এমন হবে না কোনো দিন। ভবঘুরে হলেই তাকে শঠতা, প্রতারণার কপট পথ বেছে নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে, ভিক্টরের মত এই ধারণা তার কোনো দিনই নেই। ভিক্টর হয়তো ঠিকই বলেছে গোল্ডমুণ্ড কোনো দিনই তার উপযুক্ত সাথী হতে পারবে না, পুরোপুরি ভাবে ভবঘুরে, গৃহহারা হতে পারবে না। একদিন হয়তো চার দেওয়ালের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতেই তাকে ফিরে যেতে হবে, নিজেকে বাঁধতে হবে। কিন্তু তা হক আর নাই হক, সে কিন্তু নিজেকে ঘরছাড়া, ভবঘুরে বলেই মানে। পথের জীবনই তার আপন জীবন, সেখানেই সে আপনাকে খুঁজে পেয়েছে। এই জাতটা চিরদিনই তার কাছে একটা বিরাট ধাঁধার মত দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়। শেষ পর্যন্ত তাকে পৃথিবীর এই চির রহস্যময় নীরব নিরুত্তর প্রশান্তির কাছে নত

হতে হবে। নিজের জীবনের অনিত্যতা ও ব্যর্থতাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হবে জীবন-দেবতার পায়ে।

তার মাথার উপরে আকাশের কোলে কয়েকটি তারা ঝিকমিক করছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশের বুকে। একটুও বাতাস বইছে না। চারিদিক নীরব, নিথর। গোল্ডমুণ্ড ভিক্টরকে জাগাল না। ভিক্টর অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাল, তারপর একসময় জেগে উঠে চিৎকার করে বলল, 'এস, এস, এবার একটু ঘুমিয়ে নাও। না হলে কাল আবার অচল হয়ে পড়বে।' গোল্ডমুণ্ড তার কথামত পাতার বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল। এত ক্লান্ত হয়েছে সে তবুও ঘুম এল না চোখে। তার ভাবনাই তাকে জাগিয়ে রাখল। তার এই পথচলার নূতন সাথীটির জন্যই কেমন একটা দুশ্চিন্তা তার মনকে কাল করে তুলেছে। এই বদমাস লোকটার কাছে সে কেন যে লিডিয়ার কথা বলল তাও বুঝতে পারছে না। ভিক্টরের প্রতি এবং নিজের প্রতিও তার রাগ হল সহসা। এই সঙ্গীটির সঙ্গ তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিহার করতেই হবে। ভাবতে ভাবতে কখন সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, সহসা চমকে উঠে অনুভব করল ভিক্টরের হাত তার ফতুয়ার পকেটে, দেহের এদিক ওদিকে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার এক পকেটে ছুরি আর অন্য পকেটে সেই স্বর্ণমুদ্রাটি রয়েছে। ভিক্টর দেখতে পেলে দুটোই চুরি করে নেবে। গভীর ঘুমের ভান করে গোল্ডমুণ্ড একখানি হাত বুকের উপর সরিয়ে নিল। এবার ভিক্টর সরে গেল। রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে গোল্ডমুণ্ড স্থির করল কালই এই দুষ্ট-সঙ্গ বর্জন করতে হবে তাকে।

কিন্তু আবার প্রায় একঘণ্টা পর ভিক্টর যখন নিচু হয়ে তার পকেট হাতড়াতে আরম্ভ করল তখন গোল্ডমুণ্ড আর স্থির থাকতে পারল না। তেমনই নিশ্চল হয়ে শুয়ে থেকে চোখ খুলে তিক্ত স্বরে বলল, 'সরে যাও। চুরি করবার মত কিছুই খুঁজে পাবে না ওখানে।' তার কথা শুনে চমকে উঠে ভিক্টর তার সবল দু-হাতের মুঠোয় গোল্ডমুণ্ডের গলা চেপে ধরল। গোল্ডমুণ্ড তাকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার বুকের উপর এক হাঁটু দিয়ে ভিক্টর তাকে মাটিতে শক্ত করে চেপে ধরেছে। গোল্ডমুণ্ডের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। নিজেকে আততায়ীর নিষ্ঠুর হাত থেকে ছাড়াতে না পেরে নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কায় তার দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। হঠাৎ তার ছুরির কথা মনে পড়তেই কোনরকমে পকেটে হাত

ঢুকিয়ে ছুরিটা বার করে নিয়ে অন্ধের মত ভিক্টরকে বার বার সজোরে আঘাত করতে লাগল। এবার ভিক্টরের সবল মুষ্টি আলগা হয়ে গেলে গোল্ডমুণ্ড নিঃশ্বাস নিতে পারল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এবারের মত জীবনকে ফিরে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে ·ারপর উঠবার জন্য চেষ্টা করতেই দেখল তার দীর্ঘকায় সাথীটি জড় স্তূপের মত তারই উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। গলা দিয়ে ক্ষীণ আর্তনাদ বের হচ্ছে তখনো; ক্ষতের রক্তধারা গোল্ডমুণ্ডের মুখের উপর ঝরে পড়ছে। গোল্ডমুণ্ড তাকে ঠেলে পাশে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আবছা আলোতে দেখল লোকটা রক্তাক্ত একটা জড়পিণ্ডের মত পড়ে আছে। মাথাটা একটু তুলে ধরে আবার ছেড়ে দিতেই ভারী একটা বোঝার মত মাটিতে পড়ল। ঘাড় এবং পিঠ থেকে তখনো রক্তের ধারা ঝরে পড়ছে। সহসা তার মুখ দিয়ে গভীর একটা শ্বাস বেরিয়ে এসে হাওয়ায় মিশে গেল। লোকটার জীবনদীপ নিভে গেল সেই নিমেষে। মৃত ভিক্টরের উপর নুয়ে পড়ে গোল্ডমুণ্ড তার পাণ্ডুর মুখখানি দেখতে দেখতে ভাবল, 'আমি হত্যা করেছি, একজন মানুষকে হত্যা করেছি!' এ ভাবনাটা তার সমস্ত মনকে ছেয়ে ফেলল।

'মা, মাগো, আমি হত্যা করেছি, হত্যা করেছি,' তার আপন আর্ত স্বর সে নিজেই কতবার শুনে শিউরে উঠছে।

হঠাৎ তার মনে হল আর একটি মুহূর্তও এখানে থাকতে পারবে না সে। এখনও ভিক্টরের গায়ে লিডিয়ার ভালবাসার স্মারক তারই আপন হাতে বোনা পশমী জামাটা রয়েছে। সেটা দিয়েই সে ছুরিটা মুছল। ছুরিটা কাঠের খাপের মধ্যে পুরে সেই জামার পকেটে ঢুকিয়ে রেখে দিল। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে চলল। রসিক, ভবঘুরে লোকটির মৃত্যু তাকে গভীর দুঃখ দিয়েছে। সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের সমস্ত রক্ত ভাল করে ধুয়ে নিল ঝরনার ধারায়। তারপর একদিন একরাত্রি উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথ চলল সে। শেষ পর্যন্ত তীব্র ক্ষুধার অনল-দহনে অন্য সকল অনুভূতিকে নিঃশেষে ভুলে গেল।

বরফে ঢাকা শূন্য প্রান্তরের বুকে আশ্রয়হীনভাবে শুধু পথকে সম্বল করে চলতে চলতে গোল্ডমুণ্ড বন্য, দুরন্ত, উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠল। ক্রোধোন্মত্ত বন্য পশুর মতই চিৎকার করে উঠতে লাগল মাঝে মাঝে। আবার এক এক সময় কেমন স্তিমিত-হয়েও পড়তে লাগল। এখন সে শুধু ঘুমাতে

চায়, বরফের বুকে পড়ে মরতে চায়। কিন্তু নিদারুণ জঠরানল তাকে কোনো ভাবেই শান্তি দিচ্ছে না। বেঁচে থাকবার জন্য মানবজীবনের সবচেয়ে আদিম যে ক্ষুন্নিবৃত্তি, তারই নৃশংস, নগ্ন তাড়নায় সে পাগলের মত দিশাহারা হয়ে ছুটে চলেছে। তুষারাবৃত জুনিপার ঝোপ থেকে তার নীল, নিশ্চল, জমাট-বাঁধা আঙ্গুলগুলি দিয়ে কোনো রকমে শুকনো ফলগুলি ছিঁড়ে এনে চিবোতে লাগল। কাঁটাভরা তিক্ত সেই অজানা ফল খেয়ে মুখ বিস্বাদে ভরে গেল। তখন পাগলের মত দু-হাতের মুঠোয় বরফ তুলে নিয়ে তৃষ্ণা মেটাবার জন্য গিলতে লাগল। শীতের দংশনে অসাড়, হাতদুটোকে নাড়তে নাড়তে একটা ছোট্ট টিলার গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে বসল সে। চারিদিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল কোথাও কোনো জনবসতি দেখা যায় কি-না। যতদূর দৃষ্টি গেল শুধুই শুষ্ক প্রান্তর ও নিবিড় বনভূমি, জনমানব নেই কোথাও। তার মাথার উপর দিয়ে দুটি শকুন উড়ে গেল দেখে তাদের দিকে ঈর্ষাতুর বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল গোল্ডমুণ্ড। না, তারা তাকে তাদের খাবার করতে পারবে না, কিছুতেই পারবে না। তার পায়ে যতক্ষণ সামান্য একটুও শক্তি অবশিষ্ট থাকবে, রক্তের মধ্যে জীবনীশক্তির সামান্যতম স্ফুলিঙ্গও থাকবে ততক্ষণ সে তা হতে দেবে না। উঠে দাঁড়িয়ে আবার সে দৌড়ে ছুটে চলল ; নিষ্ঠুর, নির্মম মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাঁচবার জন্যই সে দৌড়ে চলেছে। জীবনকে আঁকড়ে ধরার এই সর্বশেষ প্রচেষ্টায় তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে ক্লান্ত, অবসন্ন গোল্ডমুণ্ড হাজার হাজার বিচিত্র ভাবনার তাড়নায় উন্মাদপ্রায় হয়ে মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গেই প্রলাপ বকতে বকতে ছুটে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে আর বেচারী ভিক্টরকে তার মনে রইল না। জুলিয়ার মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই রাত্রির মতই জুলিয়া এবার সামনে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। জীবনের প্রতি তার গভীর একটা মমত্ববোধ জেগে উঠল। এবার যেন নরজিসকে দেখতে পেয়ে তারই সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল সে। এভাবে উদ্‌ভ্রান্ত গোল্ডমুণ্ড ছুটে চলেছে দিনের পর দিন। মৃত্যুর কবল থেকে পালিয়ে যাবার আদিম প্রবৃত্তি তাকে এভাবে পথে বিপথে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে অবিরাম। শেষে যে গ্রামে পৌঁছে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল, কয়েকদিন আগে সেই গ্রামেই ভিক্টরের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। জ্ঞান হারিয়ে স্থির, নিশ্চল হয়ে সে পড়ে রইল। গ্রামের

একটি কৃষক বধূ তাকে দেখেই চিনতে পেরে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তাদের ঘরে নিয়ে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই গোল্ডমুণ্ড আবার সুস্থ হয়ে উঠল। কয়েকদিনের গভীর নিরবচ্ছিন্ন ঘুম, আর ছাগলের দুধ তার হৃত শক্তিকে ফিরিয়ে আনল। ভিক্টরের সঙ্গে সেই পথ চলার স্মৃতি, পাইনের বনে শীতার্ত ভয়াবহ রাত্রিতে তার সঙ্গীর শেষ পরিণামের তিক্ত স্মৃতি আর নির্জন প্রান্তরের বুকে দিশাহারা হয়ে উন্মাদের মত পথ চলার স্মৃতি কিছুই তার স্পষ্ট মনে পড়ছে না এখন। শুধু তারই কিছু রেশ এখনও তার মনের কোণে লেগে রয়েছে। কেমন বিচিত্র এক ভয়, আশঙ্কা আর বেদনার অব্যক্ত অনুভূতি তার অন্তরকে ঘিরে রেখেছে দিনরাত। এর হাত থেকে তার যেন মুক্তি নেই। গত দু-বছরের মধ্যে সে ভবঘুরে জীবনের সত্যকার রূপ চিনে নিয়েছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শীত গ্রীষ্ম বর্ষায়, বরফে রোদে জলে নির্জন প্রান্তর ও নিবিড় অরণ্যের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছে সে। প্রতি মুহূর্তে একটা মৃত্যুভয় তাকে অনুসরণ করে চলেছে। তবুও সেই নির্মম মৃত্যুকে অস্বাকার করতে অবিরাম চেষ্টা করছে সে। আততায়ীকে হত্যা করে নিজের জীবন বাঁচিয়ে জীবনের মূল্য ও মর্যাদা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছে গোল্ডমুণ্ড। ভালবাসার কামনার স্বাভাবিক পরিণতি আর মৃত্যুপথযাত্রি আসন্ন-প্রসবা মায়ের আনন্দ-বেদনা-ভরা আকুলতা দুই-ই জীবনের পরম জ্ঞানের রূপান্তর মাত্র, এ সত্য গোল্ডমুণ্ড তার পথেরজাবনেই উপলব্ধি করেছে। মুমূর্ষু ভিক্টরের অন্তিম মুহূর্তের গভীর সেই দীর্ঘশ্বাস আজও সে ভুলতে পারেনা।

নরজিসকে এ সব কথাই বলতে হবে। কত কথা তাকে বলবার আছে। নরজিস ছাড়া আর কেইবা তার কথা বুঝবে!

খড়ের বিছানায় তার জ্ঞান ফিরে আসতেই স্বর্ণমুদ্রাটির কথা মনে পড়ল। পকেট হাতড়ে সেটা পেল না। কি করে সেটা হারিয়ে গেল? অনেকক্ষণ সে চিন্তা করল। এই স্বর্ণমুদ্রাটি তার একান্ত প্রিয়, এটা সে হারাতে চায় না। এটাই লিডিয়ার একমাত্র উপহার, স্মৃতিচিহ্ন। সেই পশমী জামাটা তো মৃত ভিক্টরের গায়ে রক্তাক্ত হয়ে অনাদরে অবহেলায় বনের মধ্যেই পড়ে রইল। এই স্বর্ণমুদ্রাটির জন্যই সে ভিক্টরকে হত্যা করেছে। এখন এটা হারিয়ে গেলে তার সেই নিষ্ঠুর কাজেরও কোনো অর্থ থাকে না। অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর গোল্ডমুণ্ড মেয়েটিকে এবিষয়ে প্রশ্ন করল। বিচিত্র, কোমল হাসি হেসে

মেয়েটি বলল, 'ও' তাহলে তুমি তা লক্ষ্য করেছ। কেউ কি এভাবে থলির মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে পথ চলে নাকি? খুঁজে দেখ না, কোথায় আছে।' গোল্ডমুণ্ড তার কথামত কিছুক্ষণ খুঁজে দেখল। শেষ পর্যন্ত তার ফতুয়ার যে জায়গাতে স্বর্ণমুদ্রাটি ভরে সেলাই করে দিয়েছে মেয়েটি, সেই জায়গা দেখিয়ে দিল তাকে। সরলা সেই পল্লীবধূর লজ্জারুণ দৃষ্টি কোনোদিন বুঝি ভুলতে পারবেনা সে।

মেয়েটিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গোল্ডমুণ্ড আবার যেদিন পথে বের হল সেদিন পথের বুকে বরফ গলতে শুরু করেছে। আবহাওয়া কেমন ভারী আর স্যাঁতসেঁতে। বসন্তের মৃদু হাওয়া বইছে চারদিকে।

দশ

বসন্তের ছোঁয়ায় বরফ গলে ঝরণাধারা ও নদীগুলি তরতর করে বয়ে চলেছে আবার। শুকনো ঝরা পাতার সোঁদা গন্ধে আবিল হাওয়া এখন ভায়োলেট ফুলের মদির সৌরভে আকুল হয়ে উঠেছে। বসন্তের মায়াময় স্পর্শে চারিদিকের অপরূপ শোভা দু-চোখ ভরে দেখতে দেখতে গোল্ডমুণ্ড পথ চলেছে দিনের পর দিন, পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, প্রান্তর পেরিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কোনো বাড়ির আলোকিত জানলার নীচে বসে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে আবার তার পথ চলা শুরু হয়। রাত্রির মোহময় যাদুস্পর্শে ঘরের ভেতর যে শান্তিপূর্ণ আরামদায়ক সুখী জীবনের আভাস সে পায় তারই কল্পনায় কতক্ষণ হয়তো বিমনা, বিষণ্ণ হয়ে থাকে।

এই চলার পথে একদিন সূর্য অস্ত যাবার সময় নদী আর রক্তিম দ্রাক্ষা-কুঞ্জের মাঝখানে একটি সুন্দর সমৃদ্ধ গ্রামের কোলে এসে দাঁড়াল গোল্ডমুণ্ড। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গ্রামখানি, চারদিকে ছবির মত সুন্দর ঘর বাড়ি, অলি গলি, বাঁধানো সিঁড়ি, চাতাল। পথ চলতে চলতে দেখল একটা কামারশালা থেকে আগুনের ফুলকি ছুটে এসে পথে ছড়িয়ে পড়ছে। জ্বলন্ত লোহার উপর হাতুড়ির টুং টাং শব্দ হচ্ছে। সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে গোল্ডমুণ্ড চারিদিকের সবকিছু দেখতে দেখতে রাজপথের জনারণ্যে আপনাকে মিলিয়ে দিল। বসন্তের রঙ্গিন দিনগুলির নূতন অভিজ্ঞতার কত ছবি তার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে।

কত গ্রাম, কত নগর তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল বাগানে, মাঠে।. কর্মরতা মেয়েদের আর বিকেল বেলায় গ্রামের পথে কিশোরীদের আনন্দ-কলতান তাকে আজ কত-না আনন্দ দিচ্ছে।

জনহীন অরণ্যে প্রান্তরে দীর্ঘদিনের নিঃসঙ্গতার পর এখন এই নগরজীবন বড় ভাল লাগছে তার। বহুদিনের অনাহার, অর্ধাহার এবার শেষ হয়েছে। দিনের পর দিন নীরব, নির্বাক থাকবার পর এখন সবার সঙ্গে প্রাণ খুলে হেসে গল্প করতে ভাল লাগছে। নগরের ব্যস্ত জীবন প্রবাহে আপনাকে সে এমনি করে ভাসিয়ে দিল।

একটা মঠে গিয়ে রাত কাটাল সে। পরদিন সকাল বেলা সেখানে প্রার্থনা সঙ্গীতে যোগ দিল। মঠের পবিত্র সুন্দর পরিবেশ তাকে মেরিয়াব্রোণের স্মৃতি মনে করিয়ে দিল। প্রার্থনা শেষ হয়ে গেলে চার্চ যখন আবার নীরব, নিথর হয়ে পড়ল তখনও সে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে একমনে। গতরাত্রে অনেক স্বপ্ন দেখেছে গোল্ডমুণ্ড। এখন অতীত জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য সব কথা স্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করছে সে। জীবনের যত পাপ, অন্যায় সব স্বীকার করে অন্য ভাবে, অন্য পথে জীবনটাকে চালাবার সময় হয়েছে। কি ভাবে তা করবে তা অবশ্য জানে না। হয়তো এই মঠের পরিবেশই মেরিয়াব্রোণের তার যৌবনের স্মৃতিকে আবার নূতন করে জাগিয়ে তুলে তার অন্তরাত্মাকে এভাবে ব্যাকুল করে তুলেছে। সে তার পাপ স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। অনেক ছোট খাট পাপ সে করেছে। কিন্তু সবার উপর ভিক্টরকে হত্যা করার পাঁপ তার বুকের উপর পাষাণের মত বোঝা হয়ে চেপে থেকে তাকে অহরহ যন্ত্রণা দিচ্ছে। একজন ফাদারকে খুঁজে বের করে তার কাছে তার সকল পাপের কথা, বিশেষ করে ভিক্টরকে নৃশংসভাবে হত্যা করার কথা অকপটে খুলে বলল সে। কিন্তু এই সন্ন্যাসী ভবঘুরেদের জীবন কেমন হয় তা ভাল করেই জানেন। তিনি সহজ ভাবেই তার কথা শুনলেন। তাকে একজন বড় পাপী মনে করে ভীত বা বিস্মিত না হয়ে শান্তভাবে শুধু আশীর্বাদ করলেন। গোল্ডমুণ্ড হালকা মনে উঠে দাঁড়াল এবার। ফাদারের নির্দেশ মত বেদীর সামনে গিয়ে প্রার্থনা করল। প্রার্থনা শেষে উঠে আসবার সময় পাশের এক বেদীর উপর একটি মূর্তির দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। জানালা-দিয়ে-আসা এক ঝলক সূর্যের আলোকে মূর্তিটিকে দেখা মাত্রই বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় হতবাক হয়ে সে সেদিকে তাকিয়ে রইল। মূর্তিটি অপূর্ব এক দেবী প্রতিমা।

কুমারী মাতা, জগন্মাতারই প্রতিমূর্তি বুঝি। নীল অঙ্গাবরণ পরে সেই দেবী প্রতিমা বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য, মাধুর্য আর ভালবাসার পূর্ণ প্রতীকরূপে অপরূপ মহিমায় সেখানে দাঁড়িয়ে, একখানি হাত তারই দিকে এগিয়ে দিয়েছে। চোখ-দুটি তার অদ্ভুত উজ্জ্বল, মুখখানি বিষাদ ভরা। পবিত্র কোমল কপাল খানিতে পরিপূর্ণ জীবন ও গভীর ভালবাসার স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছেন কোন্ মহান্ শিল্পী! স্বর্গের গরিমা আর মর্ত্যের সুষমাকে একসঙ্গে মিলিয়ে তারই ব্যঞ্জনায় এই বিষাদময়ী দেবী প্রতিমাকে প্রাণবন্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন। গোল্ডমুণ্ড এমন অপূর্ব মূর্তি আর কখনও দেখেনি। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সেখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে পেছন ফিরতেই ফাদারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ফাদার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ভাল লেগেছে?' গোল্ডমুণ্ড বিহ্বল স্বরে বলল, 'হাঁ। মূর্তিখানি অপরূপ, অনন্য।'

'অনেকেই তাই বলে। আবার অনেকের মতে নাকি যথার্থ দেবী প্রতিমা হয়নি মূর্তিখানি। এই পৃথিবীর অনেক রূপ রস যেন তাঁর সত্যিকারের স্বর্গীয় মহিমাকে ম্লান করে দিয়েছে। দু-রকম মতই আমাদের শুনতে হয়। তোমার ভাল লেগেছে জেনে খুশি হলাম। ভাস্কর শিল্পী মাষ্টার নিকোলাস মূর্তিটি গড়েছেন।'

'মাস্টার নিকোলাস? কে তিনি? কোথায় থাকেন? আপনি কি তাঁকে চেনেন? আপনার পায়ে পড়ছি, তাঁর বিষয় আমাকে কিছু বলুন। এমন অপূর্ব সৃষ্টি যিনি করেছেন তিনি নিশ্চয়ই খুব উঁচু দরের শিল্পী।'

বিশেষ কিছুই জানি না আমি। শুধু জানি তিনি একজন বিখ্যাত ভাস্করশিল্পী। এখান থেকে একদিনের রাস্তা, 'বিশপ-নগরী'তে থাকেন। আমি তাঁকে কয়েকবার দেখেছি'—

'দেখেছেন? কেমন দেখতে তিনি?'

'তোমাকে তিনি যাদু করেছেন দেখছি। বেশ তো, তাঁকে খুঁজে বের করে তাঁর সঙ্গে দেখা কর। তাঁকে বলবে ফাদার বনিফজিয়াস তাঁকে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে।'

গোল্ডমুণ্ড তাঁকে ধন্যবাদ জানালে ফাদার মৃদু হেসে চলে গেলেন। কিন্তু গোল্ডমুণ্ড তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। রহস্যময়ী এই দেবী-

প্রতিমার হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে সে। বিচিত্র সেই সৃষ্টি তার অন্তরে গভীর এক আলোড়ন তুলল। সুধাময়ী দেবীপ্রতিমাকে দেখা মাত্রই এক অভূতপূর্ব উপলব্ধিতে চমকে উঠেছে সে। এবার তার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে। এতদিন যেন তার মনের এদিকটা অজানাই ছিল তার কাছে। জীবনের একটা পরম আকাঙ্ক্ষাকে সে নিজের মধ্যে সুপ্ত দেখল আজ। তার জীবনেরও এই একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য। আর সে লক্ষ্যে তাকে একদিন পৌঁছতেই হবে। তখন হয়তো তার দ্বিধা-ভরা, বিক্ষুব্ধ এই জীবনের গতি বদলে গিয়ে সম্পূর্ণ নূতন এক পথ গ্রহণ করবে। তার জন্মান্তর ঘটবে, জীবনের যথার্থ অর্থ খুঁজে পাবে সে তখন। এই উপলব্ধি সহসা তার মনে একই সঙ্গে আনন্দ ও ভয়ের সঞ্চার করল। এখন আর উদ্দেশ্যহীন ভাবে অকারণ পথ চলবে না সে। মাস্টার নিকোলাসের কাছে যেতেই হবে তাকে। এই এক উদ্দেশ্য নিয়েই দ্রুত পথ চলছে সে। দিনশেষে নগরীর উপকণ্ঠে পৌঁছে দূর থেকেই সুউচ্চ, আলোকোজ্জ্বল সৌধচূড়াগুলি দেখতে পেল। রাজপথের সকল কোলাহল তুচ্ছ করে সে একমনে ছুটে চলেছে। ফটকের সামনে প্রথম নাগরিককেই মাস্টার নিকোলাসের বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু সে কিছু বলতে না পারায় মর্মাহত হল। হাঁটতে হাঁটতে একটা পার্কের পাশে কতকগুলি প্রাসাদোপম কারুকার্যময় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। একটি বাড়ির প্রকাণ্ড ফটকের সামনে দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ একটি প্রস্তরমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। দেবীপ্রতিমাটির মত অপূর্ব না হলেও সৈনিকের এই মূর্তিটির মধ্যেও জীবনের এক নির্ভীক বলিষ্ঠ রূপেরই চরম বিকাশ। গোল্ডমুণ্ড নিশ্চিত ভাবেই বুঝতে পারল এই মূর্তিটিও মাস্টার নিকোলাসেরই সৃষ্টি।

সেই বাড়ির ভেতরে দৌড়ে প্রবেশ করে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের কাছ থেকে মাষ্টার নিকোলাসের বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে সে অনেক খুঁজে যখন বাড়িটি বের করল তখন সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসেছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে নিকোলাসের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে যাবে কি না ভাবল। তারপর তার মনে পড়ল এখন রাত্রি অনেক হয়েছে, দরজার কাছ থেকে এভাবে ফিরে যেতে মন না চাইলেও সেদিন সে ফিরেই যাবে স্থির করল। একটু বিশ্রাম করে নেবে বলে দরজার সামনেই দাঁড়াল কিছুক্ষণ।

পরদিন সকালবেলা শয্যা ছেড়ে অত্যন্ত উৎসুক মনে গোল্ডমুণ্ড আবার সেই পথ ধরে সেই বাড়ির সামনে এসে দরজার কড়া নাড়ল।

একটি বৃদ্ধা পরিচারিকা তাকে প্রথমে ঢুকতে দিতে চাইল না। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর গোল্ডমুণ্ড ভেতরে প্রবেশ করতে পারল। মাষ্টার নিকোলাস তখন তাঁর শিল্পাগারে দাঁড়িয়েছিলেন। দীর্ঘকায়, শ্মশ্রুল এক ভদ্রলোক চামড়ার এপ্রোন পরে দাঁড়িয়ে আছেন। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। গোল্ডমুণ্ড আসতেই তিনি তাঁর নীলাভ, তীক্ষ্ণ দুটি চোখের প্রখর দৃষ্টি তুলে ধরলেন তার দিকে। কেন সে এসেছে জিজ্ঞেস করতেই গোল্ডমুণ্ড তাঁকে ফাদার বনিফেসের শুভেচ্ছা জানাল।

'শুধু কি এ কারণেই এসেছ?' বিরক্তিভরা স্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন।

সসংকোচে গোল্ডমুণ্ড বলল, 'মাস্টার, আমি আপনার গড়া দেবী-প্রতিমাটিকে দেখেছি। অন্তরের সমস্ত ভালবাসা আর শ্রদ্ধা নিয়েই আপনার কাছে এসেছি আমি। জীবনের অধিকাংশ সময় পথে পথেই কাটিয়েছি, ভবঘুরের রুক্ষ জীবনের সঙ্গে আমি একান্তভাবেই পরিচিত। এ জগতে কোন কিছুকেই ভয় পাই না আমি, তবুও আপনাকে বড় ভয় পাচ্ছি। আমাকে আপনি ফিরিয়ে দেবেন না যেন। আমার জীবনের একটি মাত্রই আকাঙ্ক্ষা আছে আর সেই আকাঙ্ক্ষাই আমাকে দিন রাত কষ্ট দিচ্ছে।'

'কি সে আকাঙ্ক্ষা?'

'আপনার কাছে কাজ শিখব, আপনার শিষ্য হব।'

'সে কথা তো অনেকেই বলে। কিন্তু আমার কোনো শিক্ষানবিসের দরকার নেই। আচ্ছা, তুমি কোথা থেকে এসেছ? তোমার মা বাবা কোথায় থাকেন?'

'আমার কেউ নেই, আমার বাড়িও নেই। একটা মঠে ছাত্র হয়ে কিছুদিন ছিলাম, সেখানেই ল্যাটিন আর গ্রীক শিখেছি, তারপর সেখান থেকে পালিয়ে চলে এসেছি। আর সেই থেকেই পথে পথে ঘুরছি।'

'তা, ভাস্কর হতে চাও কেন? এরকম কিছু কি কোনো দিন শিখতে চেষ্টা করেছ? তোমার আঁকা কোন ছবি দেখাতে পার?'

'আমি অনেক ছবি এঁকেছি। কিন্তু সবই হারিয়ে গেছে। জীবনে বহু মুখ, বহু মূর্তি দেখেছি যাদের এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না। আমার ভেতরকার এই বিচিত্র মূর্তির জগৎ আমাকে এতটুকুও শান্তি দেয় না। আমি জানি সমস্ত উপাদান একত্র করে তিল তিল করে একটি মূর্তি সৃষ্টি করতে হয়। আরও জেনেছি মানুষের গভীর দুঃখবেদনা এবং চরম আনন্দ ও

পরিতৃপ্তি—দুয়েরই অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা এক। নিবিড় বেদনার মধ্যে থেকেই পরম আনন্দের জন্ম।'

মাস্টার নিকোলাস গোল্ডমুণ্ডের দিকে সাগ্রহে তাকালেন এবার। বললেন, 'তুমি কি বলছ তা তুমি জান?'

'হাঁ, জানি। আপনার ঐ দেবীপ্রতিমার মধ্যেই আমার মর্মকথা মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর সেজন্যই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। পবিত্র, সুন্দর মুখখানিতে গভীর দুঃখবেদনার ছায়া, তবুও সেই নিবিড় বেদনাই যেন আবার নির্মল হাসি ও মধুর আনন্দে রূপান্তরিত হয়েছে। আপনার এই অসাধারণ সৃষ্টি দেখে অনাস্বাদিত এক উপলব্ধিতে আমার মন ভরে উঠেছে। জীবনভর আমি যা ভেবেছি, যে স্বপ্ন দেখেছি তাকেই যেন খুঁজে পেলাম আপনার এই সৃষ্টির মধ্যে। সহসা বুঝতে পারলাম এখন আমি কি করব, কোথায় যাব। মাষ্টার নিকোলাস, দয়া করে ফিরিয়ে দেবেন না, বিমুখ করবেন না আমাকে।'

নিকোলাসের মেজাজ তখন বেশ রুক্ষ ছিল। তবু তিনি তার কথা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, 'শোন যুবক, তুমি বেশ সুন্দর কথা বলতে পার দেখছি। বিশেষ করে তোমার এই কচি বয়সে এমন করে মূর্তি গড়ার কথা ভাষার চাতুর্যে প্রকাশ করা খুবই কঠিন। তবুও এক সঙ্গে বসে সুন্দর সুন্দর কথা বলা আর বছরের পর বছর কাজ করে যাওয়া—এই দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। একজন কি ভাবে কত সুন্দর করে কথা বলল তার কোনো মূল্যই নেই এখানে। আমার শিল্পাগারে দু-টি হাতের স্পর্শে কি সৃষ্টি করা যায় তাই জানতে হবে। তোমাকে এখনই বিদায় করতে চাই না। সত্যিই কিছু সম্পদ তোমার মধ্যে আছে কিনা আমাকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে দাও। আচ্ছা, মোম অথবা মাটি দিয়ে মূর্তি গড়বার চেষ্টা করেছ কি কোনোদিন?'

বিনীতভাবে জানাল যে কোনোদিনই সে কিছু গড়েনি।

'বেশ, এখন একটা কিছু এঁকে আমাকে দেখাও তাহলে। ঐ যে টেবিল রয়েছে। কাগজ, পেন্সিল, সবই রয়েছে। বসে আঁকতে শুরু কর। তাড়াতাড়ি করবে না। যতক্ষণ ইচ্ছা বসে আঁক। আমার কাজ আছে, চললাম।'

গোল্ডমুণ্ড আঁকবার টেবিলের সামনে গিয়ে বসল। কিন্তু তখনই কাজ শুরু করতে পারল না। শান্ত হয়ে বসে রইল শুধু। মাস্টার নিকোলাস

তখন অন্য দিকে একটা মূর্তি হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগে কাজ করছেন। গোল্ডমুণ্ড তাঁরই দিকে তাকিয়ে রইল। গোল্ডমুণ্ড নিকোলাসকে যেমন কল্পনা করেছে তিনি ঠিক তেমন নন কিন্তু। কেমন যেন ম্লান, বিষণ্ণ, বয়স্ক। ধীর, স্থির, নিরানন্দ। তিনি যে সুখী নন তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

এবার সে নিবিষ্ট মনে এই মহান শিল্পীর মুখাবয়বখানি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তাঁর অশেষ ধৈর্য ও বেদনালব্ধ জ্ঞান, নিগূঢ় শিল্পচেতনা, নম্রতা, জীবন সম্বন্ধে অনন্ত জিজ্ঞাসা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর শিল্পীর আত্ম-প্রত্যয়—সমস্তই তাঁর মুখের প্রতিটি রেখায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই শিল্পীর হাত দু-খানি তার সুনিপুণ অঙ্গুলিস্পর্শে যখন কোমল মাটির তাল নিয়ে সৃষ্টি করে চলে তখন মনে হয় প্রেমিক যেন তার প্রিয়তমাকে সমস্ত অন্তরের আকুলতা ঢেলে সস্নেহে, সযতনে স্পর্শ করছে, বীণাবাদক তার বীণার তারে অপূর্ব এক সুরের ঝঙ্কার তুলছে, মনের সকল মাধুরী দিয়ে আত্মভোলা এক শিল্পী তার সৃষ্টিকে চিরন্তন করে রাখবার সাধনায় মগ্ন হয়ে আছে। অবাক বিস্ময়ে গোল্ডমুণ্ড নিকোলাসের নিপুণ হাত দু-খানির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। কর্মরত শিল্পীকে প্রায় এক ঘণ্টাকাল নিরীক্ষণ করে তার শিল্পসত্তার গোপন উৎসকে জানবার জন্য গোল্ডমুণ্ড যখন প্রাণপণ চেষ্টা করছে ঠিক তখনই আর একটি মূর্তি ধীরে ধীরে তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। এই মূর্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোনো ত্রুটিই তার মধ্যে নেই। জীবন সংগ্রামের গভীর ক্ষত বুকে নিয়েও এই মূর্তি ধীর স্থির। এ তারই একান্ত প্রিয় বন্ধু নরজিসের মূর্তি। বুদ্ধিদীপ্ত অপূর্ব সুন্দর এই মূর্তিটির প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অদ্ভূত, নিখুঁত আর সুষম। সুন্দর, সংযত দু-টি ঠোঁট, ব্যথা-ভরা মায়াময় দু-টি চোখ, সুগঠিত কাঁধ, লম্বা গ্রীবা, শান্ত, সুঠাম দু-খানি হাত গোল্ডমুণ্ডের মানসপটে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। অপাপবিদ্ধ এই তরুণ সাধকের নির্মল পবিত্র জীবনধারা তার এই মনোময় সৌন্দর্যের মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

একটা স্বপ্নাবেশের মধ্যে তার সমস্ত শিল্পচেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে গোল্ডমুণ্ড তার বন্ধুরই প্রতিকৃতি আঁকতে আরম্ভ করল শেষে। নিকোলাস কত বার তার দিকে তাকালেন সে তার কিছুই জানল না। মনের সকল ভালবাসা আর মাধুরী মিশিয়ে তার প্রিয় বন্ধুর মূর্তি সে আঁকল তাকে অমর করে রাখবে বলে। এক সময়ে নিকোলাস টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে গোল্ডমুণ্ডের হাত থেকে কাগজখানি নিয়ে তুলে ধরলেন চোখের সামনে।

গোল্ডমুণ্ড এবার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে ভীত শঙ্কিত মনে শিল্পীর দিকে তাকিয়ে রইল। মাস্টার নিকোলাস তার আঁকা ছবিটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন…

কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, 'কে এ?'

'আমার বন্ধু, একজন তরুণ সন্ন্যাসী।'

'বেশ, এবার হাত ধুয়ে নাও। চল, খেতে যাই।'

গোল্ডমুণ্ড তাঁর নির্দেশমত হাত ধুয়ে নিল। শিল্পীর মতামত জানবার জন্য তাকে সময় দিতে হবে। মাস্টার নিকোলাস পাশের ঘরে পোশাক বদলে তাকে সঙ্গে করে দোতলায় এলেন। সিঁড়ির অলিন্দে তাঁর গড়া নানা মূর্তির সমারোহ রূপকথার এক অপরূপ স্বপ্নময় রাজ্য গড়ে তুলেছে। তাঁরা একটি ঘরে ঢুকলে একটি তরুণী ছুটে এল। মাস্টার তাকে বললেন, 'লিসবেথ, আর এক প্লেট খাবার নিয়ে এস। ইনি আজ আমাদের অতিথি। এর নাম—কিন্তু নাম তো এখনও বল নি তুমি!'

গোল্ডমুণ্ড নাম বলল।

'গোল্ডমুণ্ড! বেশ। আচ্ছা, লিসবেথ, খাবার তৈরি আছে তো?'

'এই যে এখনই আনছি।' মেয়েটি দৌড়ে চলে গেল। একটু পরেই বুড়ি পরিচারিকার সঙ্গে খাবার নিয়ে ফিরে এল। বাবা খেতে খেতে মেয়ের সঙ্গে গল্প করে চলেছেন। গোল্ডমুণ্ড বিশেষ কিছু খাচ্ছে না। নির্বাক বসে রইল শুধু। নিজেকে সহজ করতে পারছে না কিছুতেই। মেয়েটি দেখতে বেশ সুন্দরী। অভিজাত বংশের মেয়ে, বাবারই মত দীর্ঘ। কিন্তু সে বড়ই নির্বিকার। যেন একটা আয়নার পেছনে বসে আছে। অতিথির সঙ্গে একটিও কথা বলে নি, একবার তার দিকে তাকায়ও নি।

খাওয়া শেষ হলে মাস্টার বললেন, 'এখন আমি আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করব। তুমি একটু ঘুরে এস বাইরে। তারপর আবার কথা হবে।'

গোল্ডমুণ্ড নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। আরও আধঘণ্টা তাকে অপেক্ষা করতে হবে। আঙ্গিনায় ঝরনাধারার পাশে বসে জলের দিকে অপলক তাকিয়ে সে কত কি ভেবে চলেছে। ভাবছে, মৃত্যুভয়ই আমাদের এই মূর্তি গড়ার মূল উৎস। মৃত্যুভয়ই মানুষের প্রতিভাকে শাণিত করে তোলে। আমরা মরতে চাই না, জীবনের অনিত্যতায় চমকে শিউরে উঠি। ফুল ফোটে আবার ঝরে পড়ে মাটির

কোলে। বিষণ্ন মনে তাই দেখি আর ভাবি, এই ঝরা ফুলেরই মত আমরাও একদিন ঝরে যাব পৃথিবীর বুক থেকে। আর তাই আমরা, শিল্পীরা, যখন কিছু সৃষ্টি করি, মূর্তি গড়ে নিজেদের কল্পনাকে রূপদান করি তখন তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে অমর করে রাখতে চাই। আমাদের পরেও আমাদের সৃষ্টি বেঁচে থাকুক, এই একমাত্র কামনা। প্রখ্যাত শিল্পী যাকে কল্পনা করে তাঁর ম্যাডোনা মূর্তি গড়েছেন সে হয়তো মুছে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। শিল্পীও একদিন মরে যাবে। কিন্তু তাঁর এই অপূর্ব সৃষ্টি, তাঁর মানসপ্রতিমা শান্ত দেবালয়ের এক কোণে এমন দাঁড়িয়ে থাকবে আরও কত শত বছর তা কে জানে। আজকের মতই এমন আনন্দ-বেদনা-ভরা সুন্দর প্রতিমাখানি সেদিনও থাকবে অম্লান, অক্ষত।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে গোল্ডমুণ্ড দৌড়ে শিল্পাগারে প্রবেশ করল। মাস্টার নিকোলাস গোল্ডমুণ্ডের আঁকা ছবির উপর মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে দেখে নিয়ে আবার এদিক ওদিক পায়চারি করছেন। কিছুক্ষণ পর জানলার ধারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন, 'আমাদের এখানকার নিয়ম, প্রত্যেক শিক্ষানবিস অন্তত চার বছর কাজ শিখবে আর তার বাবা শিল্পীকে এজন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবে।'

গোল্ডমুণ্ড এক নিমেষে তার থলির বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে সেই স্বর্ণমুদ্রাটি বের করে নিকোলাসের দিকে এগিয়ে ধরতেই প্রথমে তিনি অবাক হয়ে রইলেন, তারপর হেসে বললেন, 'না, ওটা যথাস্থানে রেখে দাও। আমি তোমাকে আমাদের সাধারণ নিয়মের কথাই বলছিলাম। আমি সাধারণ পর্যায়ের ভাস্কর নই বুঝতেই পারছ। আর তুমিও সাধারণ শিক্ষানবিস হতে আস নি নিশ্চয়। তোমার অনেক বয়স হয়েছে। এতদিনে একজন প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর হয়ে ওঠা উচিত ছিল তোমার। তাছাড়া, আমার এখানে কোনো শিক্ষানবিস নেবার নিয়ম নেই।'

গোল্ডমুণ্ড এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। তাঁর কথার কোনো অর্থই খুঁজে পাচ্ছে না সে। তাই ক্ষুণ্নস্বরে বলে উঠল, 'আমাকে কাজে না নিলে এত কথা বলবার প্রয়োজনই বা কি আপনার?'

আগের মত ধীর, গম্ভীরস্বরে বলতে লাগলেন নিকোলাস, 'আমি দীর্ঘ একটি ঘণ্টা তোমার অনুরোধ বিবেচনা করে দেখেছি। এখন আমার কথা

তোমাকে শুনতে হবে ধৈর্য ধরে। আমি তোমার ছবি দেখলাম। সামান্য ত্রুটি থাকলেও ছবিটি সুন্দর হয়েছে। তা না হলে অনেক আগেই তোমাকে বিদায় করে দিতাম। শোন, আমি তোমাকে ভাস্কর হতে, শিল্পী হতে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু ছাত্র হিসেবে, শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করব না। আর কারও ছাত্র বা শিষ্য হয়ে না শিখতে পারলে আমাদের শিল্পীসংঘের কোনোদিনই তুমি শিল্পাচার্য হতে পারবে না, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পদমর্যাদা লাভ করতে পারবে না। তাই শুধুই যদি শিখতে চাও তাহলে নগরের অন্যখানে থেকেও তুমি আমার কাছে কাজ শিখতে পার। এ দিক দিয়ে আমাদের দুজনেরই কোনো দায়-দায়িত্ব থাকবে না। প্রথম দিকে কয়েকটি ছুরি ভেঙ্গে ফেল, কাঠের ব্লক নষ্ট কর, কোনো ক্ষতি নেই তাতে। কিন্তু আমি যদি দেখি তুমি ভাস্কর হতে পারবে না, প্রকৃত শিল্পী হবার মত কোনো যোগ্যতা তোমার মধ্যে নেই, তাহলে তখনই তোমাকে বিদায় নিতে হবে। রাজী আছ আমার প্রস্তাবে?'

গোল্ডমুণ্ড আনত হয়ে তাঁর সব কথা শুনল। তারপর আনন্দে চীৎকার করে উঠল, 'ধন্যবাদ! অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। আমার ঘরবাড়ি নেই, কেউ নেই। বনের মধ্যে বা পথের ধারে যেখানে হক থাকব আমি। আমার জন্য আপনার কোনো দায়িত্বই থাকবে না। আপনার কাছেই শিখব আমি। আর এটাই আমার পরম ভাগ্য বলে মনে করব। আমাকে আপনি যেটুকু দয়া করলেন তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর অজস্র প্রণাম জানাচ্ছি।'

এগার

সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশে গোল্ডমুণ্ডের জীবনের নূতন এক অধ্যায় শুরু হল। এ জীবন তার মনে বিচিত্র এক উন্মাদনা জাগিয়েছে। অন্তরে সে নিঃসীম একাকিত্ব অনুভব করলেও বাইরের দিকে কর্মচঞ্চল ও আনন্দমুখর হয়ে উঠেছে। মাস্টার নিকোলাসের চেষ্টায় বাজারের মধ্যে এক বাড়ির একখানি ঘরে তার থাকবার ব্যবস্থা হল। তারপর শুরু হল তার কাজ শেখা।

গোল্ডমুণ্ড স্বভাবশিল্পী। তার বহুমুখী প্রতিভা শিল্প শিক্ষার সাধনায় তাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। যা কিছু সে দেখে, শোনে বা ভাবে, তাকেই নিখুঁত রূপদান করতে তার এতটুকুও কষ্ট হয় না। শিল্পসৃষ্টির দুঃসাধ্য সাধনা গোল্ডমুণ্ডের কাছে শিশুর খেয়ালখুশিতে ভরা খেলারই মত। গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর সহজাত শিল্পচেতনা তাকে এ জগতের দুর্লভ মহান শিল্পীদেরই একজন করে তুলল। কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষার প্রথম স্তর কাটিয়ে উঠে সে সার্থক শিল্পসৃষ্টির কাজে মগ্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু তার এই আত্মমগ্নতা বেশি দিন একভাবে স্থায়ী হত না। তার মনের অস্থিরতা শিল্পীর ধ্যান ভেঙ্গে দিয়ে প্রায়ই তাকে অলস, অক্ষম করে তুলত। আর তখনই মাস্টার নিকোলাস অধৈর্য হয়ে তাকে তিরস্কারের সুরে বলতেন, 'আমাদের সংঘের নিয়মানুসারে তোমাকে আমার ছাত্র হিসাবে গ্রহণ না করে ভালই করেছি গোল্ডমুণ্ড। তোমার ভবঘুরে জীবন তোমাকে অস্থিরচিত্ত ও অসংযমী করে তুলেছে। একদিন হয়তো এখান থেকে হঠাৎ চলেই যাবে কোথাও। জিপসীর মত পথে পথে জীবন কাটালে শিল্পী হওয়া যায় না, শুধুই মজুরের কাজ করা যায়, বুঝলে? তুমি তোমার খেয়ালখুশি মত কাজ করে চলেছ। এভাবে চললে কেমন করে কাজ শিখবে?'

নিকোলাসের এইসব তিরস্কার গোল্ডমুণ্ড নীরবে শুনে যেত। শিল্পকে অর্থ উপার্জনের উপকরণ হিসাবে সে গ্রহণ করে নি। সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে যখন সে কাজ করে তখন তার শিল্প-সৃষ্টি অপরূপ হয়ে ওঠে; আর সেই সৃষ্টি নিকোলাসকেও বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। কিন্তু ধৈর্য ধরে বেশীদিন এই

সাধনায় সে মগ্ন হয়ে থাকতে পারেনা। তাই মাঝে মাঝে একেবারে অলস-ভাবে, কিছু না করেই সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দেয়। গোল্ডমুণ্ড নিজেও এজন্য অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবে কেন সে নিকোলাসের মত কঠোর পরিশ্রম করতে পারে না? শিল্পসাধনায় মগ্ন থেকে কেনই বা অন্য সব নিঃশেষে ভুলে যেতে পারে না? পথের জীবনই কি তাকে এমন অলস, মন্থর করে তুলেছে? তার এই কর্মকুণ্ঠা তাকে ভাবিয়ে তুললেও সে তার কোন প্রতিকার করতে পারে না। তার মায়ের অস্থির প্রকৃতিই কি তাকে প্রভাবিত করছে? কিসের অভাব তার মধ্যে কিছুই সে বুঝতে পারে না।

মেরিয়াব্রোন মঠে তার জীবনের প্রথম কয়েকটি বছরের স্মৃতি তার মনে জাগে। তখন তো সে এতটুকুও কর্মবিমুখ ছিল না। অত্যন্ত উৎসাহী এবং পরিশ্রমী ছাত্র ছিল। নিজেকে বিশ্লেষণ করে গোল্ডমুণ্ড সব বিষয়ে তার ওখানকার সেই আগ্রহশীলতার কারণও খুঁজে পেল। নরজিসের মন জয় করবার জন্যই সে তখন দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে জ্ঞানের সাধনায় এগিয়ে গিয়েছিল। নরজিস খুশি হলে, মৃদু হেসে তাকে প্রশংসা করলে নিজেকে ধন্য, কৃতার্থ মনে করত। তার সকল পরিশ্রমের সেটাই ছিল সবচেয়ে সেরা পুরস্কার। নরজিস তার বন্ধু। নরজিসই প্রথম তার মনের মধ্যে তার মায়ের সুপ্ত অস্তিত্বকে জাগিয়ে তুলেছিল। ভুলে-যাওয়া মাকে আবার তার জীবনে ফিরিয়ে দিয়েছিল। মাকে আপন অন্তরে উপলব্ধি করার পর থেকেই তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। বিদ্যার পথ, জ্ঞানের পথ ছেড়ে, মঠের জীবন পরিত্যাগ করে পথের অসংযত, রুক্ষ জীবনকেই সে বরণ করে নিল। তার আদিম প্রবৃত্তি আর সহজাত অনুভূতিগুলি জেগে উঠে তাকে অশান্ত চঞ্চল করে তুলল। কারো উপর নির্ভর করতে ভাল লাগল না, কিছু না করে শুধু দুচোখ ভরে জীবন ও পৃথিবীকে দেখতে দেখতে পথ চলতে লাগল সে। তারপর মাস্টার নিকোলাসের অপূর্ব সৃষ্টি সেই বিষাদময়ী কুমারী প্রতিমাকে দেখামাত্রই সে চমকে উপলব্ধি করল তার নিজের মধ্যেও এক শিল্পী আত্মগোপন করে আছে। এমন সার্থক, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যপ্রতিমার স্রষ্টা সেও হতে চায়। তার জীবনের সেটাই একমাত্র স্বপ্ন ও সাধনা। কিন্তু তার বিষণ্ন অস্থির মনের ব্যাকুলতা কোথায় তাকে নিয়ে চলেছে কে জানে! শেষ পর্যন্ত তার জীবনের পরিণতি কি হবে তাই সে জানে না। মাঝে মাঝে নিজেই নিজের কাছে বড় দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে

গোল্ডমুণ্ড। তবে একটা সত্য স্পষ্ট অনুভব করল,—মাস্টার নিকোলাসের প্রতিভাকে, শিল্পচাতুর্যকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করলেও তাঁর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা সে অনুভব করতে পারছে না। নরজিসকে সে যেমন ভালবেসেছে, নিকোলাসকে তেমন ভালবাসতে পারে নি। এই মহান শিল্পীর বাইরের জীবনে যে মানুষটিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার রূপ একেবারেই ভিন্ন। বাস্তবের মানুষ নিকোলাস পরিবারের অভিভাবক, কর্তব্যপরায়ণ পিতা, শিল্পসংস্থার শিল্পাচার্য আর একজন বিশিষ্ট নাগরিক। স্বভাবশিল্পীর একান্ত তন্ময়তা আর আত্মবিস্মৃতি নিয়ে শুধুই শিল্পের সাধনায় মগ্ন হয়ে নেই। বাস্তব জীবনের বহুমুখী দাবি আর প্রয়োজন মেটাবার জন্য অতি সাধারণ, স্থূল জীবনই যাপন করছেন তিনি।

দীর্ঘ একটি বছর নিকোলাসের কাছে কাজ করবার পর গোল্ডমুণ্ড তাঁকে পরিপূর্ণভাবে জানতে পারল। তাঁর প্রতি ভালবাসা আর ঘৃণামিশ্রিত বিচিত্র এক আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল গোল্ডমুণ্ড। নিকোলাসের জীবনধারার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি রেখে গোল্ডমুণ্ড লক্ষ্য করল তাঁর শিল্পাগারে কোনো শিক্ষানবিস ছাত্র নেই। আপন শিল্পরীতি শিক্ষা দিয়ে তিনি কাউকেই সুদক্ষ করতে চান না। শিল্পাগারের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে তিনি খুব কমই যান। আর নিজের বাড়িতে তাঁর মাতৃহারা একমাত্র কন্যাকে যক্ষের ধনের মত সর্বদা আগলে রাখেন। লিসবেথকে বাইরের কারো সঙ্গে তিনি মিশতেও দেন না। বিপত্নীক শূন্য জীবনের অবদমিত কামনাবাসনার বিকৃতি তাঁকে কেমন কঠোর, গম্ভীর আর সংকীর্ণমনা করে তুলেছে। নিকোলাসের মত তাঁর মেয়ে লিসবেথও গোল্ডমুণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কাজের অবসরে অনেক সময়েই সে এই বিচিত্র চরিত্রের মেয়েটির কথা ভাবে। লিসবেথকে খুব অল্পই দেখতে পায় গোল্ডমুণ্ড। প্রথম দিনই সে বুঝেছিল এই মেয়েটি অন্য দশজন সাধারণ মেয়ের মত নয়। তার আভিজাত্যপূর্ণ সৌন্দর্য এবং অদ্ভুত গাম্ভীর্য তাকে ঘিরে কেমন একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে। তার পবিত্র, কোমল দেহ-সৌন্দর্যের মধ্যে অনাঘ্রাত যৌবনকে উপলব্ধি করতে পারলেও গোল্ডমুণ্ড বুঝল মেয়েটির মধ্যে বয়সোচিত সহজ সরলতার বড় অভাব রয়েছে। সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে নির্লিপ্ত, শান্ত অথচ কেমন একটা গর্বিত ভঙ্গিতে নীরবে তার কাজ করে যাচ্ছে। লিসবেথের কথা ভাবতে ভাবতে গোল্ডমুণ্ডের একদিন ইচ্ছা হল লিসবেথের প্রতিকৃতি সে কাঠের বুকে

অক্ষয় করে রাখবে। এই প্রাণহীন প্রতিমার মধ্যে সে প্রাণ সঞ্চার করবে, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দন ফুটিয়ে তুলবে। আশা-আনন্দে, কামনা-বাসনায় গোল্ডমুণ্ডের কল্পনার লিসবেথ অপূর্ব প্রাণময়ী হয়ে উঠবে তারই শিল্প-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

লিসবেথের কথা ভাবতে ভাবতে সহসা তার মানসপটে আর একটি মূর্তি ধীরে ধীরে ভেসে উঠতে লাগল। সে উপলব্ধি করল এ মূর্তি তারই একান্ত প্রিয় মায়ের মূর্তি, এই মূর্তিটিকে কাঠের বুকে চিরকালের মত অক্ষয় করে রাখবার বাসনা তার অনেক দিনের। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে আবার তখনই তা মিলিয়ে যায়। তাকে বিভ্রান্ত করে দিয়ে কোথায় পালিয়ে যায় যেন। বিচিত্র এই মূর্তি পলকে কি এক রহস্যের আবরণে তার মুখ ঢেকে গোল্ডমুণ্ডকে বিস্ময় বিহ্বল করে তোলে। বহু বছর আগে যে মা তার চোখের সামনে ছিল, আজকের প্রতিমূর্তির সঙ্গে তার কোনো মিল না থাকলেও গোল্ডমুণ্ড জানে এ তার মায়েরই আর-এক রূপ। তার বিক্ষুব্ধ ভবঘুরে জীবনে প্রতিমুহূর্তের আনন্দ বেদনায়, সুখে দুঃখে শতবার শতরূপে এই মাকেই দেখেছে সে। নিকোলাসের বিষাদময়ী দেবী প্রতিমার মত সার্থক, অনবদ্য শিল্প-সৃষ্টির দক্ষতা এ জীবনে যদি তার কোনো দিন হয় তাহলে সে এই মাতৃমূর্তিরই রূপদান করবে। তার মা এখন আর তার একলার মা নয়, এই বিশ্বচরাচরের মা। বিশ্বের প্রাণ-স্বরূপিনী এই মাতৃমূর্তিকে গোল্ডমুণ্ড তার চারদিকে পরিব্যাপ্ত দেখছে। জিপসী মেয়ে লিসা আর লিডিয়ার সত্তাও যেন এই অনন্ত মাতৃসত্তায় এক হয়ে মিশে গেছে। শুধু এরাই নয়, জীবনে যত নারীর সংস্পর্শে সে এসেছে তারা সবাই যেন তার মায়েরই অংশ, মায়েরই অন্য রূপ মাত্র। তার সমস্ত শিল্প চাতুর্য দিয়ে যে দিন সে এই বিচিত্ররূপিণী মাতৃমূর্তিকে রূপদান করতে পারবে সেদিন তার নির্দিষ্ট কোন্ রূপ জগৎ দেখবে, আজও সে তা বলতে পারে না। সে শুধু এটুকুই জানে, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবন ও মৃত্যুর পূর্ণ প্রতীক হবে সেই অপরূপ মাতৃমূর্তি। মানুষের জীবনের সামগ্রিক রূপই ধরা দেবে সেই চির রহস্যময়ী দেবী প্রতিমায়।

এক বছরের মধ্যে গোল্ডমুণ্ড তার শিল্পসাধনায় অনেক দূর এগিয়ে গেল। কাঠের বুকে খোদাই-এর কাজকরা ছাড়াও নিকোলাস তাকে মাটির মূর্তি গড়তে দিলেন। তার প্রথম মৃন্ময় মূর্তি জুলিয়ার। অপূর্ব এই মূর্তিখানি

নিকোলাসকেও মুগ্ধ করল। জুলিয়ার মৃন্ময় প্রতিমা গড়বার পর গোল্ডমুণ্ড কাঠের বুকে তার প্রিয় বন্ধু নরজিসকে অক্ষয় করে রাখবার দুঃসাধ্য সাধনায় ব্রতী হল। নরজিসের মূর্তিকে খ্রীস্টের পরম ভক্ত 'সেণ্ট জনের' মূর্তিতে রূপান্তরিত করবার জন্য গোল্ডমুণ্ড দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগল। তার 'সেণ্ট জনের' মূর্তি সার্থক শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠলে তাকে ক্রুশবিদ্ধ যীশু খ্রীস্টের মূর্তি গড়তে দেওয়া হবে।

নরজিসের প্রতি তার অফুরন্ত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তাকে এই কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। শিল্পীর অন্তরের সমস্ত আকুলতা উজাড় করে দিয়ে দুটি নিপুণ হাতের শিল্পচাতুর্যের অলৌকিক ইন্দ্রজাল তার সৃষ্টিকে প্রাণময় করে তুলতে লাগল। নরজিস এখন আর তার কাছ থেকে দূরে নেই। নিজের অন্তরে সে তাকে সর্বক্ষণ উপলব্ধি করছে। অপাপবিদ্ধ সেই তরুণ সাধকের পায়ের কাছে বসে শিল্পী তারই ধ্যানমগ্ন হয়ে জগতের কাছে তাকে মূর্ত করে তুলছে। গোল্ডমুণ্ডের শিল্পসত্তা এই সৃষ্টির অপূর্ব আনন্দের মধ্যেই কী এক গভীর বেদনায় বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার মনে হল জগতের প্রতিটি সার্থক শিল্পসৃষ্টি এই চরম বেদনার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে। নিকোলাসের সেই অবিস্মরণীয় বিষাদময়ী দেবীপ্রতিমা এবং অন্যান্য সার্থক শিল্পসৃষ্টিগুলিও এভাবেই জন্ম নিয়েছে। শিল্পীর মনের আনন্দ-বেদনার অমৃত-গরল মন্থন করেই তারা একদিন জন্ম নেয় আর জগতকে বিস্ময়বিমূঢ় করে তোলে। তার কল্পনার সেই মাতৃরূপকে কোনো দিনই কি সে মূর্ত করে তুলতে পারবে এই বিশ্বের সম্মুখে? জীবনের পূর্ণ প্রতীক, বিচিত্ররূপিণী এই মাতৃ-মূর্তিকে শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে অক্ষয়, অমর করে রাখতে পারবে কি কোনো শিল্পী? কোনো চেষ্টা, কোনো অনুশীলন দ্বারা তো শিল্পীর আত্মার কল্পনাকে মূর্ত করে তোলা যায় না। শিল্পীর সীমাবদ্ধ শক্তি দিয়ে, নৈপুণ্য দিয়ে যে শিল্পকলার সৃষ্টি হয় তাতে তার প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে না কোনো দিন। সেই অসাধ্য সাধন করবার মত শিল্পী আজও বুঝি জন্মে নি।

গোল্ডমুণ্ডের এই বিচিত্র আত্মোপলব্ধি আবার তাকে মর্মাহত করে তুলল। সে ভাবল, ভাস্কর হয়ে, শিল্পী হয়ে তাহলে কি লাভ হবে? কেন সে এই দুর্গম সাধনার পথে চলেছে? শিল্পসাধনার ফাঁকে ফাঁকে এই সকল ভাবনা গোল্ডমুণ্ডের মনকে অধিকার করলে সে তার মায়ের প্রকৃতিকেই

অনুভব করত নিজের মধ্যে। মায়ের সেই ছন্নছাড়া চঞ্চল প্রকৃতি যেন তাকেও ঘরছাড়া পলাতক হতে প্ররোচিত করছে।

নিকোলাসও তার এই চঞ্চল প্রকৃতির জন্য মনে মনে বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। গোল্ডমুণ্ডের ভবঘুরে জীবনের অনেক কাহিনীই তিনি জানতে পেরেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেত। কিন্তু গোল্ডমুণ্ডের ভেতরে যে অনন্যসাধারণ শিল্পসত্তার পরিচয় তিনি পেয়েছেন, তারই জন্য তিনি তার সমস্ত খেয়ালীপনা নীরবে সহ্য করছেন। 'সেণ্ট জনের' প্রথম নক্সা দেখেই তিনি বুঝেছেন গোল্ডমুণ্ড কত বড় শিল্পী। অজ্ঞাত অখ্যাত, ভবঘুরে এই যুবকটির মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদেরই একজন আত্মগোপন করে আছে, এই সত্য তাঁর বুঝতে বাকি নেই। অস্থিরমতি, ভবঘুরে গোল্ডমুণ্ডের উপর তিনি যতই রাগ করুন শিল্পী গোল্ডমুণ্ডের প্রতি তাঁর বিচিত্র এক আত্মিক আকর্ষণ গড়ে উঠেছে দিনে দিনে।

গোল্ডমুণ্ড বুঝতে পারে তার জীবনের পথ তাকে তার মায়ের কাছেই নিয়ে চলেছে। মায়ের প্রভাবই তার জীবনকে চালনা করছে। তাই তার অদম্য জীবনতৃষা ক্রমাগত তার অতৃপ্ত আত্মাকে মৃত্যুর দিকে, পাপের দিকে নিয়ে চলে। জ্ঞানের পথ, সাধকের পথ তার জন্য নয়, এ কথা বহু আগে নরজিসই তাকে বলেছিল। এ কথা গোল্ডমুণ্ডের মনে পড়তেই তার সেই সত্যদ্রষ্টা, সাধক বন্ধুর জন্য মন কেঁদে উঠল। নিজের সঙ্গে তুলনা করে নরজিসের সত্য রূপ আরও অনেক বেশি সার্থক করে সে ফুটিয়ে তুলতে পারল।

সুদীর্ঘ তিনটি বছর সে অক্লান্ত শিল্পসাধনায় মগ্ন হয়ে রইল। এজন্য তাকে মূল্যও দিতে হল কম নয়। আনন্দবেদনা, সুখদুঃখ, নিঃসঙ্গতা, অবাধ স্বাধীনতা—সমস্ত কিছুই ভুলে যেতে হয়েছে তাকে। গোল্ডমুণ্ড এবার অস্থির হয়ে উঠেছে। তার ভেতরকার চঞ্চল, পলাতক শিশু আবার বিদ্রোহ করছে। এমন বাঁধাধরা জীবন আর সে সহ্য করতে পারছে না। শিল্পের উপরেই সে বিরূপ হয়ে উঠল এবার। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এই শিল্পের দাবি মেটাতেই তার সমস্ত শক্তি সমস্ত অনুভূতি নিঃশেষিত হয়ে যাবে। তার সমস্ত উজাড় করে দিয়েও বুঝি সেই রহস্যময়ীকে ধরতে পারবে না সে কোনো দিন। অব্যক্ত ক্রোধ আর অস্থিরতা তাকে উন্মাদপ্রায় করে তুলল।

কিন্তু 'সেণ্ট জনে'র মূর্তি গড়ার সময় তার মন অপূর্ব এক প্রশান্তিতে ভরে থাকে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সে এই সৃষ্টি করে চলেছে।

এক সুন্দর প্রভাতের শুভ মুহূর্তে গোল্ডমুণ্ড দেখল তার 'সেণ্ট জন' শিল্পীর কল্পনা থেকে নূতন করে জন্ম নিয়েছে। তার মূর্তির সামনে গোল্ডমুণ্ড অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল এই অপূর্ব শিল্পসৃষ্টির স্রষ্টা কি সে নিজে? আপন সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে গোল্ডমুণ্ড তার প্রথম আবেগ কাটিয়ে উঠে সহসা আর একটি উপলব্ধিতে চমকে উঠল। তার এই অপূর্ব সৃষ্টি হয়তো চিরন্তন হয়ে থাকবে। কিন্তু তার স্রষ্টা এই পৃথিবীর বুক থেকে ঝরে যাবে একদিন। অন্তরের সমস্ত আকুলতা আর বেদনা দিয়ে সৃষ্টি করে শিল্পী এখন সর্বহারা হয়েছে। স্রষ্টার অন্তর থেকে জন্ম নিয়ে তার সৃষ্টি এখন আর স্রষ্টার কেউ নয়। এখন শিল্পী শূন্য হাতে, রিক্ত মনে দাঁড়িয়ে।

গোল্ডমুণ্ড বেদনাহত মনে অনুভব করল, এবার তার বিদায়ের লগ্ন এসেছে। 'সেণ্ট জন' আর মাস্টার নিকোলাস. দুজনের কাছ থেকেই তাকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে দূরে, অনেক দূরে—তার শিল্পীজীবনকে, জীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়কে এখানে ফেলে রেখে। এখানে আর কিছু করবার নেই তার। শিল্পীর সমস্ত সম্পদ রিক্ত হয়ে উজাড় করে দিয়েই সে তার সৃষ্টিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে, তাই এখন আর কোনো মূর্তি সে গড়তে পারবে না। তার মায়ের প্রতিমূর্তি গড়বার শুভ লগ্নও কোনো দিন আসবে কি-না সে জানে না।

অনেক কষ্টে 'সেণ্ট জনের' কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গোল্ডমুণ্ড নিকোলাসের শিল্পাগারে প্রবেশ করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। নিকোলাস তাকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'কি হয়েছে গোল্ডমুণ্ড? কি চাও?'

'আমার সেণ্ট জন শেষ হয়েছে। আপনি তাকে দেখবেন তো?'

'নিশ্চয়ই। এখনই যাচ্ছি, চল।'

দুজনে একত্রে সেখানে গেল। নিকোলাস অনেকদিন 'সেণ্ট জনের' প্রতিমূর্তিটি দেখেননি। শিল্পীকে একমনে একলা কাজ করবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি। এখন সেণ্ট জনের দিকে তাকিয়ে তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর কঠিন, রুক্ষ মুখখানি ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। গোল্ডমুণ্ড লক্ষ্য করল তাঁর নীল চোখের গভীরে বিস্ময়ের আভাস ফুটে উঠেছে। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, 'সুন্দর! অপূর্ব! গোল্ডমুণ্ড, শিল্প-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছ তুমি, তোমার এই মূর্তি আমি শিল্পসংস্থায়

দেখাব, তোমাকে শিল্পাচার্যের সনন্দ দিতে, সত্যিকারের শিল্পীর স্বীকৃতি দিতে বলব তাদের।'

শিল্পসংস্থার সনন্দের জন্য তার এতটুকুও মোহ নেই। কিন্তু নিকোলাসের এই প্রশংসাবাণী তাকে গভীর আনন্দ ও পরিতৃপ্তিতে ভরিয়ে তুলল। নিকোলাস মূর্তির চারপাশ থেকে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে নিরীক্ষণ করছেন। একটু পরে তিনি বললেন, 'নিবিড় প্রশান্তি আর অসীম স্থৈর্যের প্রতীক এই মূর্তিখানিতে আনন্দবেদনার অপূর্ব সংমিশ্রণ হয়েছে। বিষাদ ভরা শান্ত, ক্ষমাসুন্দর এ মুখখানিতে অব্যক্ত, বিচিত্র এক স্বর্গীয় আনন্দও মূর্ত হয়ে উঠেছে। এমন অপরূপ, অনবদ্য সৃষ্টির স্রষ্টাও বুঝি পরম শান্তি ও আনন্দের সন্ধান পেয়েছে জীবনে।'

গোল্ডমুণ্ড মৃদু হেসে বলল, 'আমার পরম বন্ধু নরজিসকেই সেন্ট জনের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করেছি। আপনি যে প্রশান্তি ও আনন্দের কথা বলছেন, নরজিসই তার স্রষ্টা, আমি নই। আমার আত্মার নিভৃত মন্দিরে এই মহিমাময়, জ্যোতির্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে সেই নবীন তপস্বী নরজিসই। আমার নিজের কোনই ভূমিকা নেই এতে।'

নিকোলাস বললেন, 'তা হতে পারে। এমন সার্থক সৃষ্টির জন্ম সত্যিই রহস্যাবৃত। তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই আমার অনেক শিল্পসৃষ্টিই তোমার এই অপূর্ব সৃষ্টির তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। তাদের মধ্যে শিল্পচাতুর্যের অভাব না থাকলেও প্রাণের আকুতি, আত্মার তন্ময়তা এমন উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে নি। তুমিও বুঝতে পারছ গোল্ডমুণ্ড, তোমার সেন্ট জন একবারই সৃষ্টি হতে পারে। বার বার এমন সৃষ্টি কোনো শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব নয়।'

গোল্ডমুণ্ড বলল, 'হাঁ, মূর্তি গড়া শেষ হলে তার দিকে তাকিয়ে আমি নিজেকেই নিজে বলেছি : এ জীবনে আর এমনটি সৃষ্টি করতে পারব না। আর সেকারণেই আমি আর এখানে থাকতে চাই না। আবার পথের জীবনকেই বরণ করে নিতে চাই।'

নিকোলাস গম্ভীর হয়ে কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন এবার। তাঁর দৃষ্টিতে বিস্ময় ঝরে পড়ল।

গম্ভীরস্বরে বললেন, 'পরে এসব কথা আলোচনা করব আমরা। আজ তোমার ছুটি। আমার এখানে তোমাকে খাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

গোল্ডমুণ্ড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এল। লিসবেথও আজ খাবার টেবিলে বসেছে। মাস্টার নিকোলাস একটি চামড়ার কারুকার্যময় সুন্দর থলিতে দুটি স্বর্ণমুদ্রা গোল্ডমুণ্ডকে উপহার দিলেন। আজ আর সে নীরব রইল না। অনেক কথা বলল। নিকোলাসও মুখর হয়ে উঠেছেন। গোল্ডমুণ্ড কথার ফাঁকে ফাঁকে লিসবেথকে দেখছে, তার আভিজাত্যপূর্ণ গর্বিত, প্রাণহীন সৌন্দর্যকে দুচোখ ভরে দেখছে আর মনে মনে ভাবছে, এই পাষাণ প্রতিমার মধ্যে যদি প্রাণসঞ্চার করা যেত! খাওয়া শেষ হয়ে গেলেই সে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। কি করবে ভেবে না পেয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াল। মাস্টার নিকোলাস তাকে সম্মান দিয়েছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন, তবুও কেন তার মন আনন্দে আর তৃপ্তিতে ভরে ওঠে না?

হঠাৎ তার কি খেয়াল হতেই, সে প্রথমে মাস্টার নিকোলাসের নাম যেখানে শুনেছিল সেই মঠের দিকে রওনা হল। দু-তিন বছরের ব্যবধানকে মনে হল যুগযুগান্তের ব্যবধান। গোল্ডমুণ্ড সেখানে গিয়ে আবার সেই বিষাদময়া অপরূপ দেবীপ্রতিমার সামনে দাঁড়াতেই তার অতুলনীয় সৌন্দর্যে সম্মোহিত হয়ে পড়ল। তার 'সেণ্ট জনের' চাইতেও যেন এই সৃষ্টি অনেক বেশি সার্থক। জীবনজিজ্ঞাসার গভীরতায় অনন্য এই সৃষ্টি তার বিষণ্ণ, অতৃপ্ত মনে শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। এই দুঃসাধ্য কঠোর শিল্পসাধনার শেষ নেই, জীবনভরই শিল্পীকে শিল্পের আরাধনা করতে হয়। সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে, সর্বস্ব পণ করে তবে সে পরম পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।

সেদিন গভীর রাত্রে ক্লান্ত গোল্ডমুণ্ড ঘরে ফিরে এসে তার অবসন্ন দেহ বিছানায় এলিয়ে দিলে, কতনা অসংলগ্ন ভাবনা তার মনকে ছেয়ে ফেলল।

বার

পরদিন গোল্ডমুণ্ড কাজে মন বসাতে পারল না। পথে পথে ঘুরে সময় কাটাল। কোলাহলপূর্ণ নগরজীবনের তীব্র উন্মাদনায় গোল্ডমুণ্ড মাঝে মাঝে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এখানে একে অন্যকে হিংসা করে, নিন্দা করে, আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত থাকে। এরা এতই আত্মকেন্দ্রিক যে আপন সুখসুবিধা ও আরাম ছাড়া আর কিছুই জানে না। মোহময়ী নগরীর ক্ষণিক প্রলোভনে কিছুকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকলেও গোল্ডমুণ্ড মাঝে মাঝেই তার আপন সত্তায় জেগে ওঠে ; বিষণ্ণ, অশান্ত মন তার প্রশ্নাকুল হয়ে ওঠে, সহস্র জনের মাঝেও নিজেকে একান্ত একলা, নিঃস্ব মনে হয় তার। আবার কখনও অতর্কিতে বিচিত্র এক আনন্দবোধ, এক ঝলক হাসি তার মনের সেই মেঘ দূর করে দেয়। তখন আবার তার হাসতে, ভালবাসতে, আঁকতে, মূর্তি গড়তে, গান গাইতে সাধ হয়। ফুলের সুবাস বুক ভরে নিয়ে ছোট্ট ছেলের মত খেলতে, নাচতে ইচ্ছা হয়।

পথের বন্ধু ভিক্টরের কথাও তার এলোমেলো ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ে। দুঃসাহসী, হাসিখুশি সেই ভবঘুরে মানুষটি কোথায় গেল? তার আততায়ী মনে শুধুমাত্র একটুকু স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছে সে। কিছুদিন পরে তাও হয়ত আর অবশিষ্ট থাকবে না। আবার সহসা কখনো গোল্ডমুণ্ডের চোখের সামনে একটি মূর্তি ভেসে ওঠে এই বিচিত্ররূপিণী রহস্যময়ী দেবীপ্রতিমা তার একান্ত প্রিয় মা, সমগ্র বিশ্বের জননী ; মানবজীবনের একমাত্র উৎস, প্রাণকেন্দ্র। তার বিচিত্র হাসি, স্নিগ্ধ চাঁদের আলোর মতই যেন এই পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে রয়েছে।

গোল্ডমুণ্ড আবার নূতন করে অনুভব করল তার এই নগরজীবনের পালা এবার শেষ করে দেবার সময় এসেছে। আর নয়, প্রলোভন-ভরা নগর-জীবনের এই কৃত্রিম পরিবেশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার মুক্ত বিহঙ্গের মত পথে বেরিয়ে পড়তে হবে। তার মায়ের ডাক আবার সে শুনতে পেয়েছে।

একদিন দুপুরবেলা গোল্ডমুণ্ড মাস্টার নিকোলাসের কাছে গিয়ে বলল, 'আপনাকে কিছু বলতে চাই আমি, কারণ অপরূপ সুধাময়ী দেবীপ্রতিমার

স্রষ্টা শিল্পী নিকোলাস ছাড়া আর কেউ আমার প্রাণের কথা বুঝবে না। তাঁর আদর্শ আমারও জীবনের একমাত্র আদর্শ। আমি 'সেণ্ট জন'কে আমার প্রাণের সকল আকুলতা ঢেলে সৃষ্টি করেছি। হয়তো আমার শিল্পগুরুর সেই মহিমময়ী সৃষ্টির মত তা সার্থক হয়নি। তবুও আমার সৃষ্টি তার নিজস্ব ধারায়, আপন বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে আছে। এখন যেন আর কিছুই করবার নেই আমার। আমার অন্তরের সুপ্ত আর একটি অপূর্ব পরিকল্পনাকে রূপদান করতে চাইলেও আজ এই মুহূর্তে আমি তা করতে পারছি না। আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। কোনো সার্থক সৃষ্টির কাজ না করে শুধু সাধারণ শিল্পকলার তুচ্ছ কাজ করে আমি এখানে সময় কাটাতে চাই না মাস্টার, তা আমি পারব না। পথ আবার আমায় ডাক দিয়েছে। আনন্দ-বেদনা ভরা এই পৃথিবীতে স্বাধীন মুক্ত জীবনকে আবার বরণ করে নেব আমি। এখানে যে সুখ, আনন্দ, আরাম ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছি তার সমস্ত কিছুই নিঃশেষে ভুলে যেতে চাই।'

নিকোলাস তাঁর প্রখর দৃষ্টি গোল্ডমুণ্ডের দিকে তুলে ধরলেন। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমার কথা শুনলাম গোল্ডমুণ্ড। সবই আমি বুঝতে পেরেছি। আমার শিল্পাগারে অনেক কিছু করার থাকলেও তোমাকে আমি আর সেখানে কাজ করতে বলব না। বুঝতে পারছি মুক্ত জীবনের জন্য তোমার মন হাঁপিয়ে উঠেছে। আর কয়েকটি দিন অপেক্ষা কর। আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, আমার অভিজ্ঞতাও অনেক বেশি। জীবনকে তোমার চেয়ে অনেক বেশি দেখেছি, বুঝেছি। তোমার চিন্তাধারার সঙ্গে আমার তেমন মিল না থাকলেও তোমার সব কথাই আমি বুঝতে পারছি। তোমাকে কয়েক দিন পর ডেকে পাঠাব। আর তোমার ভবিষ্যৎ জীবনসম্বন্ধে আমার পরিকল্পনা তখনই তোমাকে শোনাব। ততদিন ধৈর্য ধরে থাক, অন্তরের সমস্ত আকুলতা ঢেলে কোনো কিছু সৃষ্টি করার পর শিল্পীর মনে এমনই রিক্ততার, শূন্যতার অনুভূতি জাগে। কিন্তু বিশ্বাস কর, এই অনুভূতিও ক্ষণস্থায়ী।'

গোল্ডমুণ্ড বিদায় নিয়ে চলে গেল। কিন্তু মন তার অতৃপ্তই রয়ে গেল। নিকোলাস তার মঙ্গলের জন্যই হয়তো এত কথা বলেছেন, কিন্তু এসব এখন আর সে মেনে নিতে পারবে না। আনমনে পথ চলতে চলতে সে নদীতীরে পৌঁছে বাঁধানো প্রাচীরের উপর বসে স্রোতের দিকে তাকিয়ে রইল।

স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, নদীর গভীর বুকে যেন এক রহস্যপুরীর সন্ধান পায় সে। আর তখনই তার মনে হয় মানুষের মনের কল্পনা আর স্মৃতি চিত্রগুলি গভীর জলের এই রহস্যের মতই। এদের নির্দিষ্ট আকৃতি নেই, সুস্পষ্ট কোনো রূপ নেই, তবুও কত অর্থ রয়েছে। নদীর নীল জলের আলো-আঁধারিতে আচমকা কোনো স্বর্ণদ্যুতি উছলে উঠে যেমন তখনই আবার মিলিয়ে যায় ঠিক তেমনই কোনো একটি মুখের রেখা শিল্পীর মনে ভেসে উঠে জীবনের পরম সৌন্দর্য আর গভীর দুঃখের ইঙ্গিত দিয়ে আবার কোথায় বিলীন হয়ে যায়। কবির কল্পনা, শিল্পীর সাধনা, সবই ঐ স্ফটিক জলের-ই মত বিচিত্র আর রহস্যময়।

গোল্ডমুণ্ড আপন মনে ভাবতে লাগল: আমি এই রহস্যকে, এই অস্পষ্টতাকেই ভালবাসি। তারই পিছনে জীবনভর ছুটে চলেছি। শিল্পী হিসাবে আমি তাকে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টাও করেছি কত বার। একদিন আমার সেই সাধনা হয়তো সিদ্ধিলাভ করবে। সে দিন আমার সৃষ্টি, বিচিত্ররূপিণী চিররহস্যময়ী সেই নারীমূর্তি সমস্ত বিশ্বের প্রাণস্বরূপিণী হয়েই আত্মপ্রকাশ করবে। বাস্তব পরিবেশের কথা আবার মনে পড়ল তার। আর একবার জীবনের চরম সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে সে। এখান থেকে ফিরে যাবার আর উপায় নেই। বহু বছর আগে এক রাত্রে মঠের জীবন থেকে পালিয়ে, নরজিসকে বিদায় জানিয়ে পথে বেরিয়েছিল সে তার নূতন জীবনকে খুঁজে নেবে বলে। আজও তাই ঘটেছে। তার মা তাকে ডাক দিয়েছে। মাকে অনুসরণ করেই আবার তাকে পথে বেরিয়ে পড়তে হবে। এই তার জীবন। হয়তো তার বিচিত্র-স্বপ্নদর্শনকে কোনো দিনই মূর্ত করে তুলতে পারবে না সে। শেষ পর্যন্ত তা চির-রহস্যময়, একান্ত গোপন সম্পদের মতই থেকে যাবে তার জীবনে। তবুও এই মা-ই তার প্রাণকেন্দ্র, তার সত্তা, তার একমাত্র সান্ত্বনা ও শান্তি। তার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করবে গোল্ডমুণ্ড।

মানুষের জীবনে শিল্পকলা বড় জিনিস সন্দেহ নেই। কিন্তু তা কখনো মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাই শিল্পকে সে ছাড়তে পারে, কিন্তু মাকে ছাড়তে পারে না। মায়ের ডাকে সাড়া দিতেই হবে তাকে। শিল্পী হিসাবে বড় হয়ে তার কি লাভ হবে? শিল্প মানুষকে কতটুকু দিতে পারে, নিকোলাসের জীবনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যশ,

প্রতিপত্তি, অর্থ, আরাম, এই হবে শিল্প সাধনার পুরস্কার। নিশ্চিন্ত আরামের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবনের সেই অভিশাপ সে বরণ করে নিতে পারবে না।

নগরীর সম্ভাবনাময় জীবন তাকে সেদিন হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। তার 'সেণ্ট জন' সৃষ্টি করার সময়েও এখানকার জীবনটা এত অসহ্য মনে হয় নি, এমনি করে বিবর্ণ, অর্থহীন হয়ে পড়েনি। কিন্তু এখন তার মনের সেই আশা, আনন্দ, মোহ—সবই নিঃশেষে ঝরে গেছে ঝরা ফুলের মত। বিচিত্র এক অনিত্যতার ভাব তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আবার সে এক পলকের জন্য মায়ের অপরূপ মূর্তিখানিকে চোখের সামনে দেখল। বিশ্বব্যাপিনী এই প্রলয়ঙ্করী প্রতিমার রাশিকৃত চুলের অরণ্যে গ্রহ, তারা, চন্দ্র, সূর্য গ্রথিত হয়ে আছে আর এই মহামানবী এক একটি জীবনকে এক একটি ফুলের মতই পৃথিবীর বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে অনায়াস অবহেলায় মহাশূন্যে ফেলে দিচ্ছে।

গোল্ডমুণ্ড যখন উদ্দেশ্যহীনভাবে নদীতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক তখনই মাস্টার নিকোলাস ভবঘুরে, ছন্নছাড়া এই শিল্পীকে চিরকালের মত বেঁধে রাখবার নানা পরিকল্পনা করছেন। শিল্পসংস্থা থেকে গোল্ডমুণ্ড যাতে স্বীকৃতি পায় সেজন্য তিনি শিল্পাচার্যের উপর তার নিজের সমস্ত প্রভাব নিয়োগ করবেন ঠিক করলেন। তাছাড়া তাঁর সমকক্ষ সহকর্মী শিল্পী হিসাবে তাকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে পরামর্শ, আলোচনা করে দুজনে একসঙ্গে কাজ করবেন বলেও ঠিক করলেন। তাতে যত অর্থোপার্জন হবে তার অর্ধেক গোল্ডমুণ্ড পাবে। লিসবেথের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে চিরকালের মত আত্মীয়তার সূত্রে বেঁধে রাখতেও আপত্তি নেই তাঁর। 'সেণ্ট জন'কে সৃষ্টি করেছে যে শিল্পী সে যে তারই সমকক্ষ এ সত্য নিকোলাস বুঝেছেন। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। চোখের প্রখর দৃষ্টি আর হাতের নৈপুণ্য—দুই-ই স্তিমিত ও শিথিল হয়ে আসছে দিন দিন। তাই তাঁর এই বিখ্যাত শিল্পাগারটিকে অটুট রাখতে হলে এই তরুণ শিল্পীকে পাশে টেনে নিতেই হবে, আপন পরিবারভুক্ত করতেই হবে তাকে। তিনি বুঝলেন গোল্ডমুণ্ডকে সহজে এ পথে আনা যাবে না। তাকে প্রলুব্ধ করতে খুব কষ্ট পেতে হবে। কিন্তু তবুও একবার চেষ্টা করতেই হবে। তাঁর পরিকল্পনার কথা লিসবেথকে জানিয়ে তার মতামত চাইলে লিসবেথ কোনো আপত্তি করল না। গোল্ডমুণ্ড তার বাবার উপযুক্ত সহকর্মী হয়ে,

শিল্পীসংঘের সভ্য হয়ে প্রতিষ্ঠাবান নাগরিকের মর্যাদা লাভ করলে তার এ বিয়েতে আপত্তি করবার কি আছে! মেয়ের দিক থেকে কোনো বাধা না পেয়ে নিকোলাস আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পজীবন এই ভবঘুরেকে বাঁধতে না পারলেও লিসবেথ নিশ্চয়ই তাকে বন্দী করতে পারবে।

একদিন গোল্ডমুণ্ডকে তিনি ডেকে পাঠালেন। বনের পাখিকে বন্দী করবার জন্য সোনার খাঁচার সব ব্যবস্থাই করা হল। গোল্ডমুণ্ড এলে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সুন্দর সজ্জিত একটি ঘরে খেতে বসলেন। তাঁর একদিকে গোল্ডমুণ্ড, অন্যদিকে লিসবেথ। খাওয়া শেষ হলে লিসবেথ নীরবে চলে গেল। নিকোলাস তাকে তাঁর প্রস্তাব, তাঁর পরিকল্পনা জানালেন। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গোল্ডমুণ্ড নিকোলাসের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সে ভেবেছিল মাস্টার তাকে অলস ভাবে দিন কাটাবার জন্য হয়তো ভর্ৎসনা করবেন। কিন্তু, এসব কি শুনছে সে! কেমন একটা অসোয়াস্তি সে বোধ করল। মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। এভাবে নীরবে বসে থাকা তার পক্ষে অশোভন হচ্ছে বুঝতে পেরেও গোল্ডমুণ্ড অনেকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারল না। এত বড় সৌভাগ্যের সংবাদ জেনেও সামান্য একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত জানাল না সে। মাস্টার নিকোলাস বিরক্তি-ভরা মনে তাই ভাবতে ভাবতে আবার বললেন, 'তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ বুঝতে পারছি। বেশ, ভেবে দেখে তারপর তোমার মতামত জানিও। কিন্তু তোমার কাছ থেকে এমন ব্যবহার আমি আশা করি নি। ভেবেছিলাম তোমার জীবনে সবচেয়ে সুখের সন্ধানই আমি দিয়েছি। আমি অবশ্য তাই মনে করি।'

গোল্ডমুণ্ড কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ভাষা হারিয়ে ফেলেছে সে। অনেক কষ্টে ক্ষীণস্বরে বলল এবার, 'মাস্টার, আমার উপর রাগ করবেন না। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে আমার সম্বন্ধে আপনি যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন একদিন, সেজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আপনার ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না। কিন্তু ভেবে দেখবার জন্য আমাকে সময় নিতে হবে না আর। আমি আমার মন স্থির করে ফেলেছি। আমি এখানে থাকব না। পথই আমায় আবার ডাকছে।'

নিকোলাস বিবর্ণ হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ দুটি জ্বলে উঠল। গোল্ডমুণ্ড বলতে লাগল, 'স্বাধীন, মুক্ত জীবনকেই আমি আবার ফিরে পেতে চাই। অসীম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আপনাকে। আমার উপর রাগ করবেন না দয়া করে। বন্ধুভাবে, সস্নেহে আমাকে বিদায় দিন আপনি।' গোল্ডমুণ্ড তার হাতখানি নিকোলাসের দিকে এগিয়ে ধরল, তার সুন্দর দুটি চোখের কোলে জল টলটল করছে। কিন্তু নিকোলাস তার হাত ধরলেন না। তাঁর মুখখানি সাদা হয়ে গেছে। দ্রুত পায়ে তিনি ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত শরীর অসহ অব্যক্ত ক্রোধে কাঁপছে। গোল্ডমুণ্ড তাঁর এই রূপ এর আগে দেখে নি কোনো দিন।

হঠাৎ তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'যাও তাহলে। এখনই বেরিয়ে যাও আমার সম্মুখ থেকে। তোমার মুখদর্শনও করতে চাইনা আমি। ভাল চাও তো চলে যাও এখান থেকে।' গোল্ডমুণ্ডও লজ্জা, অপমানে বিবর্ণ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল নীরবে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অলিন্দে মূর্তিগুলির দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল একবার। তারপর তার 'সেণ্ট জনকে' শেষবারের মত দেখে নেবে বলে চুপি চুপি শিল্পাগারে ঢুকে পড়ল।

সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মনে মনে 'সেণ্ট জনকে' বিদায় সম্ভাষণ জানাবার পর বিষাদভরা মনে গোল্ডমুণ্ড পথে নেমে এল। লিডিয়াকে ছেড়ে আসতেও তার এত কষ্ট হয় নি।

নিজের ঘরে ঢুকে গোল্ডমুণ্ড চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। বিশেষ কিছুই তার করবার নেই। ঘরের দেওয়ালে তারই আঁকা একটি ম্যাডোনার ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। আরও টুকিটাকি কতকি জিনিস অগোছালো অবস্থায় ঘরের চারিদিকে পড়ে আছে। তার কাছে একদিন এদের প্রতিটিরই মূল্য ছিল, অর্থ ছিল। কিন্তু আজ এসব তার কাছে একেবারেই তুচ্ছ। এখন বাড়ির কর্তার সঙ্গে একবার দেখা করে বিদায় নেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই। ম্যাডোনার ছবিখানি গৃহকর্ত্রীকে উপহার দিয়ে তার কাছ থেকে কিছু খাবার নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়বে সে।

পরদিন খুব সকালে কয়েকটি ছবির বাণ্ডিল হাতে নিয়ে গোল্ডমুণ্ড ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সবার অজান্তে পথে বেরিয়ে পড়বে বলে ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোতেই দেখল বাড়িওয়ালার মেয়ে মেরী একবাটি দুধ আর

একটা রুটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির বয়স বছর পনের; শীর্ণকায়, শান্ত। চোখদুটিও ভারী সুন্দর। চোখে মুখে তার অনিদ্রার ক্লান্তি, কিন্তু বেশভূষা, বেশ পরিপাটি। বিষণ্ণ মুখে সে তার দিকে দুধের বাটিটি এগিয়ে ধরলে গোল্ডমুণ্ড দুধটুকু খেয়ে নিয়ে মেরীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল। নিশ্চল প্রতিমার মতই নীরবে সে গোল্ডমুণ্ডের বিদায় সম্ভাষণ গ্রহণ করল।

তেরো

গোল্ডমুণ্ডের ভবঘুরে জীবন শুরু হল আবার। অনেক দিন পর পথে বেরিয়ে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিল সে। দু চোখ ভরে প্রকৃতিকে দেখছে আর নূতন পাওয়া স্বাধীনতাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করছে। উন্মুক্ত নীল আকাশের নীচে, পথের বুকে বন্ধনহীন, গৃহহীন ভবঘুরে, ছন্নছাড়ার দল তাদের সহজ সরল অথচ বলিষ্ঠ জীবন ধারার অবাধ গতিতে এমনি করেই ভেসে চলে। প্রকৃতির অকৃপণ দানে ভরে ওঠে তাদের জীবন, তারা বাঁচে। রোদ, ঝড়, জল, বরফ, কুয়াশা, শীত, গ্রীষ্ম, সমস্ত পরিবেশেই তারা অটুট, অম্লান। তাদের ভবিষ্যৎ নেই, বড় হবার আকাঙ্ক্ষাও নেই। তারা প্রকৃতির দুঃসাহসী, দুর্জয় সন্তান; তারা চিরনবীন, চিরশিশু। নগরের নিরাপদ, পরাধীন, কোলাহলপূর্ণ জীবনের বাইরে এই ভবঘুরেদের অবাধ, মুক্ত ও বিপদসঙ্কুল জীবন আপন মহিমায় বিকশিত হয়ে ওঠে।

গ্রীষ্ম, শরৎ কেটে গেল। গোল্ডমুণ্ড আবার বরফ ভেঙ্গে পথ চলেছে। বসন্তের ছোঁয়ায় নবরূপে সজ্জিত, পুষ্পিত প্রকৃতির অপরূপ শোভা দু চোখ ভরে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত, ক্লান্ত পৃথিবীর দীর্ঘশ্বাস শুনতে শুনতে আপন শিথিল গতিকে দ্রুত করতেও চেষ্টা করে সে। এভাবে বছরের পর বছর সে পথ চলতে লাগল চারিদিকের সবকিছু ভুলে গিয়ে। ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভূতি ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতিই যেন রইল না আর তার মধ্যে। মাঝে মাঝে তার মনে হয় সে যেন আবার তার মায়ের বুকে ফিরে গেছে।

অনেক দিন পর রবার্ট নামে এক তরুণ রোমান তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পথেই দেখা হল তার। গোল্ডমুণ্ড তাকে পুরোপুরি না চিনতে পারলেও এটুকু

বুঝল, তারই মত পথের নেশা রবার্টের মধ্যেও রয়েছে। নূতন দেশ দেখবার আশায়, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবার নেশায় সেও তারই মত পথকে আশ্রয় করেছে। তাই ছেলেটির প্রতি কেমন একটা আকর্ষণও বোধ করল গোল্ডমুণ্ড। এবার রবার্টকে সে সঙ্গী হিসাবে পেল। রবার্টও গোল্ডমুণ্ডের বিশেষ ভক্ত হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। তার বুদ্ধি, বিবেচনা, সাহস আর সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছে। কয়েকদিন যেতে না যেতেই রবার্ট বুঝতে পারল একজন প্রকৃত শিল্পীর সমস্ত গুণাবলীই গোল্ডমুণ্ডের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

চলার পথে একদিন তারা এক গ্রামের উপান্তে এসে পৌঁছল। একদল কৃষক লাঠি-সোটা নিয়ে তাদের তাড়া করে সেই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলল। ক্রোধোন্মত্ত কৃষকেরা তাদের আর একটি পা-ও এগোতে দিল না। গোল্ডমুণ্ড ও রবার্ট পিছিয়ে আসতে বাধ্য হল।

গোল্ডমুণ্ড হেসে বলল, 'ঐ নির্বোধ লোকগুলির মাথায় কি ঢুকেছে কিছুই বুঝতে পারছি না। যুদ্ধ লেগেছে নাকি? এসবের কি অর্থ কে জানে?'

রবার্টও কিছু বুঝতে পারে নি। পরদিন সকালবেলা সেই গ্রাম থেকে অনেকদূরে একটা পরিত্যক্ত গোলাবাড়ির আঙ্গিনাতে এই রহস্যের যবনিকা উঠল। সবুজ, সুন্দর একটা ফলের বাগানের মাঝখানে গোলাবাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে ঘুমন্ত রহস্যপুরীর মত। খড়ে-ছাওয়া কুটির কয়েকটি। কেউ কোথাও নেই। বাগানের মধ্যে একটা গাভী দাঁড়িয়ে আছে, ওটাকে দেখেই বোঝা গেল দুধ দুইবার সময় হয়েছে এখন। রবার্ট ও গোল্ডমুণ্ড দরজার কাছে গিয়ে কড়া নাড়ল, কোন সাড়া শব্দ নেই। গোয়ালঘর, গোলাবাড়ি সব শূন্য, পরিত্যক্ত। কোথাও কোনো জনমানবের চিহ্নও নেই। গোল্ডমুণ্ড অবাক হয়ে ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে সে চীৎকার করে বলে উঠল, 'কে আছ বাড়িতে?'

তবুও কোনো উত্তর নেই।

রবার্ট বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। গোল্ডমুণ্ড কৌতূহলী হয়ে ভিতরে চলে গেল। কেমন একটা দুর্গন্ধ আসছে ভেতর থেকে। রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে দেখল উনুনের পাশে এক গাদা ছাই জড়ো করা আছে। এখনও কয়েকটি জ্বলন্ত অঙ্গারের বুকে আগুন রয়েছে। চুল্লির আবছা আলোতে হঠাৎ সে দেখল ঘরের এককোণে কে যেন বসে রয়েছে। এগিয়ে দেখল একটা কাঠের উঁচু আসনের উপর একটি বৃদ্ধা বসে। গোল্ডমুণ্ড নীরবে তাকে একটু নেড়ে

তার কাঁধের উপর হাতখানি রাখলেও বৃদ্ধা কোন সাড়া দিল না। গোল্ডমুণ্ড চমকে উঠে ভাবল, 'বুড়ি মরে গেছে।' জ্বলন্ত অঙ্গারে ফুঁ দিয়ে অনেক কষ্টে একটা মশাল জ্বালিয়ে তার আলোতে বৃদ্ধার মুখখানি ভাল করে দেখতে লাগল সে। সাদা চুলের নীচে মুখখানি তার নীল হয়ে গেছে। বুঝতে পারল ওখানে বসে বসেই বৃদ্ধা মরে গেছে। মশালটি হাতে নিয়ে গোল্ডমুণ্ড অন্যদিকে যেতেই দেখতে পেল দরজায় চৌকাঠের উপর আর একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। ন'-দশ বছরের একটি ছেলে; চৌকাঠের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে তার মৃতদেহ। গোল্ডমুণ্ড বিড় বিড় করে আপন মনে বলল, 'দুজন হল এবার।' যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে এমনি মোহাবিষ্ট হয়ে গোল্ডমুণ্ড হাঁটতে হাঁটতে পেছনের দিকে একটা ঘরে ঢুকে দেখল বিছানার উপর একটি গোঁফ দাড়িওয়ালা পুরুষ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। শরীরটা শক্ত কাঠ হয়ে গেছে, মাথাটি একদিকে হেলে পড়েছে, দাড়ির গুচ্ছ শক্ত হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। এই লোকটি নিশ্চয় বাড়ির কর্তা। তার কোটরাগত চোখ দুটি মৃত্যুর বিচিত্র এক জ্যোতির্বিকাশী প্রভায় জ্বলজ্বল করছে। দ্বিতীয় বিছানাটিতে এলোমেলো চাদরের উপর একটি লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবতী মেয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে, মুখখানি বালিশের মধ্যে গুঁজে। তারই একপাশে একটি কিশোরী মেয়ে পড়ে আছে, মৃত্যুর করাল ছায়া তারও চোখে মুখে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

গোল্ডমুণ্ড এদের প্রত্যেকের মুখ গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে দেখল। কিশোরী মেয়েটির স্ফীত চোখে মুখে একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে। ওর মায়ের চোখেমুখে বিচিত্র ক্রোধের সঙ্গে বিভীষিকার ছায়া এক হয়ে মিশেছে। পুরুষ লোকটির মুখখানি ব্যথাকাতর হলেও উদ্ধত, অনমনীয়। সে যেন অনেক যুদ্ধের পর তিল তিল করে মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে রণক্লান্ত বীর সৈনিকের মতই সে পড়ে আছে। তার মরণাহত, স্থির উদ্ধত মুখখানির এক বিচিত্র সৌন্দর্য গোল্ডমুণ্ডকে মুগ্ধ করল। চৌকাঠের উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা সেই ছোট ছেলেটির মৃত্যুজর্জরিত দেহখানিই সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার মুখখানি দেখে কিছু বুঝবার উপায় নেই। কিন্তু মুষ্টিবদ্ধ হাতদুখানিই অনেক কিছু বলে দেয়। গোল্ডমুণ্ড সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। মৃত্যুর বীভৎসতায় এই বাড়িটি ভয়াবহ হয়ে উঠলেও এর একটা বিচিত্র আকর্ষণ রয়েছে। জীবনের এক পরম

সত্যকে, নির্মম, নিষ্ঠুর নিয়তির অমোঘ বিধানকে সে এখানেই আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল। রবার্ট বাইরে দাঁড়িয়ে গোল্ডমুণ্ডকে ডাকাডাকি করছে তখন। রবার্টের ভীতচকিত স্বরে গোল্ডমুণ্ড অবাক হয়ে ভাবল মানুষ কত স্বার্থপর আর নির্বোধ হতে পারে, রবার্ট তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এদের মত দুর্বলচিত্ত, স্বার্থপর লোকেরা মৃত্যুর শান্ত, মহান রূপ কোনোদিনই উপলব্ধি করতে পারে না। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে জীবনটাকে আঁকড়ে ধরে থাকার হীন চেষ্টার অবধি নেই এদের। রবার্টের ডাকাডাকিতে কোনো জবাব না দিয়ে গোল্ডমুণ্ড তেমনই শান্ত, স্থির হয়ে মৃতদেহগুলি দেখতে লাগল। শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে সে সবার দিকে তাকাল। এদের মধ্যে জীবনটাকে যেন নূতন রূপে দেখতে পেল সে। কী বিচিত্র, ভয়াবহ এক অভিশাপ নেমে এসেছে এই পরিত্যক্ত বাড়ির উপর।

গোল্ডমুণ্ড তার ভবঘুরে জীবনে অনেক মৃত্যু দেখেছে। কিন্তু মৃত্যুর এমন বিচিত্র, মহান রূপ আর কোনোদিন দেখে নি। সমস্ত কিছু ভুলে আপন মনে চিন্তা করতে লাগল সে। রবার্টের আর্ত-চীৎকারে তার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বাইরে এলে রবার্ট তাকে ভীতস্বরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল। ক্ষীণস্বরে সে বলল, 'কি হয়েছে? কেউ নেই নাকি ওখানে? একি চেহারা হয়েছে তোমার! কথা বল গোল্ডমুণ্ড।'

গোল্ডমুণ্ড নির্বিকার ভাবে বলল এবার, 'যাও না, নিজে গিয়ে দেখে এস। বাড়িটা দেখবার মতই বটে।'

রবার্ট দ্বিধাভরে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। আবছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে চুল্লির ধারে উনুনের পাশে সেই মৃত বৃদ্ধাটিকে দেখেই চীৎকার করে ছুটে বেরিয়ে এল। ভীত কম্পিতস্বরে সে বলল, 'ওঃ, গোল্ডমুণ্ড, ওখানে একটা বুড়ি মরে আছে! আর কেউ নেই কেন ওখানে? কেউ তার সমাধির ব্যবস্থা করে নি কেন? উঃ, কী বিশ্রী দুর্গন্ধ চারদিকে!'

গোল্ডমুণ্ড হাসল। 'হ্যাঁ, তুমি সত্যিই বীরপুরুষ রবার্ট! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চলে এলে কেন বন্ধু? চেয়ারের মধ্যে একটি বৃদ্ধা মরে বসে আছে এই দৃশ্য তো দেখবার মতই বটে। আরও কয়েক পা ভেতরে গেলে আরও সুন্দর সব দৃশ্য দেখতে পেতে। তারা পাঁচ জন রয়েছে সেখানে, বুঝলে?'

রবার্ট সহসা আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল, 'ও, এখন বুঝতে পারছি কাল ঐ গ্রামবাসীরা কেন আমাদের তাড়া করে ছুটে এসেছিল! ওঃ ভগবান!

এখন বুঝতে পারছি এ মহামারী। গোল্ডমুণ্ড, তুমি এতক্ষণ ওখানেই মৃতদেহগুলি ঘাঁটছিলে নাকি? আমার কাছ থেকে সরে যাও। আমার এত কাছে এসো না। তোমাকে নিশ্চয়ই ধরেছে! এবার তোমাকে ছেড়ে যেতেই হবে গোল্ডমুণ্ড। এজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর আমি থাকতে পারি না।'

রবার্ট দৌড়ে কয়েক গজ যেতেই গোল্ডমুণ্ড পিছন থেকে তাকে ধরে ফেলল শক্ত করে। ব্যঙ্গভরা স্বরে বলল, 'বাঃ, তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি! যা বলেছ হয়তো সেটাই ঠিক। কিন্তু তোমাকে এভাবে পালাতে দেব না বন্ধু! মহামারীর কবলে পড়ে তুমি একলা মরে পড়ে থাকবে কোথাও তা হতে দেব না। তোমার জন্য আমি যথেষ্টই ভাবি। তাই তোমার পাশে পাশেই আমি থাকব। আমি মারা গেলে তুমি না হয় পালিয়ে যেও, বুঝলে? কিন্তু তার আগে তোমার পালান চলবে না। শোন, আর চেঁচিও না। আমি কোনো কথাই শুনতে চাই না আর।'

রবার্ট আর পালাবার চেষ্টা করল না। ক্ষীণস্বরে একবার শুধু বলল, 'তুমি আমাকে বড় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে গোল্ডমুণ্ড। ঐ অভিশপ্ত বাড়িটার ভেতর থেকে যখন বেরিয়ে এলে তখন তোমার মুখ দেখে চমকে উঠেছিলাম। তোমাকেও মহামারী আক্রমণ করেছে ভাবলাম। ওখানে তুমি কি এমন দেখেছ যার জন্য তোমার চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছিল?'

'না, তেমন কিছু দেখি নি। তবে মহামারী আক্রমণ না করলেও তোমার, আমার এবং পৃথিবীর সমস্ত লোকের ভাগ্যে যা আছে, নিয়তির সেই অবধারিত বিধানকেই আমি দেখে এলাম।'

এখান থেকে বেরিয়ে তারা চারিদিকে মহামারীর তাণ্ডব লীলা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল। অনেক গ্রামে তাদের প্রবেশ করতে দিল না, আবার অনেক গ্রামে অবাধে তারা চলাফেরা করল। সেখানে তাদের বাধা দেবার কেউ নেই। পরিত্যক্ত, শূন্য ঘরবাড়ি পড়ে আছে শুধু। চারিদিকই শ্মশান, মৃত্যুপুরী। পথে, মাঠে, সর্বত্র পচা মৃতদেহের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। গৃহপালিত জীবগুলিও কিছু মরে গেছে, কিছু অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। গোল্ডমুণ্ড ও রবার্ট দুজনে মিলে পথের ধারে পরিত্যক্ত সরাইখানায় ঢুকে ইচ্ছামত মদ, খাবার ইত্যাদি খেয়ে নেয়। তাদের বাধা দেবার কেউ নেই সেখানে। রবার্ট অবশ্য সর্বদাই মহামারীর ভয়ে এমন আতঙ্কিত হয়ে

থাকে যে সহজে কিছুই খেতে চায় না। মৃতদেহ দেখলেই তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে সে পাগলের মত হয়ে ওঠে, গোল্ডমুণ্ডের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে যেতে চায়। গোল্ডমুণ্ডের ভয় বলে কিছু নেই মনে, কিন্তু কেমন একটা নির্লিপ্ত ভাব মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দর্শকের নির্বিকার দৃষ্টি নিয়ে সে এই বিশাল মৃত্যুপুরীর উপর দিয়ে চলেছে, দু-চোখ ভরে মৃত্যুর রূপ দেখতে দেখতে। পৃথিবী-জোড়া সোনার ফসল স্রষ্টা যেন আপন খেয়ালে তার কাস্তেখানি দিয়ে কেটে চলেছে। এই ভয়াবহ মৃত্যুর রাজত্বে কখনো কখনো গোল্ডমুণ্ড তার মাকে দেখতে পায়। দানবী মেডুসার রূপ ধরে মূর্তিমতী মৃত্যুরূপিণী মা তার এই শ্মশানপুরীতে নেচে বেড়াচ্ছে যেন!

চলতে চলতে তারা একদিন একটি ছোট্ট শহরের প্রান্তে এসে পৌঁছল। শহরটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। রবার্ট ভেতরে প্রবেশ করতে ভয় পেয়ে গোল্ডমুণ্ডকেও ফিরে আসতে অনুরোধ জানাল। ঠিক সেই মুহূর্তেই তারা শবযাত্রার ঘণ্টা ধ্বনি শুনতে পেল। তাকিয়ে দেখল একজন পুরোহিত ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছেন, তাঁর পেছনে মৃতদেহ বোঝাই তিনটি গাড়ি; দুটি গাড়ি ঘোড়ায় টানছে, একটি ষাঁড়ে। বিচিত্র পোশাক ও মুখোশ-পরা কয়েকজন মজুরও গাড়ির পাশে পাশে চলেছে। রবার্ট থর থর করে কাঁপতে লাগল। তার মুখখানি সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। গোল্ডমুণ্ডও সেই মৃতবাহী গাড়িগুলির পেছনে চলতে লাগল। একটু দূরে গিয়েই মজুরেরা নির্জন মাঠের বুকে অগভীর একটা গর্তের মধ্যে মৃতদেহগুলি গাড়ি থেকে টেনে ফেলতে লাগল। পুরোহিত তার হাতের ক্রুশ দুলিয়ে আপন মনে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। তারপর নীরবে শহরের দিকে চলে গেলেন। মজুর কয়জনও সেই গর্তের চারদিকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। গোল্ডমুণ্ড একটু এগিয়ে এসে উঁকি মেরে মৃতদেহগুলি দেখতে লাগল।

গোল্ডমুণ্ড ফিরে এলে রবার্ট তাকে হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ জানাল যেন সে শহরের মধ্যে না ঢোকে। কিন্তু গোল্ডমুণ্ডের শূন্য, গভীর দৃষ্টি দেখেই সে বুঝল গোল্ডমুণ্ড আরও মৃত্যু দেখতে চায়। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হতে চায় সে। তাকে সে কিছুতেই ধরে রাখতে পারল না। একলাই ফটক পার হয়ে গোল্ডমুণ্ড শহরে প্রবেশ করল।

চলতে চলতে একটি বাড়ির সামনে এসে দেখল জানলার কাছে দাঁড়িয়ে একটি তরুণী একমনে চুল বাঁধছে। গোল্ডমুণ্ডের চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠলেও সরে গেল না। গোল্ডমুণ্ড তার দিকে তাকিয়ে এবার হেসে ফেলতেই মেয়েটিও মৃদু হাসল।

সাহস পেয়ে গোল্ডমুণ্ড মেয়েটিকে প্রশ্ন করল, 'চুল বাঁধা শেষ হল?'

মেয়েটি এবারেও একটু হাসল শুধু।

গোল্ডমুণ্ড বলল, 'এখনও অসুস্থ হও নি তাহলে?' মেয়েটি মাথা নাড়ল। গোল্ডমুণ্ড আবার বলল, 'বেশ, তাহলে আমার সঙ্গে চলে এস। এই মৃত্যুপুরীতে আর নাইবা থাকলে। এস, আমরা ঐ বনের মধ্যে চলে যাই।'

মেয়েটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে তার দিকে তাকাতেই গোল্ডমুণ্ড বলল, 'হাঁ, আমি যা বলছি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। এত ভাববার কি আছে? এখানে তোমার কে থাকে? বাবা মা? এরা তোমার কেউ হয় না? তাহলে তো ভালই হল। চলে এস আমার সঙ্গে।' মেয়েটি কি করবে ভেবে না পেয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। গোল্ডমুণ্ড নির্জন রাস্তার এদিক ওদিকে ঘোরাঘুরি করল কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে এসে দেখে মেয়েটি তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গোল্ডমুণ্ড তাকে ছেড়ে চলে যায়নি দেখে তার আনন্দই হল যেন।

মেয়েটি এবার ইশারায় গোল্ডমুণ্ডকে দাঁড়াতে বলল। একটু পরেই ছোট্ট একটি পুঁটলি হাতে নিয়ে সে গোল্ডমুণ্ডের কাছে নেমে এল।

গোল্ডমুণ্ড জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি?'

'লিনি। আমি তোমার সঙ্গেই যাব। ওঃ, এখানে থাকা অসম্ভব! সবাই সরে যাচ্ছে। চল, আমরা অনেক দূরে চলে যাই।'

রবার্ট ফটকের ওদিকে ঘাসের উপর চুপচাপ বসে ছিল। গোল্ডমুণ্ডের সঙ্গে একটি মেয়েকে আসতে দেখে সে অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল। কাছে এসে গোল্ডমুণ্ড বলল, 'রবার্ট, তোমাকে একটা সু-খবর দিচ্ছি। এই ভীষণ মহামারীর দূষিত স্পর্শ বাঁচিয়ে আমরা এখন একটু সুখে শান্তিতে থাকতে চাই কয়েকটা দিন। বনের মধ্যে গিয়ে একটা কুঁড়ে ঘর তৈরি করে আমি আর লিনি সেখানে থাকব আর তুমি আমাদের বন্ধুর মত আমাদের সঙ্গেই থাকবে। রাজী আছ?' রবার্ট সেই মুহূর্তেই সম্মত হয়ে গেল।

তারা তিন জন একসঙ্গে পথ চলতে আরম্ভ করল এবার। কিছুদূর পর্যন্ত নির্বাক হয়ে পথ চলার পর লিনিই প্রথম কথা বলতে শুরু করল। এত দিন পর মৃত্যুপুরীর বাইরে এসে সবুজ প্রান্তর, গাছপালা আর অসীম নীল আকাশ দেখতে পেয়ে লিনির আনন্দ আর ধরে না। মহামারী-কবলিত সেই শহরের নানা কাহিনী সে তাদের শোনাতে লাগল। মৃত্যুর বীভৎসতা, মানুষের নীচতা ও স্বার্থপরতা সম্বন্ধে নানা গল্প সে বলে চলল। ভয়াবহ মৃত্যুর করাল ছায়ায় চারিদিকে যে বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে তারই সুন্দর একটি ছবি লিনির ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠল তাদের কাছে। তারা কেউই তাকে কথা বলতে বাধা দিল না। রবার্ট একমনে, ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে লিনির কথা শুনছে। গোল্ডমুণ্ড একান্ত নির্বিকারভাবে আপন মনে পথ চলছে।

শেষ পর্যন্ত লিনি ক্লান্ত হয়ে চুপ করতে বাধ্য হল। তার ভাষা যেন ফুরিয়ে গেছে। গোল্ডমুণ্ড এবার মৃদু স্বরে গান গাইতে আরম্ভ করল। রবার্ট গোল্ডমুণ্ডকে আর কোনোদিন গান গাইতে শোনে নি। এখন তার গানের অপরূপ সুরমাধুর্যে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবল গোল্ডমুণ্ড কি না জানে!

পরদিন তারা বনের মধ্যে প্রবেশ করে একটা ঝোপের কাছে সুন্দর একখানি কুটির দেখতে পেল। পাইন কাঠ দিয়ে তৈরি কুটিরটি শূন্য পড়ে আছে। রবার্টের জায়গাটা বেশ ভালই লাগল। পথে যেতে যেতে তারা অনেকগুলি ছাগল চরতে দেখে তাদের মধ্য থেকে একটাকে সঙ্গে নিয়েছিল।

গোল্ডমুণ্ড হেসে বলল, 'রবার্ট, এই কুটিরটির একটা ঘরে আমরা দুজন থাকব। অন্য ঘরটায় তুমি আর তোমার ছাগল বন্ধুটি থাকবে, কেমন? আজ আমাদের এই ছাগলের দুধ খেয়েই থাকতে হবে। কাল থেকে খাবারের খোঁজে বের হব।'

লিনিকে গোল্ডমুণ্ডের বড় ভাল লাগল। সহজ, সরল মেয়েটি জীবনের উষ্ণ স্পর্শ দিয়ে তাকে ভরিয়ে তুলল। জীবনকে উপভোগ করতে করতেও আজ কেবলই তার মৃত্যুর কথা মনে পড়ছে। একমনে সে ভাবছে জীবন কত সুন্দর কিন্তু কত ক্ষণস্থায়ী!

লিনি বনের মধ্যে গিয়ে বেরি ফল সংগ্রহ করে আনে আর ছাগলটাকে চরায়। গোল্ডমুণ্ডও খাবারের সন্ধানে বনের গভীরে এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়ায়, বেলা শেষে খাবারের ঝুলি কাঁধে নিয়ে ঘরে ফেরে। ধারে কাছে

কোনো জনবসতি নেই। চারিদিক নির্জন, নিথর। রবার্ট অবশ্য এজন্য বেশ খুশি, কারণ মহামারীর কোনো আশঙ্কা এখানে নেই। লিনি তার এই ছোট্ট সংসারে, তুচ্ছ ঘরকন্নার মধ্যেই আনন্দে ডুবে আছে। কাজ করছে, হাসছে, গান গাইছে সে। রুটির অভাব হলেও তাদের কুটিরের কাছেই একটা ক্ষেতের উর্বর মাটিতে বীট পালং অপর্যাপ্ত জন্মেছে। তাই উঠিয়ে এনে খেতে লাগল তারা। আরও একটা ছাগল পাওয়ায় দুধেরও অভাব হল না। অদূরে একটা ঝরনাধারা তরতর করে বয়ে যাচ্ছে, তার জল যেমন নির্মল তেমনই মিষ্টি। হাসি, গান ও আনন্দে তাদের জীবনের অলস-মন্থর দিনগুলি কাটতে লাগল।

একদিন খেতে বসে গল্প করার সময় সহসা স্বপ্নাচ্ছন্নের মত লিনি বলে উঠল, 'আচ্ছা, শীত এলে কি হবে?'

কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিল না। রবার্ট হাসল। গোল্ডমুণ্ড আনমনে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। লিনি বুঝতে পারল তাদের দুজনের একজনও এ বিষয়ে কিছুই ভাবেনি। তারা কেউই এখানে বেশীদিন থাকতে চায় না নিশ্চয়। তাই তারা এই ঘরকে তাদের আপন ঘর বলে মনে করতে পারছে না। ভবঘুরেদের সঙ্গে এসে সে নিজেও বুঝি গৃহহারা, সর্বহারা হল।

কিছুক্ষণ পর গোল্ডমুণ্ড শিশুকে প্রবোধ দেবার মত করে কোমল, হালকা ভাষায় বলল, 'তুমি সত্যিই কত সরল, সহজ লিনি! এমনকরে আবার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে আছে! ভয় পেওনা লক্ষ্মীটি। মহামারীর প্রকোপ কমে গেলে আমরা তোমাকে তোমার বাড়িতে আবার পৌঁছে দিয়ে আসব। তখন তুমি তোমার খুশিমত জীবন চালাবে। কিন্তু এখনো তো গরম চলে যায়নি, আমরা এখনও বেশ আরামেই আছি। তবে এত ভাবছ কেন?'

লিনি বিরক্তিভরে বলে উঠল এবার, 'কিন্তু শীত এল বলে। তখন তুমি বুঝি একলাই সরে পড়বে এখান থেকে? আর আমার অবস্থা কি হবে তখন?'

গোল্ডমুণ্ড লিনির বিনুনীতে সস্নেহে একটা টান দিয়ে বলল, 'বোকা মেয়ে। মৃত্যুপুরীর সেইসব ভয়াবহ দৃশ্য কি এরই মধ্যে ভুলে গেছ? সেই মরণযজ্ঞে তুমিও যে বলি হওনি সেকথা ভেবেই সান্ত্বনা পাওয়া উচিত তোমার, খুশি

হওয়া উচিত। তুমি শুধু ভাববে, আমার অনেক ভাগ্য আমি এখনও বেঁচে আছি।'

গোল্ডমুণ্ডের কথায় লিনি মোটেই সন্তুষ্ট হল না। অভিযোগের সুরে বলল, 'আমি তো আবার ফিরে যেতে চাই নি! আর পথেও বের হতে চাই না। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না গোল্ডমুণ্ড।' লিনি আর একটি কথাও বলতে পারলনা। তাদের ভালবাসার উপর, তাদের এই পরম সুখের জীবনের উপর একটা কাল অশুভ ছায়া ঘনিয়ে এল।

চৌদ্দ

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে যাবার আগেই অতর্কিতে একদিন বনের ধারে তাদের পাতার কুটিরের সংসারী জীবনের উপর যবনিকা পড়ল। সেদিন গোল্ডমুণ্ড একটা ফিঙ্গা তৈরী করে বনের মধ্যে পাখি শিকার করবার জন্য এদিক ওদিক ঘুরছে। লিনিও তার সঙ্গে বেরিফল কুড়াতে এসেছে।—লিনি এখন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, আগামী বসন্তের কথা ভাবে। লিনি সন্তানসম্ভবা। গোল্ডমুণ্ডকে আর কোথাও যেতে দেবে না সে।

শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে গোল্ডমুণ্ড ভাবছে: এই জীবন আর ভাল লাগছে না আমার। আবার পথে বেরিয়ে পড়তে হবে। একবার মেরিয়াব্রোনে নরজিসকে দেখতে যাব। দীর্ঘ দশটি বছর চলে গেছে আমি তাকে দেখি নি। তাকে দেখবার জন্য প্রাণ আমার আকুল হয়ে উঠেছে। আমাকে যেতেই হবে, এই বদ্ধ জীবন ছেড়ে আবার পথ চলতে হবে।

সহসা একটি আর্তস্বর তার চিন্তাধারাকে ছিন্ন করে দিল। লিনি চীৎকার করছে, কোনো বিপদে পড়ে অসহায় ভাবে প্রাণপণ চীৎকার করছে সে। চীৎকার যে দিক থেকে ভেসে আসছে গোল্ডমুণ্ড দৌড়ে সেদিকেই গেল। কিছুদূর এগিয়ে সে দেখতে পেল লিনি হাঁটু গেড়ে ঘাসের উপর বসে আছে—তার পোশাক ছেঁড়া। আর্তস্বরে কাঁদতে কাঁদতে একটা লোকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে সে। প্রচণ্ড রাগে, দুঃখে, অপমানে গোল্ডমুণ্ড লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংস্র বাঘের মত। লিনির অনাবৃত বক্ষ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে তখন। লোকটা তাকে তখনো রক্তলোলুপ পশুর মত সবলে

আঁকড়ে ধরে আছে। গোল্ডমুণ্ড ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সরু, লোমস গলাটাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে টিপে ধরে তার শ্বাসরোধ করে দিল। তারপর তাকে টেনে হেঁচড়ে ধারাল শুকনো পাথরের একটা স্তূপের কাছে এনে দু-হাতে উঁচুতে উঠিয়ে দু-তিন বার সেই নগ্ন পাথরের উপর তার মাথাটাকে আছড়ে দিয়ে জড় পিণ্ডটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। লিনি এতক্ষণ বিস্ময়ভরা আনন্দের সঙ্গে এই দৃশ্য দেখছিল। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপছে তখনো। নিঃশ্বাস নিতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে। ওদিকে লোকটা একটা মৃত সাপের মত দুমড়ে কুঁকড়ে পড়ে আছে। বিবর্ণ মুখখানি তার বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। লিনি দুর্বল পায়ের উপর ভর করে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল এবার। কিন্তু তখনই আবার কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হতেই গোল্ডমুণ্ড তাকে কোলে করে কুটিরে নিয়ে এসে তার বুকের রক্ত ধুয়ে মুছে তাকে শুইয়ে দিল। আনন্দে আজ লিনি ছোট্ট মেয়ের মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গোল্ডমুণ্ডের প্রতি সে নূতন করে ভালবাসা, শ্রদ্ধা অনুভব করল।

গোল্ডমুণ্ডের মন আজ বিরূপ হয়ে আছে। সে কোনো কথাই বলছে না। রবার্ট তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তাকে একলা থাকতে দিয়ে কোথায় সরে পড়েছে। গভীর রাত্রে গোল্ডমুণ্ড লিনির পাশে খড়ের শয্যায় শুয়ে লিনির উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখতে লাগল। লিনি তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বিছানায় শুয়ে গোল্ডমুণ্ড অস্থির ভাবে এপাশ ওপাশ করতে করতে ভিক্টরের কথা ভাবছে। তখনই সব ছেড়ে বিবাগী হয়ে যেতে ইচ্ছা হল তার। সে অনুভব করল এবার এই বদ্ধ, সংকীর্ণ জীবনের উপর ছেদ টেনে দেবার সময় হয়েছে, আর তা তাকে করতেই হবে। সহসা আর একটি ভাবনা তাকে ঘিরে ধরল। লম্পট লোকটাকে হত্যা করবার সময় লিনির চোখের দৃষ্টি সে দেখেছে। তখনকার সেই বিচিত্র দৃষ্টি এ জীবনে সে কোনো দিনই ভুলবে না। মনে রাখবার মত সম্পদই সেটা। লিনির অতি সাধারণ মুখখানিতে বিচিত্র এক সৌন্দর্যমেশানো সেই ভাত, চকিত দৃষ্টিই চিরকালের মত তাকে স্মরণীয় করে তুলেছে। এই দৃষ্টিই তাকে এক স্থির-সংকল্পে অবিচল করে রাখল—একে কাঠের বুকে অমর করে রাখতে হবে। আর এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আঁকবার, মূর্তি গড়বার চিরন্তন শিল্পচেতনা আবার জেগে উঠল তার মনে।

অনেকক্ষণ শুয়ে থেকেও তার ঘুম এল না। তাই সে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে শীতের আমেজ, বার্চ গাছের পাতায়, শাখায় বাতাসের মর্মর ধ্বনি। অন্ধকারের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর গোল্ডমুণ্ড একটা পাথরের উপর বসে বিষাদভরা অজস্র ভাবনার স্রোতে আপনাকে হারিয়ে ফেলল। কত পাপ সে সঞ্চয় করেছে জীবনে। নিজের পবিত্রতা আর শিশুর মত সরল সুন্দর সত্তাকে সে হারিয়ে ফেলেছে। এরই জন্য কি সে মঠ থেকে পালিয়ে নরজিসকে ছেড়ে, মাস্টার নিকোলাসকে গভীর আঘাত দিয়ে পথের কঠোর রুগ্ন জীবন বরণ করে নিয়েছে? ভাবতে ভাবতে পাথরটার উপরই শুয়ে পড়ে ধূসর মেঘেঢাকা আকাশের দিকে তাকাল সে। আকাশের দিকে অথবা তারই আপন অন্ধকারাচ্ছন্ন মনের গভীরে সে এতক্ষণ ডুবে ছিল, কিছুই বলতে পারেনা। তারপর একসময় গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। রাত্রির শিশির তার উপর বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়ে তাকে ভিজিয়েদিচ্ছে।

পরদিন লিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ল। গোল্ডমুণ্ড ও রবার্ট খাবারের সন্ধানে সারাদিন বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যার দিকে পরিশ্রান্ত হয়ে কুটিরে ফিরে এল। লিনি তখন মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। গোল্ডমুণ্ড আনত হয়ে তাকে ভাল করে দেখল, শরীরের উত্তাপ অনুভব করল। তার দেহে মহামারীর গুটিকা দেখতে পেল সে। রবার্টকে এ বিষয়ে কিছু না বললেও সে ঠিক সন্দেহ করল। লিনি আরও বেশি অসুস্থ হয়েছে জেনে সে আর কুটিরের মধ্যে আসতে চাইল না। বনের মধ্যেই কোথাও রাত কাটাবে স্থির করল।

গোল্ডমুণ্ড লিনিকে বলল, 'ভয় পেও না লিনি। আমি তোমার পাশেই আছি। কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি সেরে উঠবে।'

লিনি মাথা নাড়ল। বলল, 'তুমি একটু সাবধানে থেকো, গোল্ডমুণ্ড। আমার এত কাছে এসো না লক্ষ্মীটি। আমাকে যত্ন করবার জন্য তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি জানি আর আমি বাঁচব না। তুমি আমার পাশে নেই, শূন্য ঘরে আমাকে একা ফেলে রেখে তুমি চিরদিনের জন্য চলে গেছ তা সহ্য করার চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। আমি মরতেই চাই।'

সকাল বেলার দিকে তার অবস্থা আরও খারাপ হল। মাঝে মাঝেই তাকে জল দিতে হচ্ছে। তার পাশে বসেই সে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিল। তারপর জেগে উঠে দেখল দিনের আলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

লিনির চোখে মুখেও করাল মৃত্যুর সুস্পষ্ট ছায়া। বাইরে গিয়ে একটু হাঁফ ছেড়ে আকাশের দিকে তাকাল সে। অদূরে ঐ বনের ধারে দুটি ফার গাছও মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পাতায় পাতায় রোদের আলোর ঝিলিমিলি। আজ সকাল বেলাটা ভারী সুন্দর লাগছে, ঠাণ্ডার আবেশ বাতাসের বুকে। দূরের ঐ পাহাড়ের সারি ঘন কুয়াশার আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে।

গোল্ডমুণ্ড আবার যখন ঘরে ঢুকল, লিনি তখনও ঘুমোচ্ছে। সেও কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বসে রইল। তন্দ্রার আবেশেই স্বপ্ন দেখতে লাগল—তার ছোট্ট টাট্টু ঘোড়া ব্লেস আবার তার কাছে ফিরে এসেছে। মঠের সেই সুন্দর বাদাম গাছটিকেও দেখল। দেখল সে যেন এক সীমাহীন মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলেছে। জীবনে যে নিশ্চিন্ত সুখের ঘর সে পায় নি, দেখে নি কোনোদিন স্বপ্নের মধ্যে তাও বুঝি সে দেখল। চোখের জলের ধারা তার গাল বেয়ে নেমে আসতেই সে জেগে উঠল। লিনি ক্ষীণ স্বরে তাকে ডাকছে শুনতে পেয়ে সোজা হয়ে বসল। কিন্তু না, লিনি ত আপন মনেই কথা বলে যাচ্ছে, হেসে উঠছে, আবার গানও গাইছে। হঠাৎ একবার কেঁদে উঠল আকুল হয়ে। গুমরে গুমরে কাঁদল কতক্ষণ। তারপর তার স্বর আবার নীরব হয়ে এল। গোল্ডমুণ্ড তার কাছে এসে দাঁড়াল। মৃত্যুপথ-যাত্রিনীর অন্তিম সময়ের মুখখানি ভাল করে দেখে নিয়ে মনে মনে বলল, 'লিনি, লক্ষ্মী লিনি আমার, তুমিও আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ? তুমিও আমার উপর রাগ করেছ?'

লিনিকে ফেলে রেখে দৌড়ে চলে যেতে ইচ্ছা হল তার। দূরে, অনেক দূরে কোথাও গিয়ে প্রাণ ভরে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে, নূতন দৃশ্য নূতন জীবনের আনন্দের ছবি দেখে আবার সে তার সকল ব্যথা-বেদনা দুঃখ-যন্ত্রণাকে ভুলতে চায়। কিন্তু মুমূর্ষু লিনিকে রেখে কেমন করেই বা সে যাবে। লিনি জল ছাড়া আর কিছুই খেতে পারে না। দিনের মধ্যে কয়েকবার গোল্ডমুণ্ড লিনির ছাগলটাকে বাইরে চরাতে নিয়ে যায়। সেটা তখন এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে ঘাস, জল খেয়ে নেয়। তারপর লিনির পাশে ফিরে এসে তার মুখের দিকে গভীর সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। লিনি তখনো জ্ঞান হারায় নি। কখনো ঘুমিয়ে থাকে আবার কখনো জেগে প্রলাপ বকে। চোখের পাতা দুটি সম্পূর্ণ খুলতে পারে না। সময় যত কেটে যাচ্ছে এই

তরুণী মেয়েটির চোখে মুখে প্রতি মুহূর্তে ততই বয়সের ছাপ, মৃত্যুর নিশানা জেগে উঠছে। সুন্দর কচি মুখখানির পরিবর্তে ক্রমেই জীর্ণ, শীর্ণ, শুষ্ক একটি বিশ্রী মুখ তার দেহের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে যেন। মাঝে মাঝে কেবল 'গোল্ডমুণ্ড,' 'আমার প্রিয় গোল্ডমুণ্ড,' 'কোথায় তুমি,' এমনই দু একটা অসংলগ্ন কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

সে দিন গভীর রাত্রে লিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। কোনো অভিযোগ নয়, কোনো কথা নয়। নীরবে শুধু একটি নিঃশ্বাস তার বুক থেকে বের হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। একবার একটা মৃদু শিহরণ জেগে উঠে চিরতরে স্থির হয়ে গেল তার দেহ। মৃত্যুর এই দৃশ্য গোল্ডমুণ্ডকে ক্লান্ত, বিষণ্ণ করে তুলেছে। স্তব্ধ পাথরের মত অনেকক্ষণ সে লিনির পাশে বসেছিল। কখন বাইরে বেরিয়ে এসে পাতাবাহারের পাতার স্তূপের উপর শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল গোল্ডমুণ্ড।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙ্গে গেলে শেষবারের মত কুটিরে ঢুকে মৃত লিনির মুখের দিকে একবার তাকাল সে। এভাবে তার মৃতদেহ ফেলে রেখে যেতে মন তার চাইল না কিছুতেই। শুকনো ডালপাতা জোগাড় করে এনে কুটিরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে কঞ্চির বেড়ায় ঘেরা কুটিরখানি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। বাইরে দাঁড়িয়ে সে এই অগ্নিশিখার লেলিহান নৃত্য দেখছে অপলক দৃষ্টিতে। আগুনের উত্তাপে তার চোখ মুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছে।

এবার সে ছাগলটাকে বনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে একা পথ চলতে শুরু করেছে। লিনির চিতাগ্নি থেকে একরাশ ধোঁয়া বনের মধ্যে তাকে অনুসরণ করল অনেক দূর পর্যন্ত। এমন নিরাশ, বিষণ্ণ মন নিয়ে আর কোনো দিন সে পথ চলেনি। তার জন্য পথে পথে আরও অনেক ভয়াবহ আর অভাবনীয় সব দৃশ্য অপেক্ষা করছিল। পথে যেতে যেতে কত গ্রাম, কত নগর সে অতিক্রম করল। অবাক বিস্ময়ে সে দেখল নির্মম, বীভৎস মৃত্যুর করাল ছায়া। গভীর কালো কুয়াশার একটা ঘন আস্তরণ সমস্ত দেশটাকে যেন ছেয়ে ফেলেছে। চারিদিকে শূন্য, পরিত্যক্ত বাড়ি। রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে সর্বত্র অজস্র মৃতদেহের ছড়াছড়ি। অনাথ ভিখারী ছেলেমেয়ের দল পথে পথে ঘুরছে। চারিদিক শ্মশান। মৃতের চেয়ে জীবিতদের অবস্থা আরো ভয়াবহ, মর্মান্তিক। তারা আজ সর্বহারা। কত বিচিত্র, নিদারুণ সব

কাহিনী সে শুনল। নিজেরা সংক্রামিত হবার আশঙ্কা দেখে মা-বাবাও তার সন্তানকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। কত স্বামী তাদের অসুস্থ স্ত্রীকে ফেলে রেখে উধাও হয়ে গেছে। স্বেচ্ছাসেবক এবং নার্সরাও জল্লাদের মতই ব্যবহার করছে। পরিত্যক্ত বাড়ি ঘর থেকে যে যা কিছু পাচ্ছে লুটতরাজ করে নিচ্ছে, মৃতদেহ না পুড়িয়ে যেখানে সেখানে ফেলে দিচ্ছে। বিছানা থেকে মুমূর্ষু রোগীকে টেনে এনে জীবন্ত অবস্থাতেই মৃতের গাড়ির ভেতর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মৃত্যু-ভয়ে উন্মত্ত, ক্ষীণকায় পলাতকের দল পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অন্যদের সঙ্গ সাবধানে পরিহার করে চলছে। অনেকে আবার বাঁচবার দুরন্ত আশা নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে নাচ-গান-স্ফূর্তি করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। ভবঘুরে ছন্নছাড়া গৃহহারার দল কবরখানার ফটকের সামনে, শূন্য, পরিত্যক্ত বাড়িগুলির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। প্রত্যেকেই এই ভয়াবহ সংকটের দায়িত্ব এড়াবার জন্য একে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে সান্ত্বনা পাচ্ছে মনে। সবাই ভাবছে অন্যের দোষেই তাকে এই ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। প্রত্যেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস, কিছু অভিশপ্ত, দুষ্ট প্রকৃতির বহিরাগত লোক দেশের উপর এই চরম অভিশাপ ডেকে এনেছে। তাদের অন্যায়ের জন্যই এভাবে দেশের পর দেশ ভীষণ মহামারীর কবলে পড়ে উজাড় হয়ে যাচ্ছে। গোল্ডমুণ্ড অনেক জায়গাতেই দেখল যাদের উপর একবার এই সন্দেহ হয় তারা আগে থেকে কোনো ইঙ্গিত পেয়ে সাবধান হয়ে পালাতে না পারলে আর তাদের রক্ষা নেই। উন্মত্ত জনতা আইনকে নিজেদের হাতে নিয়ে তাদের বিচার করে, হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। গরীবরা বলে ধনীরাই এই মহামারী এনেছে, আবার ধনীরা গরীবদের দায়ী করে। কারও কারও মতে ইহুদীরাই এজন্য দায়ী। গোল্ডমুণ্ড অবাক বিস্ময়ে দেখল একটি শহরে ইহুদীদের বস্তীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে উন্মত্ত জনতা চারিদিক থেকে সন্ত্রস্ত ভীত পলাতকদের ধরে এনে সেই অগ্নিকুণ্ডে ঠেলে দিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করছে। প্রত্যেক জায়গাতেই বিশৃঙ্খলা, ঘৃণা, ভয়, দুঃখ, দুর্দশা অবাধে রাজত্ব করছে আর এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে নিরপরাধীদেরই অন্যায়ভাবে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, নানাভাবে হত্যা করা হচ্ছে। গোল্ডমুণ্ড অনুভব করল এই পৃথিবীতে ন্যায়, আনন্দ, সম্মান, ভালবাসা, সুন্দর বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। মৃত্যুদূতের বাঁশী বেজে উঠেছে, মহাকালের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে চারিদিকে।

কিন্তু মরণকে গোল্ডমুণ্ড কোনোদিনই ভয় করে না। তার এই ভবঘুরে কঠোর জীবনের পথে কতবার কত ভাবে সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে। মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানুষ যুদ্ধ করতে পারে, সাবধান হতে পারে। কিন্তু মহামারীর এই নির্মম মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি মানুষের নেই। মানুষ এখানে অসহায়, পঙ্গু। তার এই লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে মানুষকে পতঙ্গের মত উড়ে এসে পড়তেই হবে। এই মৃত্যুর কাছে মানুষকে নত হতেই হবে। গোল্ডমুণ্ড বহু দিন আগেই এই মরণদেবতার পায়ে আপনাকে সমর্পণ করেছে। মৃত্যুকে সে আর একটুও ভয় পায় না, গ্রাহ্যও করে না। জীবনটা তার একেবারেই নিঃস্ব, শূন্য হয়ে গেছে। মৃত্যুর রাজ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। তবুও কি এক বিচিত্র, তীক্ষ্ণ অনুভূতি, জীবনের মোহন রূপকে প্রাণভরে দেখবার একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা এখনো তার মনের গহনে জেগে আছে।

এই ভীষণ ধ্বংসস্তূপের মাঝে বসেই সবার অলক্ষ্যে কোন্ এক মহান বিশ্বশিল্পী তাঁর সৃষ্টির কাজও করে চলেছেন একমনে, মৃত্যুর মাঝেই গেয়ে চলেছেন জীবনের জয়গান—গোল্ডমুণ্ড তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাও মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারছে। মৃত্যুপথযাত্রীর নিভে-আসা অন্তিম দৃষ্টির মধ্যে জীবনকে আঁকড়ে ধরবার ব্যর্থ প্রয়াসকে সে লক্ষ্য করেছে তার দরদী মনের সমস্ত আকুলতা ঢেলে। মরণদেবতার অবিশ্রাম রুদ্রবীণার নিদারুণ ঝঙ্কার গোল্ডমুণ্ডের সমস্ত সত্তাকে, জীবনজিজ্ঞাসাকে আরো প্রখর করে তুলেছে দিনের পর দিন।

মাস্টার নিকোলাসের কাছে গিয়ে আবার সে কাজ করতে চাইবে, এই এক আশা নিয়েই সে পথ চলেছে। কিন্তু অন্ধকারময়, বিপদসঙ্কুল এই দীর্ঘপথ আর যে ফুরাতে চায় না! অশ্রুত এক মরণ-সঙ্গীতের সম্মোহনে মোহাবিষ্ট হয়ে বিষাদ-ভরা মনে সে পথ চলেছে। পথের একপাশে একটি মঠের ভেতরে প্রবেশ করে নূতন এক প্রাচীরচিত্র দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মরণদেবতার প্রলয়নাচনকে প্রাচীরের বুকে তুলির রেখায় অমর করে রাখা হয়েছে। কতকগুলি কঙ্কাল নাচছে, এই পৃথিবীরই রাজা, বিশপ, মোহান্ত, কাউন্ট, নাইট, ভবঘুরে, লম্পট, কৃষক, দাস—সবাই ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নেচে চলেছে আর কতকগুলি কঙ্কাল নেচে নেচে তাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে অসীম শূন্যতার দিকে, গভীর অন্ধকারের দিকে। গোল্ডমুণ্ড কৌতূহলী দৃষ্টিতে প্রাচীর চিত্রটির দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কোনো অজানা

শিল্পী তার চারদিকে মৃত্যুকে যেমন দেখেছে ঠিক সেভাবেই এই প্রাচীরগাত্রে তাকে এঁকে রেখে এ কথাই যেন বোঝাতে চাইছে যে প্রত্যেক মানুষকেই একদিন মরতে হবে। কিন্তু তবুও গোল্ডমুণ্ড অন্তর থেকে যেন একে গ্রহণ করতে পারছে না। এখানে মৃত্যুর এক ভয়াবহ নগ্ন রূপকেই প্রকাশ করা হয়েছে। গোল্ডমুণ্ডের অন্তরে মৃত্যুর রূপ সম্পূর্ণ বিপরীত। মরণসঙ্গীতের রুদ্র সুর-ঝঙ্কারের মধ্যেও সে শুনতে পেয়েছে মধুর, গীতিময় অশ্রুত এক সুর-মাধুর্য। সুন্দর মোহনবেশেই মৃত্যুকে সে দেখেছে, সেই মৃত্যুর পাশে তার জীবনের ছোট্ট প্রদীপশিখাটিকে আরও সুন্দর, আরও উজ্জ্বল মনে হয়েছে তার। মৃত্যু গোল্ডমুণ্ডের কাছে মমতাময়ী মায়ের মত, মোহময়ী মানসীর মত প্রাণোচ্ছল প্রতিমারূপে দেখা দিয়ে তার রুক্ষ, শূন্য জীবনকে ভালবাসা আর মমতার উষ্ণ স্পর্শে ভরিয়ে তোলে।

আবার সে তার অন্তহীন পথে এগিয়ে চলল। তিনদিন ধরে কুড়িয়ে পাওয়া ছোট্ট শীর্ণকায় একটি চাষার ছেলেকে কাঁধে নিয়ে পথ চলল সে। শেষে বনের ধারে এক কাঠুরের স্ত্রীর হাতে ছেলেটিকে সঁপে দিয়ে রেহাই পেল। স্বামীর মৃত্যুর পর নিঃস্ব হয়ে সেই স্ত্রীলোকটিও এমন কোন একটি অবলম্বনই চাইছিল মনেপ্রাণে। মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে অন্য অনেকের মতই গোল্ডমুণ্ডও কিছুটা বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে পড়েছিল। ইহুদী তরুণী রেবেকাও হয়তো এত দিনে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গৌরবর্ণা, সুন্দরী সেই কুমারী মেয়েটির কাল চুলের রাশি আর উজ্জ্বল দুটি চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আজও তাকে বিমনা করে তোলে। পথের ধারেই তার সঙ্গে গোল্ডমুণ্ডের দেখা হয়েছিল একদিন। ছোট এক শহরের ফটকের বাইরে মাঠের মধ্যে রেবেকার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়। নিভে-আসা এক অগ্নিকুণ্ডের কাছে বসে আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে তার লম্বা কাল চুলের রাশি টেনে ছিঁড়ছিল পাগলের মত। মেয়েটির মেঘের মত চুলের অপূর্ব শোভা দেখেই সে মুগ্ধ হয়েছিল। এগিয়ে এসে তার অস্থির হাতদুটিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনার কথা শুনাল সে। তার বাবাকে অন্য আরও পনের জন ইহুদীর সঙ্গে একত্রে বেঁধে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছে। তার বাবাকে পুড়িয়ে মারবার সময় রেবেকা পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর ফিরে এসে শোকে প্রায় পাগল হয়ে কেবলই কাঁদছে। গোল্ডমুণ্ড তাকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করল। তাকে রক্ষা করবে, তার কথামত

তাকে সাহায্য করবে কথা দিল। রাত্রি হলে ওক গাছের ছোট্ট একটা ঝোপের ধারে মেয়েটির জন্য পাতার বিছানা বিছিয়ে তাকে শুতে বলে নিজে জেগে থেকে পাহারা দিতে লাগল। রেবেকা আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। গোল্ডমুণ্ডও কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নিল। তারপর সকাল হতেই নানা সান্ত্বনার কথা বলে রেবেকার মন জয় করবার চেষ্টা করল। রেবেকাকে তার ভাল লেগেছে একথাও জানাল সে। বিষণ্ন মুখে রেবেকা তার প্রতিটি কথা শুনল তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দৌড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। গোল্ডমুণ্ড তাকে ধরে ফেলে বলল, 'রেবেকা, আমি তোমার কোনো ক্ষতিই করব না। তুমি তোমার বাবার কথা ভেবে শোকাচ্ছন্ন হয়ে আছ। এখন ভালবাসার কোন কথাই তোমার ভাল লাগবে না জানি। কিন্তু আমি তোমার পাশে থেকে অপেক্ষা করব। তোমার পাশে আমাকে থাকতে দাও শুধু।'

রেবেকার কোনো পরিবর্তনই হল না। এখন মৃত্যুই তার একমাত্র কাম্য। কিছুক্ষণ পর গোল্ডমুণ্ড আবার বলল, 'শোনো লক্ষীটি, দেখতে পাচ্ছ-না চারিদিকে মৃত্যুর কি খেলা শুরু হয়েছে? এস, আমার কাছে এস। আমি তোমাকে আমার জীবন দিয়ে রক্ষা করব, আমার একান্ত আপনার করে নেব।'

কিন্তু সে বুঝতে পারল এভাবে কথা বলে, যুক্তি দিয়ে তাকে জয় করা যাবে না। আর তাই সে নীরব হয়ে অপলকদৃষ্টিতে শুধু রেবেকার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর বিদ্বেষ-ঝরা রুক্ষস্বরে রেবেকা বলল, 'তোমরা সবাই এক রকম। তোমরা খ্রীস্টানরা ছলে বলে কৌশলে নির্দোষ মানুষকে হত্যা কর। পিতাকে হত্যা করে তার কন্যাকে সাহায্যের ভান করে শেষ পর্যন্ত ভদ্রতার সমস্ত মুখোশ খুলে ফেলে কন্যাটিকে আত্মসাৎ করতে, তার সম্মান, ইজ্জত নষ্ট করতে এতটুকুও দ্বিধা কর না। এমনই দুশ্চরিত্র ও লম্পট তোমরা। প্রথমে আমি তোমাকে ভালমানুষ বলেই ভেবেছিলাম। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ ভাল হতে পারে না, সৎ হতে পারে না। তোমরা সবাই লম্পট, সবাই ইতর।'

রেবেকা যখন কথাগুলি বলছিল গোল্ডমুণ্ড তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ ঘৃণার চেয়ে আরও অনেক গভীর কিছু সেই দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে। সেই চিত্র দৃষ্টি তার সমস্ত অন্তরকে মথিত করে তুলল। রেবেকার চোখের

অতলে আবার সে মৃত্যুকেই দেখল। যে মৃত্যুকে মানুষ মনপ্রাণ দিয়ে এড়াতে চায় এ সেই মৃত্যু নয়। এ মৃত্যু চির-আকাঙ্ক্ষিত, চিরকাম্য, একান্ত প্রিয়। এ মৃত্যু স্নেহময়ী মায়ের রূপে এসে তার সন্তানকে কোলে তুলে নেয়। কোমল স্বরে গোল্ডমুণ্ড বলল, 'রেবেকা, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি হয়তো খুবই মন্দ লোক। কিন্তু আমি তোমার মঙ্গল কামনাই করেছি। তোমার এতটুকু অনিষ্ট চিন্তা আমি করি নি। আমাকে ক্ষমা কর।'

ভারাক্রান্ত মনে গোল্ডমুণ্ড রেবেকাকে ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ল একলা। অনেকদিন পর্যন্ত তার মনটা বেদনাক্লিষ্ট হয়ে রইল। কারও সঙ্গে একটি কথাও সে বলতে পারল না। এই নিঃস্ব অথচ গর্বিত ইহুদী মেয়েটি আবার তাকে লিডিয়ার কথা মনে করিয়ে দিল। কোথায় যেন এই দুজনের মধ্যে বিচিত্র একটা মিল রয়ে গেছে। এমন চরিত্রের মেয়েদের ভালবাসলে দুঃখ পেতে হয়, বিড়ম্বনাও অনেক। তবুও তার মনে হল এদের দুজনকেই যেন সে এজীবনে সবচেয়ে বেশি ভালবেসেছে। অনেকদিন পর্যন্ত সে এই ইহুদী মেয়েটিকে মনে রেখেছে। কত রাত তাকে স্বপ্ন দেখেছে। ফুলের মত অম্লান অনাঘ্রাত সেই সৌন্দর্যপ্রতিমা কি অকালে, অকারণে ঝরে যেতেই এই পৃথিবীতে এসেছে? সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যাকে কামনা করা যায়, ভালবাসা যায়, তাকে এভাবে নিষ্ঠুর, নির্মম নিয়তির হাতে ছেড়ে দেওয়া বড় বেদনাদায়ক। এ জগতে কি কোনো শক্তিই নেই, যা দিয়ে এমন নির্মল সৌন্দর্যকে রক্ষা করা যায়? হাঁ, এমন ইন্দ্রজাল তো একটাই জানা আছে তার। তার অন্তরের মণিকোঠায় এই পরম সৌন্দর্যকে যখের ধনের মত অক্ষয় করে রেখে, তার নিপুণ দুটি হাতের দরদী স্পর্শে তাকে আবার জীবন্ত করে সৃষ্টি করবে সে। আনন্দ-বেদনা-ভরা মনে সে উপলব্ধি করল তার অন্তরে যে বিশাল মূর্তিরাজ্য গড়ে উঠেছে, দীর্ঘপথ পরিক্রমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শন তার মানসপটে যে সকল মূর্তি খোদাই করে রেখেছে তাদের প্রাণবন্ত করে বাইরের জগতে মূর্ত করে তুলবে সে কবে, কোন্ দিন? সৃষ্টির আনন্দে তার শিল্পী-মনের সকল বোঝার ভার লাঘব হয়ে যাবে সে দিন। মনের মধ্যে সৃষ্টির এই ব্যাকুলতাকে আর সে চেপে রাখতে পারছে না। অস্থির মনে, চঞ্চল পায়ে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সচেতন করে সে আবার পথ চলতে লাগল। মাটি, কাদা, কাগজ, কাঠ, তুলি আর একটা শিল্পাগার তার চাই-ই চাই।

গ্রীষ্মশেষ হল। অনেকেই বলছে শরতের আগমনে অথবা শীতের প্রারম্ভে মহামারীর করাল রূপ প্রশমিত হবে। শরৎ এসেছে, কিন্তু কোথাও কোনো আনন্দ নেই, আশা নেই। শূন্য, পরিত্যক্ত জনহীন দেশের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে সে তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে আসছে। পথ যত ফুরিয়ে আসছে ততই সে অস্থির হয়ে পড়ছে, বিচিত্র এক মৃত্যুভয় তাকে গ্রাস করছে যেন। সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে তো ? শেষের কয়দিনে যদি সে মহামারীর কবলে পড়ে পথে বিপথেই মরে পড়ে থাকে ? তাহলে তো তার জীবনের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। না, না, তাকে বাঁচতেই হবে। একটিবার সেই শিল্পাগারে প্রবেশ করে কাঠের ব্লকের সামনে দাঁড়িয়ে শিল্পীর অনবদ্য সৃষ্টির কাজে আপনাকে বিলিয়ে দেবার অপার আনন্দ তাকে উপলব্ধি করতেই হবে।

তার পথ যেন আর ফুরাতে চায় না। নগরীর মোহ, নারীসঙ্গের প্রলোভন কোনো কিছুই তাকে এক রাত্রির বেশি কোথাও বেঁধে রাখতে পারে-নি। একদিন পথের ধারে একটি চার্চে ঢুকল সে। চার্চের স্তম্ভগুলির গায়ে আর কুলুঙ্গির ভেতরে পাথরে খোদাই-করা পৌরাণিক মূর্তিগুলি তাকে মেরিয়াব্রোনের মঠের স্মৃতি মনে করিয়ে দিল।

জীবনের পথে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর, অনেক ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষত বিক্ষত অন্তর নিয়ে আবার সে এদের কাছে ফিরে এসেছে একটু শান্তির পরশ পাবে বলে। তার সেদিনকার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেছে। পৌরাণিক, গম্ভীর, কঠিন এই মূর্তিগুলি কি এক অলৌকিক শক্তিবলে অভাবিতভাবে তার অন্তরকে আজ আলোড়িত করে তুলল। শ্রদ্ধাবনত হয়ে গোল্ডমুণ্ড মহান এই মূর্তিগুলির সামনে দাঁড়াল। এই পৃথিবীর কত সুখ-দুঃখের, আনন্দ-বেদনার ও জীবনমৃত্যুর প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে যুগযুগান্ত ধরে এরা এমনই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এইখানে। তার ব্যর্থ ও বিধ্বস্ত জীবনের যত বোঝা, সমস্তই সেই মুহূর্তে এদের পায়ে সমর্পণ করে দিল। নিজেকে অভিযুক্ত করল, প্রায়শ্চিত্তও করতে চাইল। সমস্ত অন্যায় ও পাপ স্বীকার করবার জন্য, আত্মশুদ্ধির জন্য একজন ধর্মযাজকের প্রয়োজন বোধ করল সে আজ। কিন্তু এই চার্চে আজ আর কেউ নেই। ভজনালয়টি আজ একেবারেই পরিত্যক্ত, শূন্য। গোল্ডমুণ্ডের পায়ের শব্দ খিলানের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। একটা শূন্য টুলের উপর হাঁটু গেড়ে বসে চোখ বুজে সে আপনমনে ক্ষীণস্বরে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করল : 'ওগো

আমার প্রিয় দেবতা, আমার ব্যর্থ জীবনের বোঝা নিয়ে আবার তোমার কাছেই ফিরে এলাম। আমি আমার যৌবনের অপব্যবহার করেছি। জীবন ও যৌবনের খুব অল্পই আমার মধ্যে অবশিষ্ট আছে এখন। আমি হত্যা করেছি, চুরি করেছি, ব্যভিচারী হয়েছি, অলস জীবন যাপন করেছি। ওগো ঈশ্বর, কেন তুমি আমাদের এমনি করে সৃষ্টি করেছ, কেন বিপথে যেতে দিচ্ছ? ওগো বিশ্বস্রষ্টা, তোমার সৃষ্টি আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে, সন্দেহের দোলায় দুলিয়েছে। পথে পথে, গৃহে গৃহে, দেশে দেশে আমি মৃত্যুর বিভীষিকা দেখেছি। আমি দেখেছি ধনীরা গরীবদের জীবন্ত দগ্ধ করে বা ত্যাগ করে পালিয়ে গেছে। মানুষে মানুষে হানাহানি করছে, নির্দোষী ইহুদীদের নৃশংসভাবে হত্যা করছে। কত নিরপরাধ সৎ লোককে অত্যাচারিত হয়ে মরতে দেখেছি আবার কত দুষ্ট বদমাশ লোককে সুখে ভোগবিলাসের মধ্যে বাঁচতে দেখেছি। তুমি কি আমাদের ত্যাগ করলে? আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছ কেন? তোমার সৃষ্টির কি কোনো মূল্যই আর নেই তোমার কাছে? এই পৃথিবীর বুক থেকে মানবজীবন লুপ্ত হয়ে যাক তাই কি তুমি চাও?'

মনের সকল বেদনা এভাবে উজাড় করে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোল্ডমুণ্ড চার্চের ফটকের মধ্য দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। আবার সে দিকে তাকিয়ে দেখল নির্বাক মহাপুরুষ ও দেবদূতেরা তার মাথার উপরে শিল্পীর নিপুণ হাতের মরমী স্পর্শে অমর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অভাগিনী রেবেকা, বেচারী লিনি, শান্ত স্নিগ্ধ সুধাময়ী লিডিয়া, মাস্টার নিকোলাস—এরাই বা কেন এদের পাশে অমর হয়ে থাকবে না? তার শিল্প চেতনার সমস্ত নিপুণতা দিয়ে, দরদ দিয়ে একদিন সে তাদের সবাইকে মূর্ত করে তুলবে। পাষাণের বুকে আবার তারা বেঁচে উঠে, এমনি করে সবার অন্তরে প্রেরণা জোগাবে, সবাইকে মুগ্ধ করবে দিনের পর দিন।

পনের

গোল্ডমুণ্ডের অবিরাম পথ-চলাও একদিন শেষ হল। তার আকাঙ্ক্ষিত শহরে প্রবেশ করল সে। আজ কত বছর হয়ে গেল, এই একই ফটক পার হয়ে মাস্টার নিকোলাসের কাছে কাজ শিখবে বলে সে এখানে এসেছিল। এবার এসে শুনল মহামারীর তাণ্ডব নৃত্য এখানেও শুরু হয়েছিল। গোল্ডমুণ্ড এসব কোনো খবরই জানত না। এখন সে ভাবল মাস্টার নিকোলাসের বাড়ি আর তার শিল্পাগারটি অটুট থেকে শহরের অন্য সব ধ্বংস হয়ে যায় তো যাক। সে এখানে পদার্পণ করবার আগেই সর্বনাশা মহামারী থেমে গেছে। নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছে আবার। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট দেখে গোল্ডমুণ্ডের মন খুশিতে ভরে উঠল। শিল্পী হবার স্বপ্ন নিয়ে এখানে এসেছে বলেই তার কেবল মনে হতে লাগল আপন ঘরেই সে ফিরে এসেছে।

গতবার সে যেমন দেখে গিয়েছিল আজও ঠিক তেমনই আছে সব, কোনো পরিবর্তন হয় নি। সেই ফটক, ক্ষীণকায়া ঝরনাধারা, প্রধান গীর্জার মোটা গম্বুজ, সেণ্ট মেরী চার্চের সুউচ্চ সূক্ষ্ম চূড়া, সেণ্ট লরেন্সের সুস্পষ্ট মধুর ঘণ্টাধ্বনি আর সেই প্রশস্ত বাজার—সবই আগের মতন রয়েছে, তারই জন্য যেন অপেক্ষা করছে সবাই।

অপরাহ্নের স্তিমিত সূর্যরশ্মির স্বর্ণাভা বাড়িঘর, সরাইখানা ইত্যাদি সব কিছুর উপরই ছড়িয়ে পড়েছে। চারিদিক আনন্দ মুখর। কিছুদিন আগেও নিষ্ঠুর মৃত্যুর করাল ছায়া পড়েছিল এই আনন্দমুখর বাড়িগুলোর ওপর। মানুষের ভীতিবিহ্বলতা চরম অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল একথা আজ বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। তোরণাকৃতি সেতুর নীচ দিয়ে চঞ্চলা নদীটি তেমনই কুলু কুলু স্বরে বয়ে চলেছে। তার নীল শীতল জল আয়নার মতই স্বচ্ছ। নদীর বাঁধান প্রাচীরের উপর বসল গোল্ডমুণ্ড।

কিছুক্ষণ পর গোল্ডমুণ্ড আবার অনেক অলি গলি পার হয়ে তার পরিচিত পথ ধরে মাস্টার নিকোলাসের বাড়ির দিকে চলল। অধীর আশায় ও আনন্দে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সম্ভব হলে আজ রাত্রেই সে মাস্টারের সঙ্গে তার কাজের বিষয় আলোচনা করবে। আর একটি মুহূর্তও অপেক্ষা করতে

চায় না সে। নিকোলাস কি এখনো তার উপর রাগ করে আছেন? না, বহুদিন আগেকার সেইসব ঘটনার কোনো অর্থই আজ আর নেই। এখন তাঁকে এবং তাঁর শিল্পাগারটিকে অক্ষত অবস্থায় পেলেই শেষ রক্ষা হয়। তার অনেক দেরি হয়ে গেছে। জীবনে হয়তো দ্বিতীয় বার আর এমন সুযোগ আসবে না এমনই ব্যস্তভাবে গোল্ডমুণ্ড তার অতি-পরিচিত সেই বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু দরজা বন্ধ দেখে চমকে উঠল। এ কি অশুভ ইঙ্গিত! আগে তো কখনো এমন হয় নি। গভীর রাত প র্যন্তএবাড়ির দরজা অবারিত থাকত। ভীত-কম্পিত মনে সে এবার সজোরে কড়া নেড়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তার হৃদ্‌স্পন্দন যেন স্থির হয়ে গেছে। বাড়ির সেই পুরানো বৃদ্ধা পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিল। মনে হল সে তাকে চিনতে পারে নি। মাস্টার নিকোলাসের কথা তাকে জিজ্ঞেস করাতে সে তার দিকে সন্দেহ-ভরা বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাল একবার। তারপর বলল 'মাস্টার? না, এখানে কেউ নেই। যাও, যাও, চলে যাও এখান থেকে।' গোল্ডমুণ্ডকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু গোল্ডমুণ্ড তার হাত চেপে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে চীৎকার করে বলল, 'দোহাই মার্গারিট, চুপ কর! আমি গোল্ডমুণ্ড। চিনতে পারছ না আমাকে? মাস্টার নিকোলাসের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে।'

'তিনি মারা গেছেন। বুঝলে? এখন পথ দেখ বাছা। তোমার সঙ্গে প্রলাপ বকবার সময় নেই আমার।'

গোল্ড়মুণ্ড দুহাতে বৃদ্ধাকে ঠেলে সরিয়ে শিল্পাগারের দিকে অন্ধকার পথ বেয়ে ছুটে চলল। মার্গারিট চীৎকার করতে করতে তার পেছনে চলেছে। শিল্পাগারের দরজা বন্ধ ছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। পাগলের মত বকতে বকতে বৃদ্ধাও তার পায়ে পায়ে ছুটে চলেছে। সিঁড়ির শেষে অলিন্দে আবছা আলোর মায়াময় পরিবেশে শিল্পীর সৃষ্ট মূর্তি-গুলি এক অপরূপ রূপকথার রাজ্য সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। গোল্ডমুণ্ড সেখানে দাঁড়িয়েই লিসবেথকে ডাকল।

ঘরের দরজা খুলে গেল। তার সামনে লিসবেথ এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটি মুহূর্ত তার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে গোল্ডমুণ্ড মনের মধ্যে এক তীব্র বেদনা অনুভব করল। আগেকার সেই গর্বিতা সুন্দরী মেয়েটির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন সে শ্রান্ত, বিবর্ণ। পরনে কালো পোশাক,

অঙ্গে একখানি অলঙ্কারও নেই। নিরাভরণা শীর্ণা মেয়েটির চোখে মুখে কেমন একটা ব্যাকুল ভাব ফুটে উঠেছে।

গোল্ডমুণ্ড বলল, 'ক্ষমা করুন। মার্গারিট আমাকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি গোল্ডমুণ্ড। আচ্ছা—সত্যিই কি আপনার বাবা আর এ জগতে নেই?'

তার দৃষ্টিতেই বুঝা গেল লিসবেথ তাকে ঠিকই চিনেছে। কিন্তু তার স্মৃতি সে মনে করতে চায় না। নির্বিকার, নিরুত্তাপ স্বরে সে বলল, 'ও, আপনিই গোল্ডমুণ্ড? বৃথাই সময় নষ্ট করেছেন। আমার বাবা মারা গেছেন।' তার স্বরে আগেকার মত অহঙ্কারের রেশ বেজে উঠল।

'কিন্তু তাঁর শিল্পাগারটি আছে তো?'

'শিল্পাগার? না, বন্ধ হয়ে গেছে। আপনার কাজের প্রয়োজন হলে অন্যত্র যেতে পারেন।'

'না, আমি আপনার কাছে কাজের জন্য আসি নি। আপনাদের দুজনকে আমার অভিনন্দন জানাতে এসেছিলাম। আপনার শোকের গভীরতা আমি বুঝতে পারছি: আপনার বাবার এই চিরকৃতজ্ঞ সহকারীটি যদি আপনার কোনো কাজে লাগতে পারে তাহলে সে নিজেকে ধন্য মনে করবে।'

দরজার ওপাশে আবছা অন্ধকারের দিকে সরে যেতে যেতে লিসবেথ বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। তাঁর বা আমার কোনো উপকারেই আপনি লাগবেন না আর। যান, মার্গারিট আপনাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে।'

ধীর পায়ে সে আবার নদীতীরে এসে জলের একেবারে কাছটিতে বসল প্রাচীরের গায়ে হেলান দিয়ে। সূর্য অস্ত গেছে, নদীর বুক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে, প্রাচীরের পাথর বরফের মত শীতল মনে হচ্ছে। পথ নির্জন, নীরব। একটি ঘণ্টা কেটে গেল। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এল পৃথিবীর বুকে। সকল বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে অঝোর ধারায় তার কান্না ঝরে পড়তে লাগল। গোল্ডমুণ্ড মাস্টার নিকোলাসের কথা ভেবে কাঁদল। লিসবেথের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে বলে কাঁদল। লিনির জন্য, ইহুদী মেয়ে রেবেকার জন্য, ভিক্টরের জন্য আর তার নিজের জীবনের ব্যর্থতা এবং শূন্যতার জন্যও প্রাণভরে কাঁদল সে।

রাত্রি গভীর হলে সরাইখানার একটি বেঞ্চের উপর ঘুমিয়ে নিয়ে ভোরবেলা আবার সে পথে বেরিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্যহীনভাবে গোল্ডমুণ্ড ঘুরছে

আর ভাবছে। সহসা সে অনুভব করল, কিছুক্ষণ আগেও কি কারণে তার মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল, অনেক কষ্ট করেও এখন তা মনে করতে পারছে না। সে ভাবল : এমনই হয়। মানুষের গভীর বেদনাও একদিন ম্লান হয়ে যায়। মানুষের জীবনে ব্যথা বেদনা দুঃখ সবই একান্ত ক্ষণস্থায়ী।

সহসা তারই পাশে লজ্জানম্র, আন্তরিকতা-ভরা স্বর শুনতে পেল গোল্ডমুণ্ড।

'গোল্ডমুণ্ড!' কোমল, মৃদুস্বরের ডাক শুনে সে ফিরে দেখল একটি শান্ত মেয়ে তার নাম ধরে ডাকছে। তার চোখ দুটি বড় সুন্দর। গোল্ডমুণ্ড তাকে চিনতে পারল না। মেয়েটি আবার মৃদু, লজ্জিতস্বরে প্রশ্ন করল, 'গোল্ডমুণ্ড, কবে ফিরে এলে? আমাকে চিনতে পারছ না? আমি মেরী।' কিন্তু তখনও সে তাকে মনে করতে পারল না। মেয়েটিকে বলতে হল, মেছোবাজারে যার বাড়িতে সে থাকত সেই বাড়িওয়ালারই মেয়ে সে।

এখন সে মনে করতে পারছে। হ্যাঁ, এই তো সেই মেরী। ছোট্ট, শীর্ণ চেহারার মেয়েটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত। কত শান্ত আর বিনীত ব্যবহার ছিল তার। তার চলে যাবার দিন খুব ভোরে সে একবাটি দুধ তার জন্য গরম করে এনেছিল। সেদিনকার সেই কিশোরী আজ পূর্ণ যুবতী। চোখদুটি তার তেমনই শান্ত, সুন্দর। কিন্তু এখনো তেমনি খুঁড়িয়ে চলে মেয়েটি। গোল্ডমুণ্ড এবার তার হাতখানি ধরল। এই শহরে এখনো এমন একজন রয়েছে যে তাকে মনে রেখেছে, একথা ভাবতেই ভাল লাগল তার। গোল্ডমুণ্ড যেতে না চাইলেও মেরী তাকে একরকম জোর করেই তাদের বাড়িতে নিয়ে এল। বসবার ঘরের দেওয়ালে তখনো তার আঁকা ছবিটি টাঙানো রয়েছে। মেয়েটির মা বাবা তাকে আরো কয়েকদিন থাকবার জন্য অনুরোধ জানাল। তারা সবাই তাকে দেখে খুব খুশি হয়েছে। মাস্টার নিকোলাসের খবর তাদের মুখেও শুনলো গোল্ডমুণ্ড। মাস্টার নিকোলাস নাকি মহামারীতে আক্রান্ত হননি। লিসবেথই আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। আর তাঁকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ সেবাযত্ন করে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনায় মাস্টার তার মেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হবার আগেই হঠাৎ একদিন চোখ বুজলেন। লিসবেথের জীবন রক্ষা হল কিন্তু সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেল চিরতরে।

মেরীর বাবা বললেন, 'এখন শিল্পাগারটি শূন্য পড়ে আছে। সত্যিকারের একজন গুণী কারিগরের পক্ষে এটা সত্যিই লোভনীয়। ঐশ্বর্যও তো প্রচুর। একবার ভেবে দেখ গোল্ডমুণ্ড। লিসবেথ এখন আর 'না' বলবে না হয়ত ?'

মহামারীর সময়কার কথাও সব শুনল গোল্ডমুণ্ড। কিছুদিনের জন্য দেশে আইন, শৃঙ্খলা, শান্তি, কিছুই ছিল না। বিশপ এবং তার সঙ্গীরা পালিয়ে যাবার পর অবস্থা আরও শোচনীয় হল। কিন্তু সম্রাট তখন নগরীর উপকণ্ঠে ছিলেন বলেই তার সেনাপতি কাউন্ট হেনরিককে অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্য পাঠালেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কাউন্ট তার সেনাদলের সাহায্যে কয়েকদিনের মধ্যেই নগরীতে শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনল। তারপর গোল্ডমুণ্ডের কাছ থেকেও তারা তার ভ্রমণের কাহিনী ও অভিজ্ঞতা শুনতে চাইল।

গোল্ডমুণ্ড বলল, 'ভাষা দিয়ে সে সব কথা কি বোঝাব! দিনের পর দিন পথ চলেছি। প্রত্যেক জায়গায় মহামারীর বীভৎস লীলা দেখেছি। মৃত্যুর মধ্য থেকে আমি অক্ষত দেহেই বেরিয়ে এসেছি। এখানে মাস্টার নিকোলাসকে খুঁজতে এসে দেখছি তিনিও আর নেই। এখন আমি বড় ক্লান্ত। কয়েকটা দিন একটু বিশ্রাম করতে চাই। তারপর আবার পথে বেরিয়ে পড়ব।' জীবনের যে অধ্যায়কে সে এখানে অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিল তারই স্মৃতি রোমন্থন করে, মেরীর নীরব সেবা যত্ন ও আন্তরিক ভালবাসার স্পর্শ পেয়ে তার ক্লান্ত, বিষণ্ন মন একটু শান্ত হল। মূর্তি গড়ার অদম্য প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষা তাকে কি এক অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে যেন। অজ্ঞাত, অখ্যাত থেকেও সে এখানে বাকি জীবন কাজ করে কাটিয়ে দিতে চায়।

দু দিন দু রাত্রি গোল্ডমুণ্ড কেবলই ছবি আঁকল। আঁকবার জন্য মেরী তাকে কাগজ, পেন্সিল এনে দিয়েছে। ঘরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে নানা বিচিত্র প্রতিকৃতি এঁকে কাগজ ভরিয়ে ফেলল। লিনির মুখাবয়ব সে বারে বারে নানা ভঙ্গিতে আঁকল। ভবঘুরে বদমাশ লোকটাকে হত্যা করতে দেখে অব্যক্ত এক বিজয়োল্লাস ফুটে উঠতে দেখেছিল যে মুখখানিতে, গোল্ডমুণ্ড তাকেই মূর্ত করে তুলল কাগজের বুকে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নূতন করে বাঁচবার ইচ্ছা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে নিষ্প্রভ মুখখানিতে, গোল্ডমুণ্ডের মরমী হাতের স্পর্শে তাও আবার বেঁচে উঠল।

ঘরের চৌকাঠের ওপর একটি ছোট ছেলে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, হাত দুটো মুঠো করে তার মা বাবার দিকে ছুটে যেতে যেতে অব্যক্ত মৃত্যুযন্ত্রণায় সেখানেই লুটিয়ে পড়েছে—বিচিত্র এই মৃত্যুদৃশ্যের ছবিও সে আঁকল। তার অতীত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মন্থন করে একের পর এক ছবি আঁকতে লাগল সে। মালগাড়িতে স্তূপীকৃত মৃতদেহ নিয়ে তিনটি ক্লান্ত, নিস্তেজ ঘোড়া ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে, তাদের পাশে পাশে লম্বা কাষ্ঠখণ্ড হাতে নিয়ে মজুরেরাও চলেছে। ইহুদী কুমারী রেবেকা ত্রস্ত হরিণীর মত ছুটে চলেছে, তার দৃষ্টিতে আগুন ঝরছে। সমস্ত কিছুর ওপরে বিদ্বেষভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু তার নির্মল, কোমল দেহখানি বুঝি কেবল ভালবাসার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। গোল্ডমুণ্ড নিজের ছবিও আঁকল। পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে গৃহহারা, ছন্নছাড়া এক প্রেমিক; অস্থির, চঞ্চল এক পলাতক শিশু। মৃত্যু যেন তাকে অবিরাম অনুসরণ করছে। অসীম আগ্রহভরে কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে এবার সে তার নিপুণ হাতে রেখার অঙ্কনে লিসবেথের সুন্দর, গর্বিত দেহখানিকে জীবন্ত করে তুলল। বৃদ্ধা মার্গারিটের বিকৃত, কুঞ্চিত মুখ আর মাস্টার নিকোলাসের অভিজাত দেহাবয়ব, তার সবল রেখার বন্ধনে অমর হয়ে রইল। তারপর সে অস্পষ্ট, অনিশ্চিত কয়েকটি রেখার ইঙ্গিতে একটি মেয়ের প্রতিমূর্তি আঁকল, দুটি হাত একত্র করে কোলের উপর রেখে বসে রয়েছে সে, আনত চোখে ম্লান হাসির ছটা। পৃথিবীর মাতৃমূর্তির প্রতীক যেন এই আনত, ম্লানমুখী মেয়েটি।

গোল্ডমুণ্ডের ভেতরকার এই শিল্পচেতনা, সৃষ্টি করবার এই অপূর্ব ক্ষমতাই তাকে সত্যিকারের সান্ত্বনা ও শান্তি দিচ্ছে। শেষে মেরীর সুন্দর দুটি চোখ, নির্লিপ্ত ঠোঁট দুখানি, তার হাতের পরশে নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠল কাগজের বুকে। এই ছবিখানি সে মেরীকেই উপহার দিল। আঁকতে আঁকতে সে তার দুঃখ, বেদনা, পরিবেশ নিঃশেষে ভুলে ছিল। একটি টেবিল, সাদা কাগজ, পেন্সিল আর একটি উজ্জ্বল দীপাধার—এ কয়দিন এই নিয়েই ছিল তার পৃথিবী। আঁকা শেষ হয়ে গেলে সহসা যেন একটা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে গোল্ডমুণ্ড আবার বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হল। হঠাৎ তার মনে পড়ল তার শিল্পগুরু আর এ জগতে নেই। আবার তাকে পথে বের হতে হবে। পথের রুক্ষ, অনিশ্চিত জীবনকে বরণ করতে হবে। এখান থেকে বিদায় নেবার আগে সে উদ্দেশ্যহীনভাবে

শহরে ঘোরাফেরা করতে লাগল। বিচিত্র এক বিরহব্যথায় তার মন ভরে উঠেছে।

একদিন এভাবে হাঁটতে হাঁটতে একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া অশ্বারোহিণী মেয়েকে দেখা মাত্রই সে চঞ্চল হয়ে উঠল। মেয়েটি অপরূপ লাবণ্যময়ী। তার স্বর্ণাভ কোমল কেশগুচ্ছ, জিজ্ঞাসু, নীল, নিস্তরঙ্গ দুটি চোখের গভীর দৃষ্টি আর অপূর্ব সোনার কান্তি গোল্ডমুণ্ডকে বিমুগ্ধ করে দিল। লাস্যময়ী মেয়েটির যৌবনোচ্ছল মুখখানির উপর গোল্ডমুণ্ডের মুগ্ধ দৃষ্টি পলক হারা হয়ে রইল অনেকক্ষণ। সম্রাজ্ঞীর মত গর্বিত ভঙ্গিতে ঘোড়ার উপর বসে মেয়েটি চারদিকে অবজ্ঞা-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। সবাইকে শাসন করবার স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতা যেন তার একান্তই প্রকৃতিগত। যৌবনমদমত্তা এই মেয়েটির বিলোল দৃষ্টি আর স্ফুরিত অধরোষ্ঠ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় রূপ-রস-গন্ধ-ভরা এই জীবন ও যৌবনের যা কিছু উপভোগ্য সবই সে অকৃপণ হস্তে গ্রহণ করতে চায়। তার তৃষিত সুন্দর ওষ্ঠাধরে অব্যক্ত ইন্দ্রিয়াসক্তির ইঙ্গিত। তাকে দেখামাত্রই গোল্ডমুণ্ড তার প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করল। সহসা এই যৌবন-দীপ্তা মেয়েটিকে একান্ত করে লাভ করবার জন্য তার মনে তীব্র কামনার আগুন জ্বলে উঠল। এই অপরূপ রূপসীকে জয় করা সত্যিই গৌরবের। গোল্ডমুণ্ডের মনে হল মেয়েটি তার অপূর্ব দেহ সৌষ্ঠব, অপার জীবনীশক্তি আর উচ্ছল যৌবনধর্মে তারই সমকক্ষ। মেয়েটির সম্বন্ধে সে তখনই খবর নিয়ে জানতে পারল সে কাউন্টের প্রণয়িনী, নাম এনিস, বিশপের প্রাসাদে তারা বাস করছে।

একটি ঝরনাধারার সামনে এসে আনত হয়ে সেই জলের ছায়ায় সে আপন প্রতিবিম্ব দেখতে লাগল মন দিয়ে। স্বচ্ছ জলের বুকে যে মুখখানি প্রতিফলিত হয়েছে তারও সৌন্দর্য কিছু কম নয়। কিন্তু অযত্নে, অবহেলায় ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতই তা ম্লান। এক ঘণ্টার মধ্যেই সে চুল দাড়ি কেটে পরিষ্কার হয়ে, নিজেকে সযতনে সাজিয়ে নিল।

অশ্বারোহিণী এনিস প্রাসাদ থেকে বের হয়েই সেদিন ফটকের একপাশে একটি সুন্দরকান্তি আগন্তুককে একাগ্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে দেখল। স্বর্ণকারের দোকান থেকে বেরিয়েও এনিস গোল্ডমুণ্ডকে দেখতে পেয়ে তার গভীর নীল দুটি চোখের শাণিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল তার ওপর।

পরদিন ভোরেই আবার এনিসের সঙ্গে গোল্ডমুণ্ডের দেখা। পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার চোখে মুখে বিজয়িনীর ভাব ফুটে উঠল, তার বিলোল দৃষ্টি গোল্ডমুণ্ডকে যুদ্ধে আহ্বান করল যেন। এনিসের সঙ্গে এবারে সে কাউন্টকেও দেখল। রাজোচিত, সুদর্শন কাউন্টকে সহসা তার জীবনের চরম শত্রু বলে মনে হল। কাউন্টের চুলে ধূসর ছায়া পড়েছে, চোখের কোলে বলি রেখা। তবুও সে তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই মনে হল।

তৃতীয় দিন সকাল বেলা এনিস ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদের আঙ্গিনা পার হয়ে বাইরে গোল্ডমুণ্ডকে দেখতে পেয়ে চঞ্চল দৃষ্টিতে একবার তার দিকে তাকাল। তারপর ধীর কদমে এগিয়ে চলল সেতুর দিকে। একটা চার্চের সামনে ঘোড়া থামিয়ে গোল্ডমুণ্ডের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সে। প্রায় আধ ঘণ্টা সেখানে অপেক্ষা করবার পর দেখতে পেল গোল্ডমুণ্ড ধীর, স্থির গতিতে তারই দিকে এগিয়ে আসছে লাল ফুলের একটি গুচ্ছ দাঁতের মাঝখানে চেপে ধরে স্মিত হাস্যে, সহজ ভঙ্গিতে। এনিস এবার ঘোড়া থেকে নেমে চার্চের উঁচু প্রাচীরে লতানো আইভিলতার গায়ে হেলান দিয়ে তার অনুগামী ভক্তটির দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। গোল্ডমুণ্ড নির্ভীক-ভাবে মৃদু হেসে অভিবাদন জানাল তাকে। এনিস প্রশ্ন করল, 'আমাকে এভাবে অনুসরণ করছ কেন? কি চাও তুমি?'

'আমি তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই। আমি নিজেকেই দিতে চাই তোমাকে। গ্রহণ করে আমাকে ধন্য কর তুমি। তারপর তোমার যা খুশি কর।'

'বেশ। তবে তুমি আমার কোন্ কাজে লাগবে তাও ভেবে দেখতে হবে। যদি ভেবে থাক ফুল তুলতে এসে কাঁটার আঘাত সহ্য করবে না তাহলে ভুল করেছ। আমার জন্য জীবনকেও যে তুচ্ছ করতে পারবে তাকেই আমি ভালবাসব।'

'আমার জীবন তোমাকেই সঁপে দিলাম। এখন তোমার যা খুশি করতে পার।'

এনিস তার গলা থেকে এক গাছি সরু সোনার হার খুলে হাতে রাখল।

'নাম কি তোমার?'

'গোল্ডমুণ্ড!'

'গোল্ডমুণ্ড! বাঃ, বেশ সুন্দর নামটি তো! শোন, সন্ধ্যা হলে এই সোনার হারটি হাতে নিয়ে প্রাসাদে এসে বলবে এটাকে তুমি কুড়িয়ে পেয়েছ। হাত ছাড়া করবে না কিন্তু। তোমার হাত থেকেই আবার আমি ওটা নেব! আমার খাস পরিচারিকা বার্থা বা পরিচারক ম্যাক্সকে খুঁজে বের করে বলবে আমার কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে। অন্য সবাইকে বিশেষ করে কাউন্টকে সাবধানে এড়িয়ে চলবে। তারা সকলেই তোমার পরম শত্রু এ কথা ভুলো না। শেষ পর্যন্ত তোমার জীবনও বিপন্ন হতে পারে তা মনে রেখো।' এনিস তার সুন্দর হাতখানি তার দিকে এগিয়ে ধরলে গোল্ডমুণ্ড মৃদু হেসে হাতখানিকে নিজের গালের উপর কিছুক্ষণ চেপে ধরে রেখে সন্তর্পণে তার উপর একটি কোমল চুম্বন-স্পর্শ বুলিয়ে দিল।

সোনার হারগাছি পকেটে রেখে গোল্ডমুণ্ড আবার চলতে শুরু করল। কিছুদিন আগেও গোল্ডমুণ্ড ভেবেছে মানুষের জীবনের সকল দুঃখ-বেদনা-শোকও একদিন মুছে যায়। তারও আজ তাই হয়েছে। ঝরা পাতার মতই তারা তার জীবন থেকে ঝরে গেছে যেন। স্বপ্নেও সে ভাবতে পারে নি, এমন একটি যৌবনদীপ্ত রূপসী মেয়ের নীল চোখের অতলে তারই জন্য এমন অফুরন্ত ভালবাসা লুকিয়ে আছে। মেয়েটির অনুপম সৌন্দর্য আর উচ্ছল গীতিময় যৌবন আবার তার মায়ের স্মৃতিই জাগিয়ে দিয়েছে তার মনে। দুদিন আগেও সে ভাবতে পারে নি এই পৃথিবী আবার তার চোখে অপরূপ হয়ে দেখা দেবে। তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আবার কামনার আগুন জ্বলে উঠবে। যৌবনের আনন্দ আবেগ এমনি করে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এখনো সে বেঁচে আছে, তার জীবন যৌবন কিছুই তাকে ত্যাগ করে যায় নি, একথা ভাবতেও কত ভাল লাগে, কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে তার সর্বাঙ্গ। গত কয়েক মাসের তিক্ত অভিজ্ঞতা, মৃত্যুর সেই বিভীষিকা আজ আর তার জীবনকে অধিকার করে নেই।

গোল্ডমুণ্ড সেদিন সন্ধ্যাবেলা লুকিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করল। প্রাসাদের বিরাট আঙ্গিনা তখন বিচিত্র কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে। গোল্ডমুণ্ড উপরে যাবার চেষ্টা করতেই একজন দ্বাররক্ষী তাকে বাধা দিল। সোনার হারটি তাকে দেখিয়ে সে এনিসের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে রক্ষীটি তাকে এক সহিসের জিম্বায় ছেড়ে দিল। সহিসটি তাকে এক বিরাট অলিন্দে দাঁড় করিয়ে রেখে কোথায় চলে গেল। একটু পরে একটি মেয়ে চঞ্চল পায়ে

তার পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে বলল, 'আপনিই কি গোল্ডমুণ্ড?' —তাকে অনুসরণ করবার ইঙ্গিত করে সে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে চলল। কিছুদূর গিয়ে একটি ছোট্ট ঘরে প্রবেশ করল তারা। ঘরখানির হাওয়ায় মৃদু মধুর সুবাস। চারদিকে বিচিত্র, সুন্দর কত পোশাক পরিচ্ছদ, সাজান রয়েছে। গোল্ডমুণ্ড এখানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর হঠাৎ একসময় ভেতরের একটি দরজা খুলে আকাশী রঙের অপূর্ব পোশাক পরে এনিস ঘরে ঢুকল। ধীর পায়ে সে প্রতীক্ষারত গোল্ডমুণ্ডের কাছে এগিয়ে এসে তার গভীর নীল দুটি চোখের তীক্ষ্ণ, একাগ্র দৃষ্টি তুলে ধরে মৃদু, ক্ষীণ স্বরে বলল, 'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছ? যাক, এখন আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। চার্চের কয়েকজন ধর্মাচার্য কি এক দৌত্যকার্যে কাউন্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কাউন্ট তাদের সঙ্গে বসে আহার করবেন। তারপর তাদের আলাপ-আলোচনা হবে। তাই অন্ততঃ একটি ঘণ্টা সময় আমরা পাব।'

গোল্ডমুণ্ডকে নিয়ে এনিস এবার সাজঘর থেকে শোবার ঘরে ঢুকল। মোমের স্নিগ্ধ আলোর ধারায় আলোকিত শোবার ঘরে একটি টেবিলের উপর খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তারা দুজনে খেতে বসল। এনিস আপন হাতে গোল্ডমুণ্ডের কেকের উপরে মাখন মাখিয়ে দিল, নীল রঙের সুন্দর একটি গ্লাসে স্বর্ণাভ সুরা ঢেলে তার মুখের কাছে ধরল। কখন দুজন দুজনের হাত জড়িয়ে ধরে পরস্পরের স্পর্শের মধুর অনুভূতিকে উপভোগ করতে লাগল তারা।

প্রাঙ্গণের শেষ প্রান্তে গাছের ফাঁকে আকাশের কোলে ঢলে-পড়া বাঁকা চাঁদটি দেখা যাচ্ছে। তারা দুজন বিশ্ব সংসারের সবকিছু ভুলে একান্ত নিজস্ব এক কল্পলোকে মধুর স্বপ্নাবেশে মগ্ন হয়ে আছে। ভাষার অতীত এক গভীর অনুভূতি নিবিড় করে তুলল তাদের পরিবেশ। এনিসের এলায়িত দেহখানি গোল্ডমুণ্ডের বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চিত্রার্পিতের মত স্থির হয়ে আছে। তার গভীর, নীল দুটি চোখে আগেকার কঠিন, নির্লিপ্ত ভাব আর নেই। বিলোল দৃষ্টির অপরূপ লাবণ্য তাকে আরো মোহময়ী করে তুলেছে। গভীর আবেগে উদ্বেল দুটি হৃদয় ভাষা হারা সেই মদির রাতে পূর্ণ মিলনানন্দে অমৃতের আস্বাদ জানল। নিবিড় আবেশে চোখ বুজে এনিস তার সুন্দর দেহখানি বিছানায় এলিয়ে দিয়ে শুয়ে রইল, গোল্ডমুণ্ড নীরবে উঠে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। এনিসের মুখের কাছে

আনত হয়ে মৃদু, কোমল স্বরে বলল, 'আমাকে এখন যেতে হবে এনি।' এনিস নীরব, নিথর। কোমল গাত্রাবরণটি দেহের ওপর টেনে দিয়ে তার মুদ্রিত চোখদুটির উপর তপ্ত চুম্বনস্পর্শ বুলিয়ে দিল গোল্ডমুণ্ড।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবেগজড়িত স্বরে এনিস বলল এবার, 'গোল্ডমুণ্ড, সত্যিই চলে যাবে? আবার কাল এসো।'

ঘণ্টা বাজাতেই পরিচারিকা বার্থা সাজঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে গোল্ডমুণ্ডকে পথ দেখিয়ে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে চলল। বার্থাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দেবার সাধ হল তার। এক মুহূর্তের জন্য নিজের দারিদ্র্য তাকে লজ্জা দিল।

সেদিন গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে ঘরের জানলার দিকে তাকিয়ে সে ভাবল এত রাত্রে নিশ্চয়ই কেউ জেগে নেই। তাকে পার্কের মধ্যেই শুতে হবে। কিন্তু সহসা অবাক হয়ে দেখল বাড়ির দরজা খোলাই রয়েছে। ধীর পায়ে বাড়িতে ঢুকে সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিল। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখল রান্নাঘরে আলো জ্বলছে আর মেরী টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে তন্দ্রায় ঢুলছে। মেরী তাহলে তারই জন্য অপেক্ষা করছে! গোল্ডমুণ্ডের পায়ের শব্দ শুনে মেরী চোখ তুলে তার দিকে তাকাল।

'মেরী, এখনও জেগে আছ?'

'হাঁ।'

'তোমাকে এতরাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল বলে বিশেষ দুঃখিত আমি। রাগ কোরো না, মেরী।'

'না, তোমার ওপরে কোনোদিনই আমি রাগ করি নি গোল্ডমুণ্ড। আমি শুধু দুঃখ পাই।'

'দুঃখ? কেন?'

'ওঃ গোল্ডমুণ্ড, আমি যদি সুস্থ, সবল, সুন্দর হতাম তাহলে তুমি আর এমনি করে রাত্রিবেলা অজানা, অচেনা জায়গায় যেতে না। আমারই কাছে থাকতে। তখন হয়তো-বা আমাকে একটু দয়া করতে, ভালও বাসতে।' মেরীর স্বরে আশা, নিরাশা, তিক্ততা—কিছুই ফুটে উঠল না। কেবল দুঃখ আর বেদনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ঝরে পড়ল। গোল্ডমুণ্ড হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেমন এক অসোয়াস্তিতে তার মন ভরে গেল। উত্তর দেবার কোনো ভাষা খুঁজে পেল না সে। মেরীর চুলের উপর শান্ত, কোমল স্পর্শ

বুলিয়ে দিলে সে নীরবে থরথর করে কেঁপে উঠল। কয়েক ফোঁটা তপ্ত চোখের জল ঝরে পড়ল তার সুন্দর দুটি চোখের কোল বেয়ে। চোখ মুছে নিয়ে লজ্জানম্র স্বরে মেরী বলল, 'শুতে যাও গোল্ডমুণ্ড। কত-কি আবোল তাবোল বললাম, ক্ষমা কোরো। বড় ঘুম পাচ্ছে। তোমায় শুভরাত্রি জানাই।'

পরদিন সকালবেলা কারও সঙ্গে গোল্ডমুণ্ডের কথা বলতে ইচ্ছা করল না। শরতের এই উজ্জ্বল দিনটি বনে জঙ্গলে পাহাড়ে গিয়ে গাছপালা আর আকাশের মেঘের সঙ্গে মিতালি করে কাটিয়ে আসতে ইচ্ছা হল তার। সেদিনও বাড়ি ফিরতে রাত হবে, মেরীকে একথা জানিয়ে কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল তখনই।

নদী পার হয়ে শূন্য দ্রাক্ষাকুঞ্জের মধ্যে দিয়ে খাড়া পাহাড়ের গায়ে পায়ে-চলার পথটি ধরে উপরে উঠতে লাগল গোল্ডমুণ্ড। নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে অবিশ্রান্ত চলবার পর পাহাড়ের চূড়ায় উঠল সে। অবারিত সূর্যের প্রখর আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে তখন। অনেক নীচে আঁকা বাঁকা নীল নদীটি তর তর করে বয়ে চলেছে আর তারই কোলে শহরটিকে ছোট্ট সুন্দর একটি খেলনার মত মনে হচ্ছে।

পাহাড়ের চূড়ায় একটা ঢিবির গায়ে হেলান দিয়ে হাত-পা ছড়িয়েশরতের শুকনো খসখসে ঘাসের উপর সে শুয়ে পড়ল। এখান থেকেই সে নিচে প্রশস্ত উপত্যকার সবকিছুই ছবির মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। নদীর ওপারে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে অজস্র উত্তুঙ্গ পাহাড়ের সারি এক কুহেলিকাময় রহস্য-লোকের সৃষ্টি করেছে। দূর দূরান্তের ঐসব নিবিড় অরণ্যের কোলে কত রাত্রি সে ঘুমিয়েছে, বেরিফল খেয়ে ক্ষুধা মিটিয়েছে, পাহাড়ের বন্ধুর পথে চলতে চলতে পরিশ্রান্ত হয়ে বরফে জমে গেছে কতবার; সুখে দুঃখে, হাসি কান্নায়, আনন্দ বেদনায়, কখনো ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে, কখনো বা নূতন প্রেরণা ও উৎসাহ বুকে নিয়ে অবিরাম পথ পরিক্রমা করেছে সে। কত দেশ-দেশান্তর, বিস্তৃত প্রান্তর, নিবিড় অরণ্যাণী, গ্রাম, শহর, মঠ—আর তার জীবনের পথে আসা কত বিচিত্র মানুষ, তার মধ্যে চিরন্তন হয়ে বেঁচে আছে। তাদেরই কয়েকটিকে সার্থক রূপদান করে, অমর করে সবার চোখের সামনে তুলে ধরতে পারবে কি সে কোনোদিন? হয়তো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এমনি করে নূতন দেশে নূতন নগরে নূতন মানুষের সংস্পর্শে

নিত্য-নূতন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অন্তরের বেদনা-চঞ্চল অনুভূতির মাধুর্য অনুভব করে করেই অকারণ ব্যর্থ দিনগুলি তার খসে পড়বে একে একে।

নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে আনমনে সে বিশপের রাজোচিত প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে ভাবল ওখানেই তো কাউন্ট হেনরিক তার সভাসদদের নিয়ে ধর্মাচার্যদের সঙ্গে আলোচনা-সভা জমিয়েছেন। ঐ প্রাসাদেরই অন্দর মহলে রানীর চেয়েও সুন্দরী, মহিমময়ী এনিস তারই জন্য প্রতীক্ষা করছে। গতরাত্রির মধুর স্মৃতি তাকে আবার স্বপ্নবিহ্বল করে তুলল। একলা পথে ঘুরে ঘুরে জীবনের প্রতি, ভোগের প্রতি তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তার অন্তরের সুপ্ত সৃষ্টি-পরিকল্পনা আর কল্পলোকের সেই শিল্প-চেতনাই এনিসকে এমনভাবে ভালবাসতে শিখিয়েছে তাকে। তার যৌবনোদ্যানে যতদিন এনিসের মত এমন অনুপম সুন্দর ফুল ফুটবে ততদিন অনুতাপ করবার, অভিযোগ করবার কিছু নেই তার।

সারাদিন সে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ঘুরল। কখনো হাঁটল, কখনো বসে রইল। এনিসের সঙ্গে সেই রাত্রির মধুর স্মৃতির ভাবনায় আবেশভরা কত মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর সূর্য ডুবলে আবার শহরে নেমে এসে প্রাসাদের সামনে দাঁড়াল। সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। চারদিকের বাড়িগুলিতে আলো জ্বলে উঠেছে। গোল্ডমুণ্ড কিছুক্ষণ প্রাসাদের বাইরে পায়চারি করল। ধর্মাচার্যরা তখনও বোধ-হয় কাউন্টের সঙ্গে আলোচনা করছে। সভাঘরের একটি উঁচু জানলার ধারে একজন ফাদার নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাইরের দিকে তাকিয়ে। গোল্ডমুণ্ড ধীর পায়ে ফটকের মধ্যে ঢুকে গেল। একটু এগিয়ে যেতেই প্রধান পরিচারিকা বার্থা এসে তাকে সেই ছোট্ট সাজঘরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেল। এবারে এনিস তাকে নিয়ে তার শোবার ঘরে ঢুকল। এনিসের অম্লান সৌন্দর্য তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেও তাকে আজ কেমন বিষণ্ণ, চিন্তিত মনে হল। ধীরে ধীরে গোল্ডমুণ্ডের প্রাণঢালা আদর সোহাগের যাদু স্পর্শে এনিস আবার তার উচ্ছল প্রাণধারাকে ফিরে পেল, প্রেমময়ী হয়ে উঠল। সোহাগ-ভরা কোমল স্বরে এনিস তাকে বলল, 'তুমি কি শান্ত, কি সুন্দর গোল্ডমুণ্ড! তোমার স্বরে সঙ্গীত ঝরে পড়ে। তোমাকে বড় ভাল লাগে। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে চাই না আমি। এখানে থাকার দিন ফুরিয়েও এসেছে। সম্রাট কাউন্টকে ডেকে পাঠিয়েছেন। গোল্ডমুণ্ড, কাউন্ট যেন তোমাকে

দেখতে না পায়। আজ বেশিক্ষণ থেকো না লক্ষ্মী। আমার কেমন ভয় করছে।'

বিস্মৃতির অতল থেকে আর-একটি হারিয়ে যাওয়া এমনি ভালবাসা-মাখা স্বর তার স্মৃতিতে ভেসে এল। অতীতে লিডিয়াও তাকে এমনিই কোমল, শঙ্কিত ও বিষাদ ভরা স্বরে কত কথাই না বলেছে। ভালবাসায় মন প্রাণ ভরে ভীত-শঙ্কিত চরণে রাতের অন্ধকারে কত সন্তর্পণে অভিসারে এসেছে। ভালবাসার এই কোমল রূপ তার বড় ভাল লাগে। গোপনতা আর আশঙ্কা না থাকলে ভালবাসার কোনো মূল্যই থাকে না। প্রেমের পথ এমনই কাঁটা-ভরা। ভালবাসলে বিপদকে বরণ করে নিতেই হবে। সবল বাহুর বন্ধনে ধীরে ধীরে এনিসকে সে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল, আদর করল। তার চোখে মুখে অজস্র চুম্বন-স্পর্শ বুলিয়ে দিল। এনিসকে আজ তার বড় ভাল লাগছে। কিন্তু এনিস অন্তর থেকে কোনো আনন্দের সাড়া পাচ্ছে না আজ। কেমন একটা ভয়ে ম্লান হয়ে আছে। সহসা সে পাগলের মত অস্থির হয়ে উঠল। অদূরে কোথায় দরজা খোলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শোবার ঘরের দিকে দ্রুত ভারী পায়ের আওয়াজ শোনা গেল।

এনিস ভীত, অসহায় স্বরে বলল, 'সর্বনাশ, সে এসে গেছে! কাউন্ট, কাউন্ট আসছে! যাও, যাও, তাড়াতাড়ি সাজঘরের মধ্য দিয়ে চলে যাও। যাও—আমার সর্বনাশ কোরো না, বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না গোল্ডমুণ্ড।'

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এনিস সাজঘরে পোশাকের স্তূপের দিকে তাকে সজোরে ঠেলে দিল। সেখানে অন্ধকারের মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে রইল সে। পাশের ঘর থেকে কাউন্টের চীৎকার শোনা গেল। গোল্ডমুণ্ড সন্তর্পণে সাজ ঘরের পেছনের দিকের দরজার কাছে এগিয়ে গেল। আস্তে দরজাটি খুলবার চেষ্টা করতেই বুঝতে পারল ওদিক থেকে সেটা কেউ বন্ধ করে দিয়েছে। নিদারুণ একটা ভয়ে সে পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ। সে যখন প্রথম এই ঘরে প্রবেশ করে তখনই হয়তো কেউ এই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। নিজে সাধ করে এসে ফাঁদে পা দিয়েছে এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। আর উদ্ধার পাবার কোনো উপায় নেই। এখন তাকে প্রাণ দিতেই হবে। এনিসের শেষ কথা কয়টি মনে পড়ল, 'আমার সর্বনাশ কোরো না।' না, না, তা সে কখনই করবে না।······দাঁতে দাঁত চেপে সে অপেক্ষা করতে লাগল। তার বুক তখনও

কাঁপছে। একটা স্থির সংকল্পে মনটাকে আবার সে কঠিন করে তুলল। শোবার ঘরের দরজা খুলে কাউন্ট এবার বেরিয়ে এল। তার এক হাতে মশাল, অন্য হাতে উন্মুক্ত তরবারি। শেষ মুহূর্তে গোল্ডমুণ্ড অনেকগুলি পোশাক টেনে এনে তার কাঁধের উপর, হাতের উপর রাখল। তারা এবার তাকে চোর বলে ধরে নিতে পারবে। তাহলে হয়তো উদ্ধার পাবার পথ কিছুটা সহজ হবে।

কাউন্ট তাকে দেখে ফেলেছে। তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'কে দাঁড়িয়ে আছ ওখানে? কি করছ? উত্তর দাও। না হলে মরতে হবে।'

গোল্ডমুণ্ড ক্ষীণস্বরে বলল, 'ক্ষমা করুন। আমি বড় গরীব। যা নিয়েছি সব আমি ফিরিয়ে দেব। এই যে দেখুন—' তার হাত থেকে পোশাকের বোঝা মেঝের উপর ফেলে দিল।

'ও,—তাহলে শুধু একটা চোর! সত্যিই কি তাই? মাত্র কয়েকটা পুরানো পোশাকের জন্য প্রাণ দিতে এসেছ নির্বোধ! তুমি কি এখানকার নাগরিক?'

'না, প্রভু। আমি একজন ভবঘুরে। বড় গরীব আমি। আমাকে দয়া করুন আপনি।'

'চুপ কর! এখন বল তো বাছাধন, মাননীয়া এই সুন্দরীর পক্ষে তুমি কি এমন লোভনীয়? যাক—। তোমাকে যখন মরতেই হবে তখন এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ! তুমি চুরি করতে এসেছ এই একটি কারণই যথেষ্ট।'

সাজঘরের ওদিককার দরজায় ধাক্কা দিয়ে কাউন্ট চীৎকার করে বলল, 'কে আছ? দরজা খোল।' বাইরে থেকে দরজা খুলে দেওয়া হল। তিনজন সশস্ত্র কারারক্ষী এসে দাঁড়াল।

কাউন্ট কর্কশ স্বরে আদেশ দিল, 'এটাকে বেশ করে বাঁধ। বদমাশটা এখানে চুরি করতে এসেছিল, আজ রাত্রির মত বন্দী করে রাখ, কাল সকালে ফাঁসি দিয়ে দেবে।'

গোল্ডমুণ্ডের হাতের কব্জি শক্ত করে বাঁধা হল। একটুও বাধা দিল না সে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে লম্বা বারান্দা পার হয়ে ভেতর দিকে কোথায় তাকে নিয়ে চলেছে তারা, একজন ভৃত্য মশাল হাতে পথ দেখিয়ে তাদের সামনে চলেছে। খিলান দেওয়া, ভূগর্ভস্থ একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কারারক্ষীরা গল্প করতে লাগল। ঘরের চাবি আনা হয় নি। একজন মশালটা ধরলে ভৃত্যটি দৌড়ে চাবি আনতে চলে গেল। বন্দীশালার

সামনে তারা চার জন—তিন জন রক্ষী আর একজন বন্দী—অপেক্ষা করতে লাগল। সেই মুহূর্তেই ভজনালয় থেকে বের হয়ে দু জন সন্ন্যাসী এ দিক দিয়ে যেতে যেতে মশালের আলো ও একজন বন্দীসহ রক্ষীদের ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এলেন।

গোল্ডমুণ্ড সন্ন্যাসীদের দিকে তাকাল না। চারপাশের কিছুই সে এখন দেখতে পাচ্ছে না। সে কেবলই ভাবছে আলোর শিখার পিছনে যে অতল অন্ধকার, তারই গহ্বরে চরম সর্বনাশ তাকে গ্রাস করবে বলে অপেক্ষা করছে। এই এক ভাবনা ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারছে না। আসামী একটি চোর এবং তাকে সকালেই ফাঁসি দেওয়া হবে জানতে পেরে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করল বন্দী তার স্বীকারোক্তি করবার জন্য কোনো পুরোহিত পেয়েছে কি না। রক্ষীরা জানাল, 'না'। বন্দী নাকি বামাল ধরা পড়েছে। ফাদার তখন বললেন, 'তাহলে সকাল বেলার প্রার্থনার আগেই আমি এই বন্দীর কাছে আসব। শেষ সময়ে তাকে স্বীকারোক্তি করিয়ে তার আত্মশুদ্ধি করব আমি। আমি আসার আগে পর্যন্ত তাকে ফাঁসি দিলে সেজন্য তুমিই দায়ী হবে। আমি কাউন্টের সঙ্গেও এবিষয়ে আজ রাত্রেই কথা বলে রাখব। এই লোকটি চোর হতে পারে কিন্তু প্রত্যেক খ্রীষ্টানেরই শেষ সময়ে আত্মার মুক্তির জন্য স্বীকারোক্তি করার অধিকার আছে।' কারারক্ষীরা কোনো প্রতিবাদ করতে সাহসী হল না। তারা জানে এই সন্ন্যাসী ধর্মাচার্যদেরই একজন। কাউন্টের সঙ্গে একসঙ্গে বসে, তাকে আহার করতেও দেখছে তারা। তাছাড়া, বেচারী এই চোরটিই বা কেন জীবনের শেষদিনে তার পাপী আত্মার মুক্তির অধিকার পাবে না ?

সন্ন্যাসী দু জন তাদের পথে চলে গেলেন। গোল্ডমুণ্ড এসব কিছুই লক্ষ্য করল না। সেই ভৃত্যটি চাবি নিয়ে ফিরে এলে দরজা খোলা হল। বন্দীকে একটি অপরিসর প্রকোষ্ঠের দিকে ঠেলে দিতেই সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। রক্ষীরা ঘরের বাইরে গিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। গোল্ডমুণ্ড অনুনয়ের স্বরে বলল, 'আমাকে একটা আলো দেবে ভাই ?'

'না। আলো নিয়ে আবার কি করে বসবে কে জানে। এ ভাবেই চমৎকার থাকবে। এখানেই নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা কর। তাছাড়া এই আলো কতক্ষণই বা থাকবে ? একঘণ্টার মধ্যেই তো নিভে যাবে। আচ্ছা, চলি এখন, শুভরাত্রি।'

গোল্ডমুণ্ড একাকী অন্ধকারের মধ্যে টেবিলের উপর মাথা নামিয়ে বসে রইল। এভাবে বসতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। হাতের বাঁধনটায় ভয়ানক জ্বালা হচ্ছে।

গোল্ডমুণ্ড অনেকক্ষণ এভাবে বসে থাকার পর সমস্ত শক্তি একত্র করে তার চরম পরিণতিকে, সর্বনাশকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করতে চাইল। রাত্রির ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। এই কালরাত্রি শেষ হলে তার জীবনের উপরেও যবনিকা নেমে আসবে। গভীর অন্ধকারের অতল গহ্বরে সে মিলিয়ে যাবে চিরতরে। কাল আর সে এই পৃথিবীতে থাকবে না, নিঃশ্বাস নেবে না—এই পরম উপলব্ধিকেই সে তার মনের মধ্যে পেতে চায়। মাস্টার নিকোলাসের মত, লিনির মত সেও কোথায় হারিয়ে যাবে। মহামারীর সময় মৃতদেহবাহী গাড়ির উপর একের পর এক অজস্র মৃতদেহের স্তূপ দেখেছিল সে। কাল সেও তাদেরই দলের একজন হয়ে যাবে। অনেকের কাছ থেকেই তার বিদায় নেওয়া হয় নি। আজ রাত্রির এই অবকাশটুকু তাকে সেজন্যই বুঝি দেওয়া হয়েছে।

প্রথমেই এনিসের কাছ থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে। সেই অপরূপ রূপলাবণ্যময়ীকে আর সে দেখবে না কোনো দিন। তার সোনালী চুলের রাশি, নীল দুটি চোখের গভীর দৃষ্টি—কিছুই আর দেখতে পাবে না সে। যৌবনোচ্ছল এনিস প্রেমের মোহনস্পর্শে কেমন করে মোহময়ী, প্রেমময়ী হয়ে উঠেছিল সেই মধুর, নিবিড় অনুভূতিকে আর সে এজীবনে উপলব্ধি করতে পারবে না। তারই দেহের কোমল মৃদু সৌরভে আপন দেহমনকে ভরিয়ে তুলতে সাধ যাচ্ছে তার। আজও পাহাড়ের চূড়ায় শরতের সোনালী রোদের পরশ নিতে নিতে সে সারাদিন তারই কথা ভেবেছে, সমস্ত দেহমন দিয়ে তাকেই কামনা করেছে। ঐ পাহাড়ের সারি, সূর্য, নীল আকাশ, আকাশের বুকে সাদা সাদা মেঘের স্তর—ওদের সবার কাছ থেকেই তাকে আজ বিদায় নিতে হবে। বৃক্ষলতা, অরণ্যানী, পথপরিক্রমা, দিনরাত্রি, ঋতুপর্যায়—কোনো কিছুই আর তার জীবনে আসবে না। বেচারী মেরী হয়তো তার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকবে। রান্নাঘরে বসে বসে তন্দ্রায় ঢুলবে, তারই ফিরে আসার অপেক্ষায়। কিন্তু সে তো আর কোনো দিনই ফিরে যাবে না।

সেদিন যে কাগজের বুকে সে তার কল্পলোকের মূর্তিগুলির কত ছবি এঁকেছিল একদিন তাদের জীবন্ত করে তুলবে আশা নিয়ে, তারা আজ সব

হারিয়ে গেল চিরতরে। তার সেন্ট জনকে আর নরজিসকে একবার দেখার আশাও আজ তাকে ছাড়তে হচ্ছে। প্রেম, ভালবাসা, ঘৃণা, নিদ্রা, জাগরণ—সবকিছুই চিরদিনের মত ত্যাগ করবার পালা এল এবার। কাল পাখিরা তেমনই নীল আকাশের বুকে উড়ে বেড়াবে, কিন্তু তাদের দুচোখ ভরে দেখবে বলে গোল্ডমুণ্ড এই পৃথিবীতে আর থাকবে না। নদী তেমনই কলতানে বয়ে যাবে, আকাশের বুকে চাঁদ হাসবে, তারারা ঝিকমিক করবে। তরুণেরা বড়দিনের উৎসবে, মেলায় আনন্দে নাচবে, গাইবে। শীতের প্রথম তুষারপাত ঐ দূরের পাহাড়গুলির মাথায় শ্বেতশুভ্র মুকুট পরিয়ে দেবে। পৃথিবীর সবকিছুই ঠিক তেমনই থাকবে, সুন্দর অপরিবর্তিত। মাটির বুকে গাছের ছায়া পড়বে রোজকারই মত। মানুষ তাদের আনন্দ-বেদনা-ভরা চোখে পৃথিবীর সুন্দর রূপ দেখবে, প্রাণভরে উপভোগ করবে। কিন্তু সেদিন সে আর থাকবে না তাদের মধ্যে। তার পায়ের চিহ্নও পড়বে না এ পৃথিবীর কোমল স্নেহময় বুকের উপর। ভাবতে ভাবতে কি এক অসহ বেদনায় হঠাৎ সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। তপ্ত জলের অজস্র ধারায় তার অন্তরের অন্তহীন বেদনার সকল বাঁধ ভেঙ্গে গেল।

টেবিলের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল সে। অসহায় শিশুর মত আকুল হয়ে বলতে লাগল 'মা, মাগো আমার।' তার এই গভীর আর্তনাদে অন্তরের অন্তস্থল হতে একটি মূর্তি যাদুমন্ত্রের মোহনস্পর্শে জীবন্ত হয়ে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। শিল্পী-মনের কল্পনার রঙ দিয়ে যে মাতৃমূর্তি গড়তে চেয়েছে সে, এ সেই মূর্তি নয়। মেরিয়াব্রোনে যে মাকে সে একদিন দেখেছিল তাকেই আজ আবার স্পষ্টভাবে চোখের সামনে দেখতে পেল। আরও প্রাণবন্ত, আরও উজ্জ্বল এই মাতৃমূর্তি। মায়ের কাছে সে আবার অভিযোগ জানাল, ব্যথাবেদনার সকল কথা উজাড় করে দিল। তার সমগ্র জীবনটাকে আবার মায়েরই হাতে তুলে দিল সে। কাঁদতে কাঁদতেই কখন ঘুমিয়ে পড়লে রাজ্যের যত ক্লান্তি আর অবসাদ মায়েরই মধুর, স্নেহভরা আলিঙ্গনে তাকে ঘিরে রাখল।

সহসা একসময় তীব্র ব্যথার অনুভূতিতে আবার জেগে উঠল সে। তার শৃঙ্খলিত কব্জিদুটি আগুনের মত জ্বালা করছে। পিঠ এবং কাঁধ অসহ ব্যথায় অবশ হয়ে আসছে। প্রাণপণ চেষ্টায় সে উঠে বসল। নির্মম বাস্তবকে আবার অনুভব করল। চারদিকে ঘন অন্ধকার। কতক্ষণ সে

ঘুমিয়েছে মনে করতে পারল না। তার জীবনের আর কয়টি ঘণ্টা বাকি আছে তাও সে জানে না। এখন যে কোনো মুহূর্তে তারা আসতে পারে। মনে পড়ল একজন সন্ন্যাসীও তার কাছে আসবে বলেছে। জীবনের শেষ মুহূর্তে তার আত্মশুদ্ধি, স্বীকারোক্তি তাকে কোন স্বর্গে নিয়ে যাবে বলে সে বিশ্বাস করে না। বহু দিন ধরেই এসমস্ত ধারণা তার মনের মধ্যে অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আছে। স্বর্গকে সে কামনা করে নি কোন দিন। এই সুন্দর পৃথিবীর মুক্ত জীবন, আনন্দ-বেদনা-ভরা মাটির এই অনিশ্চিত জীবন ছাড়া আর কিছুই তার কাম্য নয়। সে শুধু বাঁচতে চায়। দু চোখ ভরে দেখতে চায় এই পৃথিবীর রূপ মাধুরী।

ভীতত্রস্ত হয়ে সে উঠে দাঁড়াল। আঁধারের মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আবার ভাবতে লাগল। এখনো যেন বাঁচবার আশা আছে। এই সন্ন্যাসীই হয়তো তার মুক্তি নিয়ে আসবে। বন্দীর নির্দোষিতা সম্বন্ধে হয়তো সে নিশ্চিত বলেই এভাবে আত্মশুদ্ধির অভিনয় করে তাকে পালাবার সুযোগ করে দেবে। হয়তো তার এই ভাবনা একেবারেই নিরর্থক। তবুও সে ভাবল প্রথমে সন্ন্যাসীটিকে হাত করতে হবে। ভুলিয়ে বুঝিয়ে তাকে তার পক্ষে আনতে হবে। অন্য অনেক সম্ভাবনাও অবশ্য রয়েছে। শেষ মুহূর্তে জল্লাদ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, ফাঁসির মঞ্চ ভেঙে পড়তে পারে। অভাবিত অন্য কোনো দুর্ঘটনাও তার মুক্তি এনে দিতে পারে। না, না, তারা কখনো তাকে ফাঁসি দিতে পারবে না। নিয়তির এই নিষ্ঠুর পরিহাস সে কিছুতেই মেনে নেবে না। বাঁচবার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পণ করতে প্রস্তুত আছে সে। জল্লাদকে, কারারক্ষীদের মেরে পালিয়ে যাবে। ওঃ, এখন যদি সেই সন্ন্যাসীকে দিয়ে তার হাতের এই শক্ত বাঁধনটা শুধু খুলিয়ে নিতে পারত!

ব্যথা বেদনা ভুলে গোল্ডমুণ্ড তার হাতের বাঁধন দাঁত দিয়ে খুলবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করবার পরে সে বাঁধনটাকে একটু আলগা করতে পারল। ক্ষতবিক্ষত হাত দুখানি নিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে সে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ হাঁপাল। একটু সুস্থ বোধ করলে দেওয়ালের দিকে আরও সরে গিয়ে একটা স্যাঁতসেঁতে পাথরের গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল তার ধারালো কোণ আছে কি-না। কিন্তু পাথরটি একেবারেই মসৃণ। তখন তার মনে পড়ল ঘরের যে সিঁড়িগুলির দিকে রক্ষীরা প্রথমেই

তাকে ঠেলে দিয়েছিল সেগুলি বেশ ধারাল। অনেক চেষ্টায় সে দিকে এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে সিঁড়ির কাছে বসে তার হাতের বাঁধনটা সিঁড়ির ধারালো জায়গায় লাগিয়ে কাটতে চেষ্টা করল। সিঁড়ির কোণে লেগে তার হাত আরও ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। তবুও সে চেষ্টা করে চলেছে, শেষে দরজার ফাঁক দিয়ে যখন প্রভাতের একটুকরো আলোর রেখা ঝিকমিক করে উঠল তখন সে সেই আলগা বাঁধনটাকে একটানে ছিঁড়ে ফেলল। হ্যাঁ, এবার তার হাতদুটি মুক্ত।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি তার মাথায় আসল। সেই সন্ন্যাসী যদি তাকে তার মুক্তির জন্য সাহায্য না করে তাহলে তাকে সন্ন্যাসীর কাছে একলা রেখে রক্ষীরা যখন চলে যাবে তখন সে সন্ন্যাসীকে হত্যা করে তারই পোশাক পরে পালিয়ে যাবে। তারপর মেরী তাকে আশ্রয় দিয়ে নিশ্চয়ই লুকিয়ে রাখবে। প্রভাতের প্রতীক্ষায় গোল্ডমুণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে প্রহর গুনছে। এমন করে আর কোনোদিনই সে দিনের আলোর প্রতীক্ষা করেনি। দরজার ফাঁক দিয়ে আসা ভোরের মৃদু, আবছা আলোর রেখা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আর শিকারীর শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে সে তাই দেখছে নীরবে। ধীরে ধীরে টেবিলটার কাছে ফিরে গিয়ে গুটি সুটি হয়ে বসল গোল্ডমুণ্ড। এখন তার হাতদুখানি মুক্ত। সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়ে সে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য শেষ চেষ্টা করে দেখবে একবার। সে আবার বাঁচতে চায়। এনিস তো একটি মেয়ে মাত্র। সে হয়তো ভয় পেয়েছে। তাই নিজের জন্য তাকেও সে বলি দিতে প্রস্তুত।' কিন্তু এনিস তাকে ভালবেসেছে। তাই তাকে বাঁচাবার জন্য কোনো চেষ্টা হয়তো করতেও পারে। পরিচারিকা বার্থা অথবা তার বিশ্বস্ত ভৃত্যটি লুকিয়ে এসে তাকে হয়তো কোনো সংবাদ দেবে, পালাবার কোনো উপায় বলে দেবে। কেউ যদি তাকে সাহায্য নাও করে তাহলে তার নিজের পরিকল্পনাটি তো রয়েছেই। আঘাতের পর আঘাতে সে প্রত্যেকটি রক্ষীকে হত্যা করবে। তার দৃষ্টি কালো অন্ধকারে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আর এটাই তার পক্ষে মস্তবড় সুবিধা। সে তার চারদিকে সবকিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু অন্যেরা হঠাৎ এসে কিছুই দেখতে পাবে না।

টেবিলের তলায় গিয়ে এবার সে গুটি সুটি হয়ে বসল। সন্ন্যাসীকে প্রথমে কি বলবে তাও ভেবে নিল। কিন্তু আর সে অপেক্ষা করতে পারছে না। তার

ধৈর্য নেই আর। এই অধীর প্রতীক্ষা এখন অসহ্য মনে হচ্ছে, এভাবে অপেক্ষা করতে থাকলে তার সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য আর স্থির সংকল্প সবই ভেঙ্গে যাবে।

বাইরের পৃথিবী এবার ঘুম থেকে জেগে উঠছে। দরজার ওদিকে পায়ের শব্দ শোনা গেল, তালায় চাবি লাগাবার শব্দ হল। দীর্ঘ নীরবতা ও নিবিড় অন্ধকারের পর এখন সামান্যতম শব্দও তার কাছে বজ্রপাতের শব্দের মত ভীষণ মনে হচ্ছে।

দরজার ভারা পাল্লা ধীরে ধীরে খুলে গেল, একজন সন্ন্যাসী দুটি শিখাযুক্ত একটি লম্বা দীপাধার হাতে নিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সঙ্গে রক্ষী বা ভৃত্য কেউ নেই। বন্দী তার কল্পনারও অতীত কিছু দেখতে পেয়ে আচমকা শিউরে উঠল। কি আশ্চর্য! এই সন্ন্যাসী মেরিয়াব্রোনের মঠের অতি-পরিচিত পোশাক পরেছে! তার কৈশোরের সেই একান্ত প্রিয় আবাস-ভূমির পোশাক—মহান্ত ড্যানিয়েল, ফাদার আনসেলম, ফাদার মার্টিন যে পোশাক পরতেন সেই একই পোষাক এই সন্ন্যাসীও পরেছে। এই দৃশ্য তাকে এমন অভিভূত করল যে সে তখনই তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। কে জানে, হয়তো এরই মধ্যে তার মুক্তির ইঙ্গিত লুকান রয়েছে, কিন্তু তবুও এই সন্ন্যাসীকে হত্যা না করে তার মুক্তি তো সম্ভব নয়। দাঁতে দাঁত চেপে ধরল সে। এই সন্ন্যাসীকে আঘাত করা কি সত্যিই সম্ভব হবে তার পক্ষে?

সতেরো

'যীশু খৃষ্টের জয় হোক!' এই বলে সন্ন্যাসী তার দীপাধারটি টেবিলের উপর রাখল। গোল্ডমুণ্ড মাথা নত করে তাকে অভিবাদন জানাল।

সন্ন্যাসী কোনো কথা না বলে গোল্ডমুণ্ডের কথা শোনবার জন্য নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল। গোল্ডমুণ্ড তার কৌতূহলী দৃষ্টি সন্ন্যাসীর দিকে তুলে ধরল।

বন্দীর অন্তর এবার সন্দেহের দোলায় দুলে উঠল। সে দেখল সন্ন্যাসীর পরণে শুধু মেরিয়াব্রোন মঠের পরিচ্ছদই নয়, মহান্তের ক্রুশ-চিহ্ন এবং অঙ্গুরীয়টিও সে ধারণ করেছে। এবার সে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর দিকে তাকাল। ক্ষমাশীল, শান্ত, সুন্দর একখানি মুখ, ঠোঁটদুখানি অদ্ভুত পাতলা!

মুখখানি তার অতি-পরিচিত, একান্ত প্রিয়। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে শান্ত, সুন্দর অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানির দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। অজানিতেই তার একটি হাত দীপাধারটির দিকে এগিয়ে গেল। তারপর আলোটি আগন্তুকের মুখের একান্ত কাছটিতে এনে তাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে ক্ষীণ, অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল 'নরজিস!' তার চোখের সামনে সেই মুহূর্তে সমস্ত কিছু নেচে উঠল।

'হাঁ, গোল্ডমুণ্ড। একদিন আমি নরজিসই ছিলাম। কিন্তু বহুদিন কেটে গেছে সেই নাম, সেই পরিচয় ত্যাগ করেছি বন্ধু। সন্ন্যাস গ্রহণ করবার সময় আমার নাম 'জন' দেওয়া হয়েছিল সে কথা কি ভুলে গেছ?'

গোল্ডমুণ্ডের সমস্ত হৃদয় গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠল। তার চোখে এই পৃথিবীর ও জীবনের রূপ বদলে গেছে যেন। গত কয়েকঘণ্টা তার দেহ-মনের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তারই চরম প্রতিক্রিয়ায় এখন তার আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। কেমন একটা শূন্যতার অনুভূতি সমস্ত দেহকে ছেয়ে ফেলছে। চোখদুটি ছল ছল করে উঠল। এখনই যেন সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। দুই হাঁটু গেড়ে অঝোরে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে তার। কিন্তু তার সামনে নরজিসের এই মূর্তি সহসা ছেলেবেলাকার এক স্মৃতিকে মনে করিয়ে দিল। আজকের এই ক্ষমাসুন্দর মূর্তিটি সেদিনও এমনই শান্ত, গম্ভীর মুখে, গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল। আর সেদিনও সে অদম্য কান্নার আবেগে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর সে করতে চায় না। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করল এবার, 'তোমাকে নরজিস বলে ডাকবার অধিকার দাও।'

'তাই ডেকো বন্ধু। কিন্তু তোমার হাতখানি এগিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

গোল্ডমুণ্ড সেই ছেলেবেলার মত ব্যঙ্গ-ভরা স্বরে উত্তর দেবার চেষ্টা করে বলল, 'ক্ষমা কর নরজিস।' ক্লান্তিভরা, নির্লিপ্তস্বরে সে বলে চলল, 'তুমি মহান্ত হয়েছ, আর আমি একজন তুচ্ছ ভবঘুরে, অপদার্থ ছাড়া কিছুই হতে পারি নি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। কিন্তু ভয় হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত কিছুই বুঝি বলা হবে না। শোন নরজিস, আর আধ-ঘণ্টার মধ্যে আমাকে ফাঁসির মঞ্চে যেতে হবে।'

নরজিসের মুখের ভাব তার এই কথায় এতটুকুও পরিবর্তিত হল না। সেও এবার হালকা সুরে বলল, 'ফাঁসির মঞ্চের কথা আর ভেবো না। তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে, একথা জানাবার জন্যই আমি এসেছি। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব আমি। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে পারবো না। কথা বলবার অনেক সুযোগ আমরা পাব। এখন তোমার হাত দুখানি আমাকে ধরতে দাও বন্ধু।'

তারা পরস্পরের হাত জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। পরস্পরের এই স্পর্শ তাদের দুজনের মনেই গভীর সাড়া জাগাল। আনন্দে তাদের মন নেচে উঠল।

গোল্ডমুণ্ড বলল, 'আমাকে তাহলে তোমার সঙ্গে আবার মেরিয়াব্রোনে ফিরে যেতে হবে? কেমন করে? ঘোড়ায় চড়ে? আমাকে একটা ঘোড়া দেবে না?'

'ঘোড়া তুমি পাবে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা রওনা হব। একি! তোমার হাতে কি হয়েছে? রক্ত পড়ছে যে? তারা তোমাকে এমন-ভাবে ব্যথা দিয়েছে গোল্ডমুণ্ড?'

'আমিই হাতকে ক্ষত বিক্ষত করেছি। আমাকে বেঁধে রেখেছিল। সেই বাঁধন খুলতে গিয়েই এমন হয়েছে। কিন্তু তুমি কোনো রক্ষী না নিয়ে এভাবে একাকী আমাকে উদ্ধার করতে এসে যথেষ্ট সাহসের পরিচয়ই দিলে বন্ধু!'

'সাহস? কেন, ভয়ের তো কিছু ছিল না।'

'না—কোনো ভয় অবশ্য ছিল না। তবে তোমার মাথার খুলিটা যে আমি উড়িয়ে দিই নি তাই ভাগ্য। আমি কিন্তু সেরকম পরিকল্পনাই করেছিলাম। তারা আমাকে বলেছিল মৃত্যুকালে একজন পুরোহিত এসে আমার আত্মাকে মুক্তি দেবে। তাকে মেরে তারই পোশাক পরে পালিয়ে যাব স্থির করেছিলাম। চমৎকার পরিকল্পনা, তাই না?'

'তাহলে তুমি বাঁচতেই চেয়েছ?'

'নিশ্চয়ই। অবশ্য আমার আত্মাকে উদ্ধার করবার জন্য তারা যে নরজিসকেই পাঠাবে তা জানতাম না।'

'এমন কথা ভাবা উচিত নয় বন্ধু। আচ্ছা, মৃত্যু-সময়ে তোমার আত্মার মুক্তির জন্য যে যাজক তোমার কাছে আসত তাকে সত্যিই কি তুমি হত্যা করতে পারতে?'

'হয়তো তোমার মঠের সন্ন্যাসীদের কেউ হলে তাকে আমি হত্যা করতে পারতাম না। এ ছাড়া অন্য যে-কেউ এলে নিশ্চয়ই তাকে আমি—হ্যাঁ, বিশ্বাস কর।'

হঠাৎ তার স্বর বেদনায় ভরে উঠল। 'আমার জীবনে এই তো প্রথম হত্যা হত না।'

দুজনেই এবার নীরব হয়ে রইল, কেমন অস্বস্তি বোধ করল মনে মনে।

নরজিস আস্তে আস্তে বলল, 'এসব কথা এখন থাক। তোমার জীবনের সব কথা পরে শুনব গোল্ডমুণ্ড। এখন চল, আমরা যাই।'

'একটু সময় দাও নরজিস। একটি কথা মনে পড়ল আমার। একদিন আমিই তোমাকে জন নামটি দিয়েছিলাম।'

'কি বলতে চাইছ ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তুমি বুঝবে কেমন করে? অনেক বছর আগে আমিই তোমার নামকরণ করেছিলাম, সেন্টজন। আর সেই নামেই তুমি চিরকালের জন্য পরিচিত হয়ে গেলে! আশ্চর্য! আমি তখন খোদাই করতাম, মূর্তি গড়তে ভালবাসতাম জান তো? ভাস্করই অবশ্য হতে চাই আবার। যাক্‌, সে সময় একদিন কাঠের বুক কেটে কেটে যে সুন্দর মূর্তিখানি গড়েছিলাম সেটা সেন্টজন নামে এক তরুণ যোগী পুরুষের হলেও আসলে তা তোমারই প্রতিমূর্তি। তোমাকে কল্পনা করেই সেই মূর্তিটি আমি গড়েছিলাম নরজিস। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তির পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়া তার পরম ভক্ত সেন্টজনের মূর্তির পরিকল্পনার মধ্যে তোমারই রূপকে আমি অমর করে রাখতে চেষ্টা করেছি।'

গোল্ডমুণ্ড উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। নরজিস কোমল ক্ষীণ স্বরে বলল, 'তাহলে, আমাকে তুমি মনে রেখেছ। প্রায়ই আমার কথা ভেবেছ?'

'হ্যাঁ, বার বার কতবার ভেবেছি। আমার সকল ভাবনা জুড়ে তুমিই ছিলে বন্ধু।'

গোল্ডমুণ্ড দরজায় ধাক্কা দিতেই সকালবেলার নিস্তেজ আলোর রেখা তাদের দুজনেরই উপরে এসে পড়ল। তারা আর কোন কথা বলল না। নরজিস তাকে তার ঘরের দিকে নিয়ে চলল। সেখানে তখন দুজন সন্ন্যাসী জিনিস-পত্র বাঁধাছাদা করছে। গোল্ডমুণ্ডকে খেতে দেওয়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হবে বলে ঘোড়াও প্রস্তুত করা হল। ঘোড়ায় চড়তে চড়তে

গোল্ডমুণ্ড বলল, 'আমার আর একটি ইচ্ছা আছে নরজিস। দয়া করে বাজারের পাশ দিয়ে চল। সেখানে একজনকে দেখব আমি।'

তারা সবাই রওনা হল। প্রাসাদের প্রতিটি জানলার দিকে গোল্ডমুণ্ড তাকাচ্ছে। এনিসকে যদি একটি বার দেখতে পায়। কিন্তু তাকে আর দেখা গেল না। তারা চলতে লাগল। এদিকে মেরী গোল্ডমুণ্ডের জন্য দুর্ভাবনায় ছিল। তার সঙ্গে দেখা করে তার কাছ থেকে, তার বাবা মার কাছ থেকে বিদায় নিল গোল্ডমুণ্ড। আবার ফিরে আসবে বলে কথাও দিল সে। যতক্ষণ না তারা দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল ততক্ষণ মেরী তাদের দিকে চেয়ে দরজার কাছে নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে রইল।

নরজিস, গোল্ডমুণ্ড, একজন তরুণ সন্ন্যাসী, আর একজন সশস্ত্র মজুর, এই চারজন পাশাপাশি চলেছে। যেতে যেতে গোল্ডমুণ্ড হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আমার টাট্টু ঘোড়া ব্লেসকে তোমার মনে আছে নরজিস?'

'হাঁ, খুব মনে আছে। এখন আর দেখতে পাবে না তাকে। অবশ্য এত বছর পরে তাকে দেখবার আশাও বোধহয় কর না। সাত আট বছর হয়ে গেল তাকে আমরা মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছি।'

নরজিস তার ব্লেসকে এভাবে মনে রেখেছে জেনে গোল্ডমুণ্ড খুশি হল। সে বলতে লাগল, 'প্রথমেই আমার ব্লেসের কথা জানতে চাইছি বলে তুমি হয়তো হাসছ মনে মনে। সত্যিই এটা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ, তাই না? সবার আগে মহান্ত ড্যানিয়েলের সংবাদই জানতে চাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে মহান্ত যখন তুমি, তখন তিনি আর এ জগতে নেই তা স্পষ্টই বুঝতে পারছি। মৃত্যুর কাহিনী আর আমার শুনতে ভাল লাগে না নরজিস। গত রাত্রির অভিজ্ঞতার পর আর পথে পথে মহামারীর ভয়াবহ রূপ দেখে মৃত্যুর কথা আর সহ্য করতে পারি না যদিও আমরা সবাই একদিন এ পথেরই যাত্রী হব। তবুও বল শুনি, কবে, কেমন করে মহান্ত ড্যানিয়েল মারা গেলেন। তাঁকে আমি বড় শ্রদ্ধা করতাম। ফাদার মার্টিন কি বেঁচে আছেন? ফাদার আনসেল্‌ম্? তোমাদের কোনো খবরই তো আমি জানি না। মহামারী তোমাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারে নি দেখে খুব খুশি হয়েছি। তোমরা বেঁচে নেই একথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি কোনো দিন। মনে মনে জানতাম আবার আমাদের দেখা হবে। মানুষের বিশ্বাসও মানুষকে কত সময় ছলনা করে এ কথা আমি

আমার জীবনে অনেক মূল্য দিয়েই জেনেছি। আমার শিল্পগুরু মাস্টার নিকোলাসকে আমি কোনো দিনও মৃত ভাবতে পারি নি। তাঁর সঙ্গে একত্রে বসে কাজ করব, আরও অনেক শিখব এই আশা নিয়ে যখন ফিরে এলাম তাঁর কাছে তখন আর তিনি নেই।'

নরজিস বলল এবার, 'সংক্ষেপে বলছি শোন। মহান্ত ড্যানিয়েল মারা গেছেন আজ আট বছর হল। না ভুগে কোনো কষ্ট না পেয়ে সুস্থ সবল অবস্থায় হঠাৎ একদিন চলে গেলেন। তাঁর পরে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ফাদার মার্টিন মহান্ত হলেন। প্রায় সত্তর বছর বয়সে গত বছর তিনি মারা গেছেন। ফাদার আনসেল্‌ম্‌ও আর নেই। তিনি তোমাকে বড় ভালবাসতেন, প্রায়ই তোমার কথা বলতেন। শেষের কয়েক বছর খুব যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। হাঁ, মহামারীও আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেছে, বন্ধু। সেকথা এখন থাক। আর কি জানতে চাও, বল।'

'বিশপ-নগরীতে কেমন করে এলে তুমি?'

'সে অনেক কথা। এর মধ্যে কিছুটা রাজনীতি রয়েছে। কাউন্ট সম্রাটের বিশেষ প্রিয় পাত্র এবং কোনো কোনো বিষয়ে সম্রাটের কাছ থেকে সে পূর্ণ ক্ষমতা আদায় করে নিয়েছে। বর্তমানে সম্রাট এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কতকগুলি ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করবার প্রয়োজন হয়েছে। তাই কাউন্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হয়েছে। তার সঙ্গে আলোচনায় অবশ্য পুরোপুরি সফল হতে পারি নি।'

নরজিস চুপ করল। গোল্ডমুণ্ডও আর প্রশ্ন করল না। গত রাত্রে নরজিস কি সর্তে, কতখানি ত্যাগ স্বীকার করে কাউন্টের কাছ থেকে তার প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছে সে কথাও গোল্ডমুণ্ড কিছুই জানল না।

গোল্ডমুণ্ড ঘোড়ার উপর সোজা হয়ে বসতে বেদনা বোধ করছে। অসম্ভব একটা ক্লান্তি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর নরজিস তাকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, এটা কি সত্য যে তারা তোমাকে চুরির দায়ে ধরেছিল? তুমি নাকি প্রাসাদের অন্দর মহলে পোশাক চুরি করবার জন্য লুকিয়ে প্রবেশ করেছিলে?'

গোল্ডমুণ্ড হেসে বলল, 'অবশ্য বাইরে থেকে সেরকমই মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমি চুরি করতে যাই নি, তবে তারই প্রণয়িনীর সঙ্গে লুকিয়ে

দেখা করতে গিয়েছিলাম বন্ধু। কাউন্ট আমাকে এত সহজে মুক্তি দিলেন ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি'।

'না, যত সহজে মনে করছ তত সহজে তা সম্ভব হয় নি।'

সে রাত্রে তারা সবাই এক গাঁয়ে রাত কাটাবার জন্য থামল। গোল্ডমুণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় পরের দিনও তারা সেখানে থাকতে বাধ্য হল। তার পরদিন আবার তারা যাত্রা শুরু করল। তার হাত এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছে। ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ এখন সে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছে। বাজী ফেলে সহিসের সঙ্গে মাইলের পর মাইল ঘোড়-দৌড় করল সে। শ্রান্ত হয়ে আবার নরজিসের পাশে পাশে চলে অজস্র প্রশ্নবাণে তাকে ব্যস্ত করে তুলল। নরজিসও বিরক্ত না হয়ে তার সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে গেল।

'আচ্ছা নরজিস, তুমি কি কোনদিন ইহুদীদের পুড়িয়ে মেরেছ?'

'ইহুদী পোড়াব? কেন? মেরিয়াব্রোনের ধারে কাছে কোথাও কোনো ইহুদী নেই, বন্ধু।'

'এমন কোনো পরিস্থিতি কি তুমি কল্পনা করতে পার যখন তুমি তাদের হত্যা করবার জন্য আদেশ দেবে? আমি এমন অনেক ডিউক, বিশপ, জমিদার, কাউন্ট দেখেছি যারা বিনা দ্বিধায় এমন আদেশ দিয়েছে।'

'আমি নিজে কখনও এমন আদেশ দিতে পারি না। তবুও হয়তো কোনো দিন একান্ত নিরুপায় হয়েই এসব অমানুষিকতা দেখতে হবে।'

'তুমি কি তাহলে এমন বর্বরতা সহ্য করবে?'

'প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা না থাকলে সহ্য করতেই হবে। তুমি কি কোনো ইহুদীকে পুড়িয়ে মারতে দেখেছ গোল্ডমুণ্ড?'

'হাঁ—'

'তাকে কি প্রতিরোধ করতে পেরেছ? পার নি। তাহলেই বুঝতে পারছ—'

গোল্ডমুণ্ড তখন রেবেকার কাহিনী বলতে বলতে রাগে দুঃখে অধীর হয়ে উঠল। রোষদীপ্ত স্বরে বলল, "দেখ আমরা কোন্ জগতে বাস করছি! এটা কি একমাত্র নরকের সঙ্গেই তুলনীয় নয়? এত বড় অবিচারের কথা ভাবলে আমি স্থির থাকতে পারি না নরজিস।'

'হাঁ, ঠিকই বলেছ। কিন্তু জগৎটা এমনই, বন্ধু।'

গোল্ডমুণ্ড সজোরে বলে উঠল, 'বেশ, তাহলে কেন তুমি প্রায়ই বল, এই জগৎটা অতি পবিত্র স্থান, বিরাট এক ঐশী শক্তির সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে আপন মহিমা ও সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তুমি আরও বল, বিশ্বস্রষ্টা তাঁর সিংহাসনে বসে যা কিছু সৃষ্টি করে যাচ্ছেন তার সবই সুন্দর, মঙ্গলময়। এমনই কত কি আবোল তাবোল বলে যাও তুমি। এরিষ্টটল আর সেণ্ট টমাসের বাণীও নাকি এই এক কথাই বলে। তোমাদের কথায় এমন অসঙ্গতি কেন বলতে পার?'

নরজিস হেসে উঠল। বলল, 'জানি তোমার স্মৃতিশক্তি প্রখর। কিন্তু তবুও একটু ভুল করছ। বিশ্বস্রষ্টাকে চিরসুন্দর, স্বয়ংসম্পূর্ণ নিশ্চয়ই বলেছি কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে কোনো দিনই সম্পূর্ণ সুন্দর, ত্রুটিহীন বলি নি। এই জগতের পাপ, অন্যায়, অবিচারের কথা কোনো দিন অস্বীকার করিনি। মানুষের সবকিছুই ভাল, আমাদের সাংসারিক জীবনের ভিত্তি নিরবচ্ছিন্ন ন্যায় আর সঙ্গতির উপর, এমন কথা আজ পর্যন্ত কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলেন নি। মহাপুরুষদের বাণীর মধ্যে বরং একথাই স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে, মানুষের অন্তরে যা কিছু কল্পনা—তা সমস্তই অসম্পূর্ণ।'

'শেষ পর্যন্ত তাহলে সত্যকে স্বীকার করলে। একথাও তাহলে স্বীকার করবে যে মানুষ স্বভাবতই মন্দ, অসুন্দর আর আমাদের এই পৃথিবীর জীবন যত ক্ষুদ্রতা ও বর্বরতায় ভরা। তোমরা বল, তোমাদের ভাবনায় এবং মহামানবদের অমর বাণীতে এমন কিছু সুপ্ত রয়েছে যা চিরকালের জন্যই সত্য ও সুন্দর। কিন্তু মানুষ তার সাধনা করে না কেন?'

'শাস্ত্রবিদ আর দার্শনিকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তোমার সমস্ত ধারণাগুলি এলোমেলো করে দিয়েছে, বন্ধু। এখনো তোমার অনেক কিছু শেখার আছে। সত্য, সুন্দর, ন্যায়, বিচার, এসবের সাধনা আমরা করি না আমাদের জীবনে, একথা বললে কেন? প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আমরা তা করবার চেষ্টা করে চলেছি। আমার নিজের কথাই ধর। মহান্ত হিসাবে মঠের জীবনধারাকে আমিই নিয়ন্ত্রিত করি, শাসন করি। বাইরের জগতের মতই মঠের ভেতরেও অন্যায়, পাপ, দোষ, ত্রুটি—সবই রয়েছে। তবুও আমাদের প্রকৃতিগত পাপের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করে চলেছি। নিজেদের জীবনের অসম্পূর্ণতা, অসঙ্গতি ঠিকভাবে পরিমাপ করে নিয়ে পাপ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে অবিরাম চেষ্টা

করছি। আর এভাবেই পরম করুণাময় ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হবার সাধনা করে যাচ্ছি।'

'না, না, নরজিস, আমি তোমার কথা বলছি না। এ জগতে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও রয়েছে, বন্ধু। রেবেকার কথা, ইহুদীদের পুড়িয়ে মারবার সেই মর্মান্তিক দৃশ্য যখনই আমার মনে পড়ে তখনই আমি কেমন হয়ে যাই। বিচিত্র এক ভয় আর শূন্যতা আমার মনকে তখন ছেয়ে ফেলে। অনাথ অসহায় শিশুর দলকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি আমি।··· যখনই সেই সব ভয়ানক দৃশ্য আমার মনে ভেসে ওঠে তখনই মনে হয় আমাদের মায়েরা শয়তানের রাজত্বেই বুঝি আমাদের জন্ম দিয়েছে।'

নরজিস শান্ত ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ বন্ধু। তোমার সব কথা আমাকে বল। কিছু লুকিও না। কিন্তু একটা জিনিস তুমি ভুল করছ। যে গুলিকে তুমি তোমার ভাবনা বলে মনে করছ আসলে সেগুলি তোমার অনুভূতি মাত্র। একটি নির্মম জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার অনুভূতি এগুলি। আর এ কথাও ভুলে যেও না বন্ধু, এই অনুভূতির ঠিক বিপরীত অনুভূতিও তোমার মনকে ছেয়ে ফেলতে পারে। যদি ঘোড়ায় চড়ে একটা সুন্দর দেশের উপর দিয়ে যাও অথবা পরিণাম না ভেবে কোনো প্রাসাদে প্রবেশ করে কাউণ্টের প্রণয়িনীর অভিসারে চল তখন এই পৃথিবীর রূপ কি বদলে যাবে না তোমার চোখে? জীবন্ত-দগ্ধ ইহুদী আর মহামারী-কবলিত শূন্য, পরিত্যক্ত গৃহগুলির নিদারুণ স্মৃতিও কি তোমার মন থেকে মুছে যাবে-না তখন?'

'হাঁ, সত্যি। তবে জগৎটা এভাবে মৃত্যুর লীলা ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে বলেই মনের খোরাক খুঁজে ফিরি। জীবনের ভোগ লালসা, কামনা বাসনার পরিতৃপ্তির মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মৃত্যুকে ভুলে থাকি। কিন্তু হলে কি হবে, মৃত্যু চির সাথী। তার কুটিল, নিষ্ঠুর ছায়া অবিরাম অনুসরণ করছে আমাকে।'

'বুঝেছি গোল্ডমুণ্ড। নিষ্ঠুর, নির্মম এ পৃথিবীর ভয়াবহ পরিবেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে তুমি তোমার দেহের কামনার মধ্যেই আশ্রয় খুঁজে ফেরো। দেহজ কামনা কত ক্ষণস্থায়ী! অচিরেই তার সমস্ত মাধুর্য উবে গিয়ে দেহীকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে নিঃসীম শূন্যতায় ফেলে রেখে যায়।'

'হাঁ, তা সত্যি।'

'সমস্ত মানুষের বেলায়ই এটা প্রযোজ্য। আপন অন্তরের গভীরে কি অনুভব করল, কোন্ সত্যকে আবিষ্কার করল তা বোঝবার প্রয়োজন খুব কম লোকেই অনুভব করে। কিন্তু বলতে পার বন্ধু, এই যে জীবনের তিক্ত, বিষাক্ত রিক্ততা থেকে পালিয়ে এসে ইন্দ্রিয়াসক্ত কামনার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে আবার সেখানেই ফিরে যাও—একবার জীবনকে ভালবেসে আঁকড়ে ধর আবার মরণ কে ভয় পেয়ে জীবন থেকে সরে আস—বাজীকরের মত বিচিত্র যে খেলায় তুমি মেতেছ এ ছাড়া অন্য কোনো পথে শান্তি ও আনন্দকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছ কি কোনো দিন?'

'হাঁ, করেছি বৈকি। খোদাই করে মূর্তি গড়ার কাজে আমি শান্তি পেতে চেয়েছি। একবার যখন দুটি বছর পথে পথে কাটিয়ে একদিন পথের ধারে একটি গির্জায় প্রবেশ করে কুমারী মাতার কাঠের প্রতিমা দেখলাম, তার অপরূপ শিল্প-সৌন্দর্য আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিল। এমন নিখুঁত প্রতিমা যে শিল্পী গড়েছে আমি তাঁরই সন্ধানে বের হলাম। তাঁকে খুঁজে পেলাম, তাঁর কাছে কাজও শিখলাম দুবছর।'

'তাঁর কথা পরে আরও শুনব। কিন্তু বলতে পার, কাঠ খুদে মূর্তি গড়ার কাজে তুমি কেমন আনন্দ পাও? আর, কি তার অর্থ?'

'নশ্বর কোনো কিছুকে অবিনশ্বর করে তোলার অপূর্ব আনন্দ রয়েছে তাতে, আর এই তার একমাত্র অর্থ। দেখলাম মৃত্যুর কবল থেকে আমাদের জীবনের অনেক কিছু বহুকাল অক্ষয় করে রাখা যায় শিল্পীর এই শিল্প সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। আবার তারা একদিন কালের অমোঘ আঘাতে ধসে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তবুও মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনের চাইতে তারা অনেক বেশি-দিন স্থায়ী হয়, মানুষের মনকে অধিকার করে থাকে। মূর্তি গড়ার কাজে সৃষ্টির গভীর আনন্দকেই উপলব্ধি করা যায়। শিল্পীর কল্পনা তার আপন সৃষ্টির মধ্য দিয়েই রূপ পরিগ্রহ করে, এক সৌন্দর্যময় অলকাপুরীর সন্ধান দেয়। সেখানে রয়েছে শুধুই আনন্দ আর প্রশান্তি। শিল্প-সৃষ্টির এই আনন্দ চিরন্তন বলেই আমি এতে শান্তি খুঁজে পাই।'

'তোমার কথা শুনে খুশি হলাম গোল্ডমুণ্ড। তুমি আরও সুন্দর মহান সব মূর্তি গড়ে তোমার শিল্প-নৈপুণ্যকে পূর্ণ বিকশিত করবে, এই কামনাই করছি আমি। তোমার শিল্পচাতুর্যে আমার আস্থা রয়েছে। এখানে এসে তুমি আমাদের অতিথি হয়ে থাক। আমি তোমাকে একটা শিল্পাগারও তৈরি

করিয়ে দেব। আমাদের মঠে কোনো স্থপতি বা শিল্পী নেই। আমি বিশ্বাস করি তোমার ভেতরকার অফুরন্ত শিল্পভাণ্ডার এখনও নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সত্যিকারের শিল্পের মধ্যে জীবনের স্পর্শ ছাড়াও এমন একটা অনন্য কিছু থাকে যা তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে চিরন্তন করে রাখতে পারে। অনেক চিত্রশিল্পী ও কারুশিল্পীর সৃষ্টি আমি দেখেছি। কত যোগী পুরুষ, কত ম্যাডোনার মূর্তি দেখেছি, কোন একজন নির্দিষ্ট জীবন্ত মানুষের প্রতিকৃতি যে তাদের মধ্যে অবিকল ধরা পড়েছে এমন কথা আমি বিশ্বাস করিনা।'

'ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু নরজিস, সত্যিকারের একজন শিল্পী তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কতটা অসাধ্য সাধন করতে পারে তুমি তা এমন ভাল ভাবে জান বলে তো আগে জানতাম না! যথার্থ সুন্দর ও সার্থক কোনো মূর্তি নির্দিষ্ট একজন মানুষের অবিকল অনুকরণ হতে পারেনা। শিল্পীকে কিছুটা প্রভাবিত করতে পারে মাত্র। কোনো মহান সৃষ্টির প্রথম ছাঁচের উৎস রক্ত-মাংসে গড়া দেহ নয়, শিল্পীর নিভৃত অন্তর। শিল্পীর মানস প্রতিমা তারা। আমার মধ্যেও এমনই সব মূর্তির পরিকল্পনা সুপ্ত রয়েছে বন্ধু। একদিন তাদের রূপদান করে তোমাকে দেখাব আশা রইল।'

'শুনে বড় আনন্দ পেলাম গোল্ডমুণ্ড। কিন্তু দেখ বন্ধু, নিজের অজান্তেই তুমি কেমন দর্শনের মধ্যে প্রবেশ করে তারই এক পরম তথ্যকে ভাষায় মূর্ত করে তুলেছ।'

'আমাকে ব্যঙ্গ করছ নরজিস।'

'না, ব্যঙ্গ করছি না গোল্ডমুণ্ড। তুমিই বলেছ কোনো সার্থক, মহান্ শিল্পের প্রথম পরিকল্পনা শিল্পীর অন্তরেই জন্ম নেয়। শিল্পী তার মনের সকল মাধুরী মিশিয়ে তাকে বাস্তবে রূপদান করে মাত্র। শিল্পের মাধ্যমে বাস্তব-রূপ গ্রহণ করবার আগে পর্যন্ত সৃষ্টির প্রথম ছাঁচটি শিল্পীর আত্মাকেই আশ্রয় করে থাকে। আর এই প্রথম ছাঁচের উপলব্ধিকেই দার্শনিকরা 'কল্পনা' বলে থাকেন।'

'বল, আরও বুঝিয়ে বল।'

'এই 'কল্পনার' কথা বললেই তোমাকে একবার জ্ঞানের রাজ্যে, আমাদের মত ধর্মশাস্ত্রবিদ ও দার্শনিকদের তথ্যের রাজ্যে প্রবেশ করতেই হবে। আর তাহলেই তোমাকে স্বীকার করতে হবে এই বেদনাবিক্ষুব্ধ

জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের অনিত্য অস্তিত্বের মধ্যে, মৃত্যুর অজস্র তাণ্ডব-লীলার মধ্যেও শাশ্বত এক আত্মা সদা জাগ্রত। শোন, কিশোর বালক গোল্ডমুণ্ডকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম সেদিন থেকেই তার মধ্যে আমি এই অবিনশ্বর আত্মাকে সর্বদা উপলব্ধি করেছি। তোমার ভাবনাগুলি দার্শনিকের তথ্যবহুল ভাবনা নয় জানি। কিন্তু তোমার শিল্পীমনের কল্পনাই তোমার আশা-নিরাশা, কামনা-বাসনার অবিরাম তরঙ্গাঘাতে বিক্ষুব্ধ জীবনের সত্যকার পথকে দেখিয়ে দিয়েছে। গোল্ডমুণ্ড, তোমার সব কথা শোনবার জন্য কতকাল আমি অপেক্ষা করেছি বন্ধু। যে রাত্রে তুমি তোমার শিক্ষককে ত্যাগ করে দুর্জয় সাহস বুকে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লে, সেই রাত্রি থেকেই আমি অপেক্ষা করেছি। আজ আবার আমরা দুজন দুজনকে কাছে পেয়েছি।'

সেই মুহূর্তেই গোল্ডমুণ্ড যেন তার এতদিনের জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পেল। তবুও কিছুক্ষণ পরেই গোল্ডমুণ্ডের মনে একটা অবিশ্বাস আর সংশয়ের কালো ছায়া পড়ল। নরজিসকে সাবধান করে দেবার জন্য সে বলল, 'অতিথিবৎসল হতে গিয়ে কাকে তুমি মঠে ঢুকতে দিচ্ছ একবার ভেবে দেখেছ কি? আমি সন্ন্যাসী নই, কোনো দিন তা হবও না। সন্ন্যাস জীবনের তিনটি প্রধান ব্রত—দারিদ্র্য, দৈহিক শুচিতা এবং নিয়মানুবর্তিতা। এসবের কণামাত্রও হয়তো আর আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই।' গোল্ডমুণ্ডের এসব কথায় নরজিস বিচলিত হল না। সে বলল, 'আমি তোমাকে কোনো-দিনই মঠের জীবন গ্রহণ করতে বলিনি। তুমি আমাদের অতিথি হয়ে আমাদের মধ্যে থাকবে। তোমাকে একটা শিল্পাগার করে দেব আমি, শুধু এটুকুই চেয়েছি। আর একটা কথা মনে রেখো বন্ধু, যদি কোনো দিন বুঝতে পারি তুমি আমাদের মঠে বাস করবার উপযুক্ত নও তাহলে সেই মুহূর্তেই তোমাকে আমি চলে যেতে বলব জেনো।'

তার সম্বন্ধে নরজিসের মতামত গোল্ডমুণ্ডের মনকে আনন্দে, উৎসাহে ভরিয়ে তুলল। সে সন্ন্যাসী হতে চায় না, জ্ঞানী হতে চায় না। সে কেবল শিল্পী হতে চায়, মূর্তি গড়তেই চায়। তার শিল্পাগারই হবে তার জাবনের প্রথম ঘর, তার একমাত্র আশ্রয়, একথা ভাবতেই আনন্দে নেচে উঠল তার মন।

আরও কয়েকদিন এভাবে চলার পর তারা মঠের কাছে এল। দূর থেকেই মঠের গম্বুজ আর ছাদ দেখা যাচ্ছে। বহু দিন আগে গোল্ডমুণ্ড

ফাদার আনসেল্‌মের জন্য ভেষজগুল্ম যেখান থেকে সংগ্রহ করতে গিয়েছিল সেই পাথুরে অনুর্বর প্রান্তরের উপর দিয়ে যেতে যেতে তার মনে পড়ল এখানেই জিপসী মেয়ে লিসা একদিন তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল।

একটু পরে তারা মঠের ফটকের মধ্য দিয়ে প্রাঙ্গণের বাদাম গাছটির তলায় নেমে পড়ল। গোল্ডমুণ্ড ধীরে ধীরে বাদাম গাছটির গোড়ায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিল। মাটির বুকে লুটিয়ে-পড়া শুকনো একটি বাদামের কাঁটাভরা খোসার এক টুকরো হাতের মুঠোয় তুলে নেবার জন্য আনত হল সে।

আঠার

প্রথমদিকে মঠের অতিথিশালাতেই গোল্ডমুণ্ডকে থাকতে দেওয়া হয়। পরে তারই ইচ্ছায় মঠের বিরাট চত্বরের চারদিকে ঘিরে অনেকগুলি ছোট ছোট মহলের একটিতে তার থাকার ব্যবস্থা হল। মঠে প্রত্যাবর্তনের ফলে এখানকার মধুর অতীত স্মৃতিগুলি তার কাছে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠে মাঝে মাঝেই তাকে বিহ্বল, উন্মনা করে তোলে। এখানকার সমস্ত কিছু তার কতই না পরিচিত! মঠের প্রতিটি স্তম্ভ আর পাথর তার বাল্যের মধুর দিনগুলির স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার প্রাত্যহিক জীবনের চিরপরিচিত শব্দগুলি—প্রার্থনার মধুর ঘণ্টাধ্বনি, শ্যাওলা-ভরা বাঁধের জলের মৃদু কলতান, সন্ন্যাসীদের পাদুকার চটপট শব্দ, রাত্রির রক্ষীর হাতে চাবিগুচ্ছের টুংটাং শব্দ শুনবার জন্য সে কান পেতে থাকে। খেলার সময় মঠের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কলরব করতে করতে প্রাঙ্গণে নেমে এলে সে অপলক তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। তারা যেমন সবুজ আর সরল, সেও কি তেমনই ছিল কোনোদিন?

এই অতি-পরিচিত পরিবেশে এসে সে হঠাৎ নূতন একটা অজানা অনুভূতির সন্ধান পায়। প্রথম দিন মঠে এসেই সে অনুভব করেছে মঠটি আগের মতনই রয়েছে, বহু আগের প্রতিটি জিনিস একই জায়গায় রয়েছে। ভবিষ্যতেও বুঝি এর কোনো পরিবর্তন হবে না! পরিবর্তন হয়েছে কেবল তার নিজের। তখনকার সহজ সরল দৃষ্টি সে-ই হারিয়ে ফেলেছে।

আর তাই আজ সে সবকিছুই সম্পূর্ণ অন্য এক দৃষ্টিতে দেখছে। নূতন ভাবে এর সৌন্দর্য ও মহিমা অনুভব করতে পারছে। মঠের প্রতিটি মূর্তির ভাষাহীন সৌন্দর্য নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপভোগ করছে সে। এখানকার সুশৃঙ্খল জীবনধারার মধ্যে গোল্ডমুণ্ড নিজেকে বড় নগণ্য, বড় তুচ্ছ মনে করল। তারই বন্ধু নরজিস এখন মহান্ত হয়ে মঠের এই বিশাল ধর্মসাম্রাজ্যকে একাই পরিচালিত করছে দেখে নিজেকে আরও ক্ষুদ্র মনে হল তার।

একদিন গোল্ডমুণ্ড নরজিসকে বলল, 'তোমার সঙ্গে থাকতে পারছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি, বন্ধু। আমি তোমার কাছে আমার জীবনের সকল কাজের স্বীকারোক্তি করতে চাই। আর এভাবে প্রায়শ্চিত্ত করার পর এই মঠেই সাধারণ একজন কর্মী হিসাবে আমাকে গ্রহণ করতে অনুরোধও জানাই তোমাকে।'

'তোমার কথা শুনে খুশি হলাম। তোমার কাজ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কি ধারণা তাই শোন গোল্ডমুণ্ড। আমার মনের কথা তোমার কাছে প্রকাশ করতে যে ভাষা আমি ব্যবহার করব তাও হয়ত দার্শনিকের গুরুগম্ভীর ভাষাই হয়ে যাবে। আগে যেমন ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনেছ এখনও তেমনি শুনবে কি?'

'আমি তোমাকে বুঝতে আপ্রাণ চেষ্টা করব বন্ধু।'

'তোমার মনে পড়ে কি আমাদের সেই প্রথম দেখায় আমি তোমাকে একজন স্বভাবকবি বলেই ভাবতাম। তুমি যা কিছু বলতে বা লিখতে, সব কিছুই একটা নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করত। তোমার ভাষা সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলত।'

'মাপ কর নরজিস, তোমার মনের ধ্যান-ধারণাও কি আপন রীতিতে ছবি ফুটিয়ে তোলে না? তুমি কি চাও না যে তোমার ভাষার মধ্য দিয়ে তাদের ছবি ফুটে উঠুক? কোনো ছবি কল্পনা না করে কোনো কিছু চিন্তা কর কেমন করে নরজিস?'

'হাঁ, এই প্রশ্ন তুমি করতে পার। আমরা কোনো ছবি কল্পনা না করেই চিন্তা করি। চিন্তাধারা এবং কল্পনা, এদের একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক কিছু নেই। আমাদের চিন্তাধারা কোনো ছবি ফুটিয়ে তোলে না, নিছক শুষ্ক সূত্রের আর ভাষ্যেরই সৃষ্টি করে মাত্র। কবিকল্পনার যেখানে শেষ, দর্শনতত্ত্বের আরম্ভ সেখানে। অনেক বছর আগেও আমরা এই এক তথ্য নিয়েই কত বাদানুবাদ

করেছি। তোমার জগৎ কল্পনার জগৎ, ছবির জগৎ, আর আমার জগৎ তত্ত্বের, তথ্যের জগৎ। আমি বরাবরই বলেছি জ্ঞানের পথ, বিদ্যার পথ তোমার জীবনের পথ নয়। তুমি কবি, তুমি শিল্পী।'

'তোমাদের চিন্তা করবার রীতিকে আমি হয়ত কোনোদিনই বুঝতে পারব না নরজিস।'

'শোন, বুঝিয়ে দিচ্ছি। একজন চিন্তাশীল, জ্ঞানী ব্যক্তি তার যুক্তির সাহায্যে তর্কশাস্ত্রের মাধ্যমে এই বিশ্বের পরম সত্যকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করে কিন্তু সে জানে জ্ঞান এবং যুক্তি দিয়ে জীবনের এই পরমার্থকে যথার্থ লাভ করা যায় না। সত্যিকারের শিল্পীরাও জানে, কেবলমাত্র তুলি বা বাটালি দিয়ে একজন মহাপুরুষ বা দেবদূতের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তোলা যায় না। তবুও, চিন্তাশীল এবং শিল্পী দুজনেই যে যার আপন পথে আপন মতে জগৎকে বুঝতে চায়। প্রকৃতিলব্ধ প্রতিভা নিয়ে মানুষ আপন আপন সাধ্যমত নির্দিষ্ট কর্মপ্রবাহে ভেসে চলেছে। তাই তোমাকে আমি প্রায়ই বলতাম, যোগী আর বিদগ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিকে অনুকরণ করতে যেও-না। তুমি যা, তা-ই হও। নিজেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কর, বিকশিত কর।'

'ঠিক বুঝতে পারছিনা কি বলতে চাও তুমি। নিজেকে পূর্ণ কর, বিকশিত কর, একথার অর্থ কি?'

'এটা একজন দার্শনিকের ভাষ্য, যাকে আমি অন্য ভাষা দিয়ে ঠিক বোঝাতে পারছি না। আমাদের ধর্মের মূলকথা হচ্ছে একমাত্র ভগবান ছাড়া এ জগতে অন্য সব কিছুই অসম্পূর্ণ, অনিত্য। ঈশ্বর স্বয়ং সম্পূর্ণ, তিনি অদ্বিতীয়। অবিনশ্বর আর শাশ্বত সত্য তিনিই। আর মানুষ অনিত্য, অসম্পূর্ণ। মানুষ কখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে বিরাট সম্ভাবনা, প্রচ্ছন্ন কর্মশক্তি। সেই শক্তি আর সম্ভাবনা থেকে কর্মের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার দিকে প্রতিটি পদক্ষেপে শাশ্বত সত্যেরই অংশ রয়েছে। নিজেকে পূর্ণ কর, বিকশিত কর একথা বলে আমি সেই সত্যকেই বোঝাতে চেষ্টা করছি।'

'হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি।'

'মেরিয়াব্রোনের মঠের জীবনে আমি তোমার চাইতে অনেক সহজে আমার আপন পথে এগিয়ে যেতে পারছি। কিন্তু তুমি এই পৃথিবীর ধূলি-ধূসরিত পথে নিজের জীবনের সত্যকার পথ খুঁজে নিয়ে শিল্পী হয়েছ। তাই

সব প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য বন্ধু। আমার জীবনের চেয়ে তোমার জীবন অনেক কঠিন, বিক্ষুব্ধ।' গোল্ডমুণ্ড নরজিসের এই প্রশংসা বাক্যে লজ্জা পেলেও আনন্দিত হল মনে মনে।

'তোমার শিল্পসৃষ্টিকে দেখেই আমি তোমার শিল্পসত্তার বিচার করতে চাই। এখনও তুমি মনের দিক দিয়ে বড় অস্থির। নিজের খেয়ালখুশিমত চলেছ। তুমি তোমার সত্তার সঙ্গে তোমার শিল্পের আত্মিক মিলন ঘটাতে পারনি এখনও। এ দুই-এর মাঝে ব্যবধান রয়েছে অনেক। সেই ব্যবধানকে দূর করতে হবে। শিল্পাগার তৈরি করে তোমার কাজ শুরু করে দাও। তাহলেই দেখবে অনেক সমস্যা কেটে যাবে, শান্তি খুঁজে পাবে, আপনাকে বিকশিত করতে পারবে।'

গোল্ডমুণ্ড মঠের আঙ্গিনার ফটকের একপাশে একটা শূন্য, পরিত্যক্ত ঘরকে তার শিল্পাগার করবার জন্য পছন্দ করল। মিস্ত্রীর কাছ থেকে আঁকবার টেবিল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও তৈরি করিয়ে নিল। তার একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের একটা লম্বা ফর্দ নরজিসকে দিল সে। তারপর ছুতোর মিস্ত্রীর দোকানে, বনে বাগানে সে নানারকম কাঠ খুঁজে বেড়াতে লাগল।

মহান্ত নরজিসের সাত্ত্বিক জীবনধারা আর মঠের অবিরাম কর্মব্যস্ততা গোল্ডমুণ্ডের মনের মধ্যে নিজের সম্বন্ধে একটা ধিক্কার এনে দিত মাঝে মাঝে। নিজের ব্যর্থতায় লজ্জা অনুভব করত সে। একদিন অবাকবিস্ময়ে সে আবিষ্কার করল, সে যেন কত বৃদ্ধ হয়ে গেছে। ভবঘুরে জাবনের কত কাহিনীর সঞ্চয় নিয়ে এখন সে শূন্য, একাকী বসে আছে সেখানেই, যেখান থেকে সেই কত বছর আগে তার জীবনের প্রথম পথপরিক্রমা শুরু হয়েছিল!

গত কয়েক মাসে গোল্ডমুণ্ডের মধ্যে বিরাট এক পরিবর্তন এসে গেছে। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে সে। তিক্ত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার জীবন থেকে সকল রস নিংড়ে নিয়েছে। দুঃখ-কষ্ট বেদনার স্পর্শ তার সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট। সোনালী শ্মশ্রু ধূসর হয়ে এসেছে, মুখে কপালে কুঞ্চিত বলিরেখা ফুটে উঠেছে। রাতের পর রাত তার বিনিদ্র কেটে যায়। সে অনুভব করে তার জীবনের যত কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ

করবার পর কেমন একটা অস্পষ্ট বিচিত্র পরিতৃপ্তির অনুভূতি সমস্ত দেহ মনকে ছেয়ে রেখেছে যেন।

গোল্ডমুণ্ডের শিল্পাগার তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু প্রথমে সে কোন্ মূর্তি গড়তে আরম্ভ করবে তাই যেন স্থির করে উঠতে পারছে না। মঠের আতিথেয়তার ঋণ পরিশোধ করবার জন্য তাকে এমন কিছু সৃষ্টি করতে হবে যা এক মুহূর্তে সবার মন জয় করে নিতে পারে। মেরিয়াব্রোনের অন্তর্নিহিত জীবনধারাই হবে তার শিল্প-সৃষ্টির উৎস। ফাদারদের খাবার হলঘরের দেওয়ালের গায়ে উঁচু কুলুঙ্গিতে কোনো কারুকার্য নেই। গোল্ডমুণ্ড স্থির করল এই কুলুঙ্গির গায়ে নানা মূর্তি গড়ে তাকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করে তুলবে সে। মহান্তকে তার এই পরিকল্পনার কথা জানালে তিনি তাকে সানন্দে সমর্থন করলেন।

বড়দিনের উৎসব শেষে গোল্ডমুণ্ড তার কাজ শুরু করল। তার জীবন এখন থেকে অন্য রূপ নিয়েছে। মঠের কেউ এখন তাকে বড় একটা দেখতে পায় না। বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে গোল্ডমুণ্ড আপন সৃষ্টির কাজে মগ্ন হয়ে রইল রাতদিন। হলঘরে বক্তৃতামঞ্চের চারদিকে ঘোরানো গ্যালারিটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে একদিকে মানবজীবনের নানা ছবি, মূর্তি, অন্যদিকে ঈশ্বরের ও মহাপুরুষদের বাণী খোদিত করে দেবে স্থির করল। গ্যালারির নিচের দিকে, সোপান শ্রেণীর গায়ে বিশ্বপ্রকৃতির আর মহামানবদের সরল, অনাড়ম্বর জীবনের সুন্দর দৃশ্যাবলী তার শিল্পচাতুর্যে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠবে। বেদীর বুকসমান উঁচু প্রাচীরগাত্রে চারজন সুসমাচার-প্রচারকের প্রতিমূর্তি গড়বে। এই চারজনের মধ্যে একজনের আকৃতি হবে মহান্ত ড্যানিয়েলের মূর্তির অনুকরণে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মূর্তি দুটি হবে মহান্ত ড্যানিয়েলের পরবর্তী মহান্তদের অনুকরণে। সর্বশেষ মূর্তিতে তারই শিল্পগুরু মাস্টার নিকোলাসকে সে অমর করে রাখবে। কাজ করতে আরম্ভ করে গোল্ডমুণ্ড অনুভব করল তার এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদান করা সত্যিই বড় কঠিন। আশা-নিরাশায় আর আনন্দ-বেদনায় দুলতে দুলতে গোল্ডমুণ্ড তার এই দুঃসাধ্য সাধনায় এগিয়ে চলল। এ যেন প্রেমহীনা একটি মেয়ের মন জয় করবার মতই দুঃসাধ্য। তার সমস্ত শিল্পচাতুর্য ঢেলে, নিপুণ দুটি হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তার সৃষ্টির কাজ করে চলেছে।

একদিন গোল্ডমুণ্ড নরজিসের কাছে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে তার সমস্ত জীবনের পাপ থেকে মুক্ত হবার বাসনা জানালে নরজিস অবাক হয়ে রইল। গোল্ডমুণ্ড বলল, 'এতদিন তোমার সামনে নিজেকে বড়ই ব্যর্থ, নগণ্য মনে হয়েছে। কিন্তু এখন আর নিজেকে তুচ্ছ মনে করছি না। আমি আমার কাজ শেষ করেছি। এখন অন্য সবার মতই আমি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে চাই। পাপ স্বীকার করে মুক্তি পেতে চাই।'

গোল্ডমুণ্ড আর অপেক্ষা করতে চায় না। সে বুঝতে পারছে তার প্রায়শ্চিত্ত করবার সময় হয়েছে। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গোল্ডমুণ্ড স্বীকারোক্তি করে প্রায়শ্চিত্ত করল। নরজিস তার বন্ধুর রোমাঞ্চকর ভবঘুরে জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা আর পাপের সকল কাহিনী মন দিয়ে শুনল। গোল্ডমুণ্ড স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করল, সে তার সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার, এসবে তার কোনো বিশ্বাস নেই। অনুতপ্ত বন্ধুর মুখে এসব কথা শুনে নরজিস মনে মনে গভীর আঘাত পেলেও অবিচলিত রইল। গোল্ডমুণ্ডের ক্ষতবিক্ষত জীবনের অন্তর্বেদনা সে মর্মে মর্মে অনুভব করল। বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়েও তার জীবন আগের মতই নির্মল, শিশুর মতই সহজ, সরল রয়েছে তাও বুঝতে পারল। নরজিসের চিন্তাকুল মনের তুলনায় গোল্ডমুণ্ডের ক্লান্ত, বিষণ্ন মনের সরলতা কত গভীর ও অনাবিল, নরজিস নূতন করে আজ তা আবার উপলব্ধি করল। তার ভবঘুরে জীবনের সকল কাহিনী, ন্যায়-অন্যায় পাপে-ভরা প্রতিটি অভিজ্ঞতার বর্ণনাকে নরজিস এত সহজ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারল দেখে গোল্ডমুণ্ডও একটু অবাক হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তের পর একটা শান্তির বিধানও তাকে দেওয়া হল। একমাস পবিত্রভাবে সংযমী হয়ে থাকতে হবে, উপবাস করতে হবে, প্রার্থনায় যোগ দিতে হবে, রাত্রিবেলা শোবার সময় প্রার্থনার মন্ত্র জপ করতে হবে।

গোল্ডমুণ্ডের সৌভাগ্যবশতই হোক বা মহান্তের গভীর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক প্রভাববলেই হোক, প্রায়শ্চিত্ত করবার পর থেকেই তার দ্বন্দ্বভরা বিক্ষুব্ধ জীবন একটু শান্তির পরশ পেল যেন। মূর্তি গড়ার কঠিন সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখলেও তার মন খুশিতে ভরে উঠল। প্রতিদিন সকাল বিকাল যোগসাধনার মধ্য দিয়ে নূতন উৎসাহ বোধ করে সে। শিল্পসাধনার ভয়াবহ একাকীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তার চিন্তাধারা আবার

পরমাত্মার দিকে ধাবিত হয়। বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে নিজের অজানিতেই একটা আত্মিক যোগাযোগ গড়ে উঠে নূতন করে। মূর্তি গড়ার কঠোর সাধনার সময় একটা নিবিড় একাকীত্ব তাকে ঘিরে থাকলেও এক ঘণ্টার জন্য তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন সে একমনে প্রার্থনা করে তখন তার মনের প্রশান্তি, আর স্থৈর্য্য আবার ফিরে আসে। কিন্তু এই শান্ত ভাব তার মধ্যে স্থায়ী হয় না। কয়েক দিন অবিরাম পরিশ্রম করার পর হঠাৎ একদিন সে আবার অশান্ত, অস্থির হয়ে ওঠে। আবার মাঝে মাঝে তার মনে হয় এই সমস্ত প্রার্থনা, আরাধনা, ভজন, সবই মিথ্যা। ঈশ্বর কোথাও নেই। তাঁকে খুঁজবার জন্য মানুষের ব্যর্থ, অকারণ প্রয়াস শুধু।

একদিন নরজিসকে তার মনের এই কথা জানালে নরজিস বলল, 'এসব কথা মনে হলেও ভুলে যাবার চেষ্টা কর বন্ধু। তুমি আমার কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছ মনে রেখো। ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনছেন কিনা, তিনি সত্যিই আছেন কি নেই, সে বিষয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। তুমি শুধু তোমার কাজ করে যাও। তোমার সাধনাকে অকারণ ভাবনা দ্বারা আবিল করে তুলো না।' নরজিসের উপদেশে গোল্ডমুণ্ড আবার মন স্থির করে যোগ-সাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে দিল। মহান্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করল গোল্ডমুণ্ড দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আরাধনা করে চলেছে শান্ত মনে।

এ দিকে তার কাজও এগিয়ে চলল। শিল্পার কল্পনা ধীরে ধীরে অপরূপ রূপে মূর্ত হয়ে উঠছে প্রাচীর-গাত্রে। সৌন্দর্যের এক অলকাপুরী সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। বৃক্ষ-লতা, পশু-পাখি ও মানুষের কত মূর্তি, প্রাকৃতিক কত সব সুন্দর দৃশ্যাবলী একত্রে জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল। সবার মধ্যমণি হয়ে ফাদার নোয়া তাঁর পুষ্পিত দ্রাক্ষাকুঞ্জে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিশ্বস্রষ্টার সকল জীব আপন আপন মহিমায় ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে শিল্পীর হাতের যাদুস্পর্শে প্রাণ পেল যেন!

মহান্ত ড্যানিয়েলের মূর্তি গড়া শেষ হলে এটি ছাড়া অন্য সমস্ত মূর্তি গুলিকে আচ্ছাদনে ঢেকে সে নরজিসকে ডেকে আনল। নরজিস স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সেই মূর্তির দিকে অপলক তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে সে মূর্তিটি নিরীক্ষণ করছে। গোল্ডমুণ্ড নীরবে দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে। মনে মনে ভাবছে, 'আমার কাজ যদি ভাল না হয়ে থাকে অথবা সে যদি আমার শিল্পকে ঠিক বুঝতে না পারে তাহলেই আমার সকল

সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।' প্রতিটি মুহূর্তকে ঘণ্টার মত দীর্ঘ মনে হচ্ছে তার। মাস্টার নিকোলাস যে দিন তার প্রথম আঁকা ছবিখানি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর সে নিজে শিথিল হাত-দুখানি একত্র করে অসহায় ভাবে অপেক্ষা করছিল, সেদিনকার সেই স্মৃতি তার মনে ভেসে উঠল। কিন্তু নরজিস তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে স্পষ্ট দেখতে পেল তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানি কিসের প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সহসা। বহুকাল আগে সেই কৈশোরে এমন অনাবিল আনন্দের ছটা নরজিসের চোখে মুখে ফুটে উঠতে দেখেছে সে। মৃদু, মধুর সলজ্জ হাসির দ্যুতিতে তার সুন্দর চোখের তারা দুটি হেসে উঠল যেন। তার সকল জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রতিভার ব্যবধান একনিমেষে ভেঙ্গে গিয়ে চিরন্তন ভালবাসার এক ঝলক হাসি, নির্মল আনন্দের বিচিত্র এক শিহরণ তার প্রেমপূর্ণ অন্তরকে গোল্ডমুণ্ডের সামনে একেবারেই অনাবৃত করে দিল।

মৃদুস্বরে শান্তভাবে নরজিস বলতে লাগল, 'গোল্ডমুণ্ড, আমি হঠাৎ শিল্পসমালোচক হব এমন দাবি তুমি কোরো না বন্ধু। তুমি জান আমি তা নই। তোমার শিল্পসম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু আমাকে শুধু এইটুকুই বলতে দাও—প্রথম দৃষ্টিতেই আমি মহান্ত ড্যানিয়েলকে চিনে নিয়েছি। আমাদের কল্পনায় তিনি যেমন ছিলেন, তাঁর সম্পূর্ণ সত্তাকেই আমি এই মূর্তির মধ্যে অনুভব করতে পারছি, বন্ধু। আমাদের একান্ত প্রিয় মহান্তকে আবার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমি। তাঁর পবিত্র সংসর্গের সেই দিনগুলির অমর স্মৃতি আবার মনে জাগছে নূতন করে। গোল্ডমুণ্ড, তুমি আমার বন্ধুত্বের উপযুক্ত পুরস্কারই দিয়েছ। মহান্ত ড্যানিয়েলকেই শুধু ফিরিয়ে দাওনি, তোমাকেও আমি তোমার পূর্ণ সত্তায় লাভ করলাম। আজ আর বেশি কিছু বলতে চাইনা, বন্ধু। আমাদের জীবনে এমন শুভ মুহূর্তও এল তাহলে!'

কিছুক্ষণের জন্য ঘরের মধ্যে নীরবতা নেমে এল। গোল্ডমুণ্ড তার বন্ধুর আনন্দের গভীরতায় অভিভূত হয়ে বলল, 'তোমার কথা শুনে খুশি হলাম, বন্ধু। তোমার এখন যাবার সময় হয়েছে।'

উনিশ

মূর্তি গড়ার শিল্পসাধনায় গোল্ডমুণ্ড দুটি বছর মগ্ন হয়ে রইল। গাছ-লতা-পাতা-ঘেরা অপূর্ব সুন্দর এক উপবন সৃষ্টি করেছে সে। সেখানে কত রকমারি পাখি গান গাইছে। গাছে গাছে পারিজাত ফুলের সমারোহ। এই শান্ত সুন্দর উদ্যানের মনোরম পরিবেশে গোল্ডমুণ্ড মহামানবদের জীবন থেকে নানা দৃশ্যাবলীও উৎকীর্ণ করে দিয়েছে। সমস্ত ভুলে সৃষ্টির কাজে আত্মমগ্ন হয়ে থাকার পর কিছুদিন আবার তার কাজে মন বসে না। কেমন এক অস্থিরতা আর ক্লান্তি তাকে উতলা করে তোলে। তখন সে তার শিল্পাগার থেকে বেরিয়ে একলা মাঠে, বনে, প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কখনও ঘোড়ায় চড়ে ভবঘুরে জীবনের অবাধ স্বাধীনতার অপার আনন্দ উপভোগ করে আসে। আবার মাঝে মাঝে সবুজ ঘাসের কোমল শয্যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে নিথর, নির্জন অরণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার নূতন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সে তার শিল্প-সৃষ্টির কাজে মন দেয়।

গোল্ডমুণ্ডের শিল্পাগারটি নরজিসের একান্ত প্রিয়। প্রায়ই সে এখানে চলে আসে। অবাক বিস্ময়ে তার অনবদ্য সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে। বাঁধনহারা আনন্দে তার মন ভরে ওঠে। তার বন্ধুটির শিশুসুলভ, দুরন্ত, অবাধ্য, দ্বিধাগ্রস্ত মনের সমস্ত সুপ্ত কামনা-বাসনা যেন এই অপূর্ব সৃষ্টির পুষ্পিত সম্ভারের মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তার সৃষ্টি যেন এক নূতন পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছে তাকে। সে গোল্ডমুণ্ডকে বলল, 'তোমার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি গোল্ডমুণ্ড। শিল্পীর শিল্পকে, সাধনাকে আমি বুঝতে শিখেছি। এতদিন আমি আমার ভাবনা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের চাইতে শিল্পকে বড় বলে ভাবতে পারি নি। তাকে কোনো গুরুত্বই দিই নি। আমি ভেবেছি মানুষের আত্মাই তাকে অমরত্বের সন্ধান দেয়, জ্ঞানবিজ্ঞানই তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে। তাই মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়-বস্তুর মোহে আচ্ছন্ন না থেকে আত্মাকে, জ্ঞানকে আশ্রয় করলে জীবনের প্রকৃত অর্থ এবং সত্য পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু এখন থেকে আমি বুঝতে শিখেছি, জ্ঞানের পথ, আত্মিক সাধনার পথই জীবনের একমাত্র সত্য পথ নয়—আরও বহু পথে জীবনের

পরমার্থকে খুঁজে পায় মানুষ। জ্ঞানের পথ ছাড়াও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হৃদয়বৃত্তির সহজ সরল পথকে অনুসরণ করে জীবনের গূঢ় গোপন সত্যকে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। তোমার শিল্পসৃষ্টিই তোমার কাছে শাশ্বত জীবনের প্রতীক। আর আমরা যারা তত্ত্বজ্ঞানী, চিন্তাশীল, তারা তাদের শেষ লক্ষ্য ঈশ্বরকে পেতে চাই তাঁর সৃষ্ট বিশ্বকে বাদ দিয়েই। কিন্তু তোমরা বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিকে ভালবেসেই তাঁকে জীবনে উপলব্ধি করতে পার।'

'সে কথা জানি না, নরজিস। কিন্তু আমার মনে হয় তোমরা দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞানীরা অনেক সহজ উপায়ে জীবনের পরমার্থকে খুঁজে পাও। দ্বিধাদ্বন্দ্ব-ভরা বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আমরা ক্লান্ত, দিশাহারা হয়ে পড়ি। তোমার জ্ঞানবিজ্ঞানকে বহুদিন ঈর্ষা করতে ভুলে গেছি। কিন্তু তোমার শান্ত, ধীর, স্থির মনকে, তোমার শান্তিকে আমি ঈর্ষা না করে পারি না বন্ধু।'

'ঈর্ষা করবার কিছু নেই গোল্ডমুণ্ড। তুমি যা কল্পনা করছ তেমন শান্তি বলে কিছু নেই। বাইরের দিকে যে শান্তি দেখতে পাও মানুষের চিরকাম্য চিরন্তন শান্তি তা নয়। সংসারে দিনের পর দিন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে তবে সেই পরম শান্তিকে অর্জন করতে হয়। তুমি আমাকে কোনো দিন ক্লান্ত দেখ নি। আমার প্রতিদিনকার প্রার্থনার মধ্যে, জ্ঞানচর্চার মধ্যে আমার অশান্ত মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তুমি দেখ নি। তুমি শুধু দেখেছ আমি তোমার মত কোমল মনোবৃত্তির বশীভূত নই আর তাই বোধহয় ভেবেছ শান্তি খুঁজে পেয়েছি আমি। কিন্তু প্রতিটি বাস্তব জীবনের মতই আমার জীবনটাও যুদ্ধ আর ত্যাগের সমষ্টি। তোমার জীবনের মত আমার জীবনও একটা সংগ্রাম, বন্ধু।'

কয়েক সপ্তাহ পরেই গোল্ডমুণ্ডের কাজ শেষ হল। সবাই তার সৃষ্টি দেখল, বিচার করল। তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তাকে জয়মাল্য পরাল। তার শিল্প দেশের সম্পদ বলে গণ্য হল। মহান্ত নরজিসের অভিপ্রায় ওআদেশ অনুসারে গোল্ডমুণ্ড আর একটি কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করল। মঠের চার্চে একটি বেদীতে দেবীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। গোল্ডমুণ্ড স্থির করল তার যৌবনের এক মানসপ্রতিমাকে তার স্মৃতির মন্দির থেকে উদ্ধার করে এই দেবীপ্রতিমায় রূপান্তরিত করবে। নাইটের লজ্জানম্র, সুন্দরী তরুণী কন্যা লিডিয়াই তার এই মানসপ্রতিমা। কল্পনার মানসপ্রতিমাকে দেবীপ্রতিমায়

রূপান্তরিত করার কঠিন সাধনায় ব্রতী হল গোল্ডমুণ্ড। তার সহকারী হিসাবে মঠের কামারের ছেলে এরিক এবার কাজ শিখবার অপূর্ব সুযোগ পেল। বেদী তৈরি করবার দায়িত্ব তাকে দিয়ে গোল্ডমুণ্ড মাঝে মাঝেই মঠ থেকে বাইরে চলে যায়। একবার চলে গিয়ে বেশ কিছুদিন আর ফিরে না আসায় এরিক মহান্তকে জানায়। নরজিস শঙ্কিত মনে ভাবে হয়তো সে আর ফিরবেই না। কিন্তু সে ফিরে এল। এক সপ্তাহ মূর্তি গড়ার কাজ করে আবার একদিন কোথায় উধাও হয়ে গেল।

গোল্ডমুণ্ড আজকাল আবার অস্থির হয়ে উঠেছে। সকালবেলাকার প্রার্থনায় যোগ দিতেও তার মন চায় না। অসন্তোষের গভীর রেখা তার চোখে মুখে ফুটে উঠল। এখন সে প্রায়ই মাস্টার নিকোলাসের কথা ভাবে। ভাবে তাঁরই মত নিপুণ, কর্মঠ, সার্থক কারিগর সে হয়ে উঠেছে হয়ত, কিন্তু মনের দিক দিয়ে সে হৃতসর্বস্ব। কয়েকগাছি অকালপক্ক সাদা চুল বা চোখের কোলে বলিরেখা এজন্য দায়ী নয়। এর চেয়েও গভীর কোন কিছু তার অন্তরের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। নিজেকে তার বয়স্ক মনে হচ্ছে। আয়নায় প্রতিফলিত আপন বিষণ্ণ প্রতিকৃতি তাকে যেন ভ্রূকুটি করছে। সে এখন শান্ত, স্তিমিত। উদ্দাম যৌবনের চাঞ্চল্য আর তার মধ্যে নেই। বনে, প্রান্তরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবার সময় তার অতীতের যৌবনদীপ্ত রোমাঞ্চকর দিনগুলির স্মৃতি মনে পড়ে। দুঃসাহসিক অভিযানের অভিজ্ঞতাগুলি তাকে আজকের সুখ এবং প্রতিষ্ঠার চাইতেও অনেক বেশি আনন্দ দেয়। মঠ থেকে পালিয়ে দু-তিন দিন বাইরে থাকলে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয় তার। শিল্পাগারে অসমাপ্ত কাজের কথা মনে হয়, এরিকের কথা মনে পড়ে। তখনই সে ভাবে সে আর স্বাধীন নয়, মুক্ত নয়, যুবক নয়। তাই সে স্থির করল লিডিয়া-ম্যাডোনার মূর্তি শেষ হয়ে গেলে আবার পথে বেরিয়ে পড়বে। জীবনের কোমল, পেলব ও আনন্দময় অনুভূতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করবার জন্য মেয়েদের আর প্রকৃতির সংসর্গে আসা প্রয়োজন। তাই বুঝি পথে বিপথে ভবঘুরের বৈচিত্র্যময় জীবনকেই বরণ করে নিতে হয় তাকে বার বার। মঠের গম্ভীর পরিবেশ তার কল্পনাপ্রবণ মনকে কেমন শুষ্ক, নিরানন্দ করে তুলেছে।

আবার সে পথিক হবে ভাবতেই আনন্দ হল মনে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবার জন্য দিন-রাত কাজ করতে লাগল। কাঠের বুক

কেটে কেটে সে লিডিয়ার প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তুলছে। গভীর যত্ন ও নিষ্ঠা নিয়ে অন্তরের সমস্ত আনন্দ ও মমতা উজাড় করে দিয়ে গোল্ডমুণ্ড তার মানসীর প্রতিমূর্তিকে প্রাণবন্ত করে তুলছে। মূর্তিটি শেষ হয়ে আসার কয়েক দিন পূর্বে নরজিসকে তা দেখান হলে সে বলল, 'এটা তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হবে গোল্ডমুণ্ড। আমাদের মঠে এর সমকক্ষ আর কিছু নেই। তুমি আমাদের জন্য একটি অপূর্ব মূর্তি সৃষ্টি করেছ। আমি এজন্য বড় আনন্দিত, গর্বিত হয়েছি বন্ধু।'

'হাঁ, হয়তো সত্যিই তাই হয়েছে মূর্তিটি। শোন বন্ধু, ভবঘুরে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা আর যৌবনের সকল অনুভূতি ঢেলে, আমার জীবনে-আসা প্রতিটি মেয়ের সান্নিধ্যের স্মৃতি মন্থন করে আমি এই মূর্তি গড়ে তুলেছি। আমার কাজের উৎস এই, আর এই উৎস শুকিয়ে গেলে আমার অন্তরও শুকিয়ে যায়। তাই এ-কাজ শেষ হবার পর তোমার কাছে ছুটি চাইব। আমি আবার পথে বেরিয়ে আমার যৌবনকে খুঁজব। আচ্ছা নরজিস, আমি তো তোমার অতিথি। আমার কাজের জন্য কোনো মূল্য আমি চাইনি এতদিন।'

'আমি তোমাকে অনেকবারই তা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছি গোল্ডমুণ্ড।'

'হাঁ, এখন আমি তা গ্রহণ করব। আমাকে নূতন পোশাক তৈরি করিয়ে দাও, ভ্রমণের জন্য একটা ঘোড়া আর কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা দিলে খুবই ভাল হয়। আমাকে যেতে বাধা দিও না বন্ধু। আমার অভাবে দুঃখ পেও না। এখানে আমি অসুখী ছিলাম না। এখানকার জীবন থেকেও বেশি সুন্দর জীবন যে আমি অন্যখানে পেয়েছি তাও নয়। তবু, এ যে কী, ভাষায় আমি ঠিক বোঝাতে পারি না।'

গোল্ডমুণ্ডের জন্য নূতন পোশাক তৈরি হল। গরম পড়তেই গোল্ডমুণ্ড ম্যাডোনার মূর্তি শেষ করে আনল। প্রতিমার সর্বাঙ্গে শিল্পীর নিপুণ হাতের শেষ স্পর্শ বুলাতে বুলাতে তার কেবলই মনে হল শেষ বারের মত প্রাণভরে তাকে সে দেখে নিক।

গোল্ডমুণ্ড চলে যাবে ভাবতেই নরজিসের মন বেদনায় ভরে উঠছে। ম্যাডোনার মূর্তির প্রতি তার অসীম আকর্ষণ দেখে নরজিস এক এক সময় ভাবে হয়ত সে চলে যাবে না। একদিন গোল্ডমুণ্ড হঠাৎ এসে তার কাছে বিদায় চাইলে অব্যক্ত এক ব্যথায় দুজনের মনই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

'আবার কবে আসবে?' নরজিস প্রশ্ন করল।

'তোমার ঘোড়াটি আমাকে ফেলে দিয়ে আমার অপঘাত মৃত্যু না ঘটালে নিশ্চয়ই আসব বন্ধু। আবার দেখা হবে আমাদের। এরিককে দেখো। আমার এই প্রতিমাটিকে কেউ যেন নষ্ট না করে। এখন আমার ঘরেই রাখবে একে। আর ঘরের চাবি তোমার কাছে রাখবে, কেমন?'

'আচ্ছা গোল্ডমুণ্ড, পথে বের হতে তোমার খুব ভাল লাগছে?'

'হাঁ, পথে বের হবার কথা ভাবতেই আমার বড় ভাল লাগে। তবুও যাবার মুহূর্তে মন কেঁদে ওঠে। তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না একথা। তোমাদের ছেড়ে যেতে সত্যিই কষ্ট লাগছে। তোমাদের প্রতি আমার এই প্রাণের আকর্ষণকেও আমি বড় ভয় করি। কারণ এটা একটা দুর্বলতা। যারা সুস্থ, সবল তারা কখনই এমনভাবে কোন কিছুতে জড়িয়ে থাকে না। কেন এত অকারণ কথা বলছি বল তো! এবার বিদায় দাও বন্ধু। তোমার শুভেচ্ছাই আমার পাথেয় হোক।'

গোল্ডমুণ্ড চলে গেল। নরজিস তাকে একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছে না। কবে সে ফিরে আসবে আবার সেই আশাতেই রইল। কখনও ভাবল, স্বাধীন, মুক্ত পাখি আর তার হাতের মুঠোয় ফিরে আসবে কি কোনদিন? অন্তর দিয়ে সে অনুভব করল, দুরন্ত এই শিশুটির দুর্নিবার গতিকে রুদ্ধ করতে পারে এমন কিছুই নেই এ জগতে। আপন খেয়াল-খুশিমত সে তার গতিপথে ছুটে চলেছে।

প্রতিদিন গোল্ডমুণ্ডকে ঘিরেই নরজিসের সকল চিন্তা, সকল প্রশ্ন আর আত্মবিশ্লেষণ মুখর হয়ে ওঠে। গোল্ডমুণ্ড তার জীবনকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছে, ভাষায় তা সে প্রকাশ করেনি কখনো। আর প্রকাশ করলেও তাকে সে ধরে রাখতে পারত কিনা কে জানে! গোল্ডমুণ্ড তার জীবনকে শুধু সমৃদ্ধই করেনি, তাকে সে দিনের পর দিন দুর্বলও করে দিয়েছে। এই সংসর্গ তার মঠের জীবন, তার দর্শন আর চিন্তাধারার মূলে আঘাত করে তার সমস্ত বিশ্বাসকে প্রায় ধূলিসাৎ করে দিয়েছে যেন। এই ভবঘুরে শিল্পীর ছন্নছাড়া জীবনের চাইতে তার জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসজীবন অনেক শ্রেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সংসারধর্ম ত্যাগ করে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে কেবল প্রার্থনা আর সাধনার দ্বারা জীবনের পরম সত্যকে লাভ করা যায় কি না একমাত্র ভগবানই জানেন। মানুষ কি এজগতে নিছক ধর্ম ও কর্তব্যকে অনুসরণ করে সংযত,

সংহত জীবন যাপন করতেই জন্ম নিয়েছে? সুখদুঃখ ভরা জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে কেবল তত্ত্বজ্ঞান আর শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্য সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে সন্ন্যাসী হবার জন্যই কি মানুষজন্ম? ভগবান মানুষের মধ্যে লোভ, পাপ, হিংসা, দ্বেষ, অহংকার ও ভালবাসা দিয়েছেন। আর তাই ভালবাসবার, পাপ করবার, নিরাশ হবার অধিকারও কি তাকে দেন নি তিনি? গোল্ডমুণ্ডের কথা ভাবলেই নরজিসের মনে এই সকল চিন্তা ভিড় জমায়।

গোল্ডমুণ্ডের মত জীবন যাপন করা একান্ত সহজ সরল তো নয়ই, বরং খুবই কঠিন। সুখ দুঃখ-ভরা সাংসরিক জীবনের অনেক বিড়ম্বনা। ত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনে নিরাপত্তা ও শান্তি অনেক বেশি। দুর্গম সংসারপথে সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, হাসি-অশ্রু সবই ছড়িয়ে রয়েছে অপর্যাপ্ত—তারই উপর দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পথ চলতে হয় সংসারী মানুষকে, শিল্পীকে, পথিককে। পথের ধূলায় নিজেকে মিশিয়ে কত না ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করতে হয়, কত মূল্য দিতে হয় তার জীবন-দেবতাকে। গোল্ডমুণ্ডের জীবনই তাকে শিখিয়েছে সত্যিকারের অভিজাত শিল্পী তার কামনাবাসনাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করে তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনকে পূর্ণ উপভোগ করেও মনের পবিত্রতাকে হারায় না কোনোদিন। যুগ যুগ ধরে জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন কঠিনতম পথে চলেও অন্তরের দীপশিখাকে জ্বালিয়ে রাখে অনির্বাণ। সে আলোই একদিন তাকে স্রষ্টা করে তোলে, শিল্পীর আসনে বসায়।

ছেলেবেলাকার ফেলে-আসা দিনগুলির স্মৃতি নরজিসের মনে ভেসে ওঠে। তখন সে-ই গোল্ডমুণ্ডকে পরিচালিত করেছে। গোল্ডমুণ্ড তারই উপর নির্ভর করে একান্ত অনুগতের মত বিনা প্রতিবাদে তার সকল পরামর্শ মেনে নিয়েছে, আর আজ তারই বিক্ষুব্ধ, বিচিত্র জীবনের হোমাগ্নি থেকে জন্ম নিয়েছে এক মহান্ শিল্পী! কোন কথা, কোন উপদেশ, কোন নির্দেশের প্রয়োজন হয়নি। আপন মহিমায় পরিপূর্ণ একটি জীবন প্রকাশিত হল। নরজিস তার জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন সমস্ত নিয়ে এই শিল্পীর কাছে কত নিষ্প্রভ, কত ম্লান। এই সকল ভাবনা নরজিসের মনে গভীর আলোড়ন তোলে। অনেক বছর আগেও গোল্ডমুণ্ড তার সকল ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। গোল্ডমুণ্ডের জীবনকে সে এক নূতন পথে চালিত করে দিয়েছিল তখন। এত বছর পরে আবার তার সেই বন্ধুই তার আত্মাকে বিক্ষুব্ধ করে

তুলেছে। বন্ধুর অনুপস্থিতি নরজিসকে চিন্তাকুল করে তোলে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যাচ্ছে—বাদাম গাছটি ফুলে ফুলে ভরে উঠছে আর গোল্ডমুণ্ডের অভাব নরজিস অনুভব করছে প্রতি মুহূর্তে।

প্রায়ই সে গোল্ডমুণ্ডের শিল্পাগারে গিয়ে কুমারী মূর্তিটির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। এই অপূর্ব সৃষ্টির প্রেরণার উৎস কি, সে জানে না। গোল্ডমুণ্ড তাকে লিডিয়ার কথা বলেনি কোনদিন। কিন্তু সে অনুভব করতে পারছে এই তরুণীটি তার বন্ধুর মনকে অনেক দিন অধিকার করেছিল। অন্তরের মণিকোঠায় তার স্মৃতিকে সংগোপনে, সযতনে লালন করেছে সে। দীর্ঘদিনের অদেখাও তাকে এতটুকু ম্লান করতে পারেনি। গোল্ডমুণ্ডের গড়া অন্যান্য মূর্তিগুলিও নরজিসকে তার ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, অশান্ত জীবনের কাহিনীই শুনিয়েছে—তবুও তাদেরই মধ্যে সে চিরন্তন সত্যকে, সুন্দরকে, তার দরদী, মরমী মনের অনাবিল প্রেমকে অবিনশ্বর করে রেখে গেছে। মানুষের জীবন কত বিচিত্র, কত গোপন মাধুর্য ভরা তার রূপ! অনন্ত জীবনপ্রবাহের স্রোতে ভেসে আসা মানবজীবন তার ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা নিয়েই এক অপার বিস্ময়, অসীম সৌন্দর্যের আকর।

নরজিস নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়ে তার নির্দ্ধারিত ত্যাগ ও সাধনার পথেই এগিয়ে চলল আবার। তবুও মনে মনে সে তার বন্ধুর অভাব অনুভব করে প্রতি মুহূর্তে। সে বুঝতে পারে তার সমস্ত চিন্তা ভগবানে আর আপন কর্তব্যে নিয়োজিত হওয়া উচিত হলেও গোল্ডমুণ্ডই তার অনেকখানি অধিকার করে রেখেছে।

বিশ

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে এল। শুকনো পাতা ও বিবর্ণ ফুলের দল মাটির বুকে ঝরে পড়ছে। ঝিলে, ডোবায় ব্যাঙের একটানা ডাকও নীরব হয়ে এসেছে। সারস পাখিগুলি আকাশের বুকে অনেক উঁচুতে উড়তে লাগল এবারকার মত নিরুদ্দেশ যাত্রা করবে বলে। এমনি সময়ে একদিন গোল্ডমুণ্ড ফিরে এল। এরিক তাকে দেখে চমকে উঠল। দেখামাত্রই তাকে চিনতে পেরে আনন্দে তার বুক নেচে উঠলেও তার মনে হল এ যেন আগেকার সেই গোল্ডমুণ্ড নয়; অন্য কেউ। তার অসুস্থ, বিবর্ণ, ক্লান্ত দেহে বয়সের ছাপ পড়েছে। কিন্তু চোখদুটিতে এতটুকু বেদনা বা ক্লান্তির আভাস নেই। আগেকার সেই পরিচিত, সরল, সুন্দর ক্ষমাশীল হাসির দ্যুতিতে তারা তেমনি উজ্জ্বল। অবসন্ন পা-দুটিকে টেনে টেনে গোল্ডমুণ্ড এগিয়ে এল, দুঃসহ ক্লান্তিতে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে সে।

কাছে এসে এই অদ্ভুত, অর্ধপরিচিত মানুষটি তার তরুণ সহকর্মীর হাত ধরে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। অনেক দিন পর সে অনেক দূর থেকে ফিরে আসেনি, পাশের ঘর থেকে যেন এইমাত্র বেরিয়ে এল এমনই ভাব। এরিকের হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে সে শুধু বলল, 'আমি ঘুমাব।' আর এক পা-ও চলার শক্তি তার নেই বোঝা গেল। এরিককে চলে যেতে ইঙ্গিত করে সে তার শিল্পাগারের পাশে নিজের শোবার ঘরে ঢুকল। মাথা থেকে টুপি আর পা থেকে জুতো মোজা খুলে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘরের এককোণে আবছা অন্ধকারে তারই গড়া কুমারী মেরীর প্রতিমাটিকে শুভ্র আচ্ছাদনের আড়ালে দেখতে পেল সে। মূর্তিটির দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল একবার। তারপর ধীরে ধীরে জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। হতবাক এরিক তখনও সেই জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গোল্ডমুণ্ড তাকে ডেকে বলল, 'এরিক, আমি এসেছি একথা কাউকে এখন বোলো না। আমি বড় ক্লান্ত, সকাল পর্যন্ত আমাকে একলা থাকতে দাও।'

তারপর পোশাক না খুলেই তার শ্রান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দিল সে। একটু পরেই আবার উঠে দেওয়ালে টাঙ্গানো আয়নার দিকে নিজেকে অতি

কষ্টে টেনে নিয়ে চলল। আয়নায় প্রতিফলিত নিজের দিকেই সে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দাড়িতে শুভ্রতার সুস্পষ্ট স্পর্শ নিয়ে ক্লান্ত, বিবর্ণ এক বৃদ্ধ তার দিকে তাকিয়ে আছে। এলোমেলো, রুক্ষমূর্তি এই যে বৃদ্ধটি তার দিকে তাকিয়ে আছে, এ-কি সে নিজে, না অন্য কেউ? এই মুখখানি তাকে আরও অনেকগুলি মুখ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।—মাস্টার নিকোলাস, প্রাসাদের সেই বৃদ্ধ নাইট, চার্চের সেণ্ট জেমস, আরও কত জন।

সে মাথা নাড়তে লাগল। হাঁ, এই তো সে! দীর্ঘ পথপরিক্রমা করে, শ্রান্ত-ক্লান্ত নির্জীব এই যে বৃদ্ধটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছে সে, তার মধ্যে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। তবুও তার প্রতি কোনো অভিযোগ, অভিমান নেই। এই প্রাচীন মুখখানির মধ্যে এমন একটা কিছু রয়েছে, নবীন সুন্দর গোল্ডমুণ্ডের মধ্যে যার একান্ত অভাব ছিল। তার দৃষ্টিতে শ্রান্তির আভাস থাকলেও কেমন একটা তৃপ্তির ভাব, নির্লিপ্ত ভাব ফুটে উঠেছে। গোল্ডমুণ্ড মৃদু হাসল। আয়নার বুকে যে বৃদ্ধটিকে দেখা যাচ্ছে, যুবক গোল্ডমুণ্ডের চাইতে সঙ্গী হিসেবে তার কাছে সে অনেক শ্রেয়। দুর্বল, অসহায় হলেও সে অনেক বেশি নির্দোষ আর পরিতৃপ্ত। একে নিয়ে শান্ত, নির্বিরোধ জীবনের কল্পনা করা অনেক সহজ। কুঞ্চিত চোখের পাতা নাচিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল গোল্ডমুণ্ড। তারপর বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

পরদিন টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কিছু আঁকবার চেষ্টা করছে গোল্ডমুণ্ড, এমনি সময় নরজিস তাকে দেখতে এল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মহান্ত বলে উঠল, 'তুমি ফিরে এসেছ বলে ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ গোল্ডমুণ্ড। আমার আনন্দ প্রকাশ করতে পারছি না। তুমি তো আমাকে ডেকে পাঠাও নি, আমিই তোমার কাছে এসেছি। কি করছ তুমি? তোমার কাজে বাধা দিলাম না তো?' নরজিস তার কাছে এগিয়ে এল এবার। গোল্ডমুণ্ড কাগজ থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকাতেই নরজিস চমকে উঠল। গোল্ডমুণ্ড মৃদু হেসে বলল, 'আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন লও নরজিস। অনেক দিন পর তোমাকে দেখলাম। এতদিন তোমার কাছে আসিনি বলে আমায় ক্ষমা কর বন্ধু।'

নরজিস তার সর্বহারা সেই করুণ দৃষ্টিতে দুঃসহ এক ক্লান্তি ছাড়া আরও কিছু যেন দেখতে পেল। অদ্ভুত প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত দৃষ্টি। জীবন-দেবতার

পায়ে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের আকুতিই ফুটে উঠেছে সেখানে। সে বুঝল এ তার আগেকার বন্ধু গোল্ডমুণ্ড নয়। মনে হল তার আত্মা বাস্তব জগৎ ছেড়ে সুদূর এক স্বপ্নরাজ্যে উধাও হয়ে গেছে অথবা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। সস্নেহ মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল সে, 'তুমি কি অসুস্থ গোল্ডমুণ্ড?'

'হাঁ, আমার এবারকার ভ্রমণের প্রথম দিকেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তোমরা উপহাস করবে ভেবে তখনই ফিরে না এসে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। তুমি জ্ঞানী, সবই বুঝতে পারছ। আমাকে ক্ষমা কর বন্ধু। কি যেন প্রশ্ন করলে তুমি? আজকাল আমি সবকিছুই ভুলে যাই। নরজিস, সেই যে কতকাল আগে একদিন আমার মায়ের কথা সুন্দর করে বলেছিলে.........তখন খুব আঘাত পেলেও পরে কিন্তু .....' মৃদু হেসে গোল্ডমুণ্ড তার কথা এখানেই শেষ করল। নরজিস বলল, 'আমরা তোমার সব রকম সেবা যত্নই করব গোল্ডমুণ্ড। তুমি যা চাও সবই পাবে। অসুস্থ হওয়া মাত্রই কেন ফিরে এলে না তুমি? সত্যি, কেউ তোমাকে উপহাস করত না। তোমার ফিরে আসাই উচিত ছিল।'

গোল্ডমুণ্ড হেসে বলল, 'ও, হাঁ—এখন বুঝতে পারছি কেন ফিরে আসিনি তখন। নিজেকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যেন। মনে হয়েছিল তখনই ফিরে আসাটা আমার পক্ষে খুবই লজ্জাকর। এখন আমি এসেছি। আবার সুস্থ বোধ করছি আমি।'

'তোমার দেহের কোথাও কি খুব আঘাত লেগেছিল?'

'আঘাত? তা লেগেছিল বৈকি! কিন্তু সে আঘাতেরও একটা ভাল দিক রয়েছে। সেই আঘাতই আজ আমাকে অনেক বুদ্ধিমান করে তুলেছে। এখন লজ্জা বলে আর কিছু আমার নেই—তোমার কাছেও না।'

নরজিস গোল্ডমুণ্ডের কাঁধে হাত রাখলে সে নীরবে মৃদু হেসে চোখ বন্ধ করল। মহান্ত মনে মনে ভয় পেয়ে মঠের ডাক্তার ফাদার এনটনকে ডেকে আনবার জন্য দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। তারা ফিরে এসে দেখে গোল্ডমুণ্ড আঁকবার টেবিলের উপরেই ঝুঁকে পড়ে ঘুমিয়ে আছে। তারা দুজনে তাকে ধরে সন্তর্পণে বিছানায় শুইয়ে দিলে ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে তার পাশেই বসে রইল। গোল্ডমুণ্ডের অবস্থা যে খুবই খারাপ, ডাক্তার তা বুঝতে পেরেছে। মঠের ভেতরে একটি ঘরে তাকে নিয়ে আসা হল। এরিক রাতদিন তার পাশে থেকে সেবাযত্ন করবার দায়িত্ব নিল।

জীবনে শেষ বারের মত পথ পরিক্রমা করে যে বিচিত্র, দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে, তার পূর্ণ কাহিনী কেউ জানতে পারল না। কিছু কিছু সে বললেও তার অনেক কিছুই না বলা রয়ে গেল। প্রায়ই সে প্রবল জ্বরের ঘোরে চেতনা হারিয়ে ফেলে আর তখন তার উদ্‌ভ্রান্ত মন এ দিক ও দিক ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে সে অবস্থায় যখন বেশ স্পষ্ট করে কথা বলে তখনই নরজিসকে ডেকে পাঠান হয়। তার এই অন্তিম কথাগুলির টুকরো থেকেই তার কাহিনীর আর চিন্তাধারার কিছু কিছু অংশ নরজিস ও এরিক জানতে পারল।

'কখন আমার আঘাত লেগেছিল ? তা, যাত্রার শুরুতেই প্রায়। বনের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ঘোড়াটা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ায় আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট্ট নদীর মধ্যে ছিটকে পড়ি। নদীর সেই ঠাণ্ডা জলেই সারারাত পড়ে রইলাম। বুকের ভেতরে যেখানটায় আমার পাঁজরগুলি ভেঙ্গে গেছে সেখানটায় সেই থেকেই ব্যথা অনুভব করছি। ঘটনাটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে ঘটে নি। কিন্তু তবুও আমি এখানে ফিরে আসতে পারলাম না। নির্বোধ ছোট ছেলের মত ভাবলাম তোমরা আমাকে না জানি কত ঠাট্টা করবে। তাই আবার পথ চলতে লাগলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যথার জন্য আর চলতে না পেরে ঘোড়াটাকে বেচে দিয়ে বনের ধারে একটা খাদের মধ্যেই অনেক দিন শুয়ে রইলাম। এখন আমি চিরদিনের জন্যই তোমার কাছে ফিরে এসেছি নরজিস। আর আমি ঘোড়ায় চড়ব না। আমার ভবঘুরে জীবনের উপর যবনিকা পড়েছে, হেসে খেলে জীবনটাকে ভোগ করবার অধ্যায়টি পেছনে ফেলে এসেছি। ওঃ, এমনটি না ঘটলে আরও অনেক দিন, অনেক বছর তোমাদের কাছ থেকে এমনি দূরে দূরেই কাটিয়ে আসতাম বন্ধু। কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম, আমার ভবঘুরে জীবনে আনন্দ পাবার আর কোনো আশাই নেই, তখনই ভাবলাম মাটির বুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে আমি আবার ছবি আঁকব, দু-একটা মূর্তি গড়ে রেখে যাব।'

নরজিস বলল, 'আমার কাছে ফিরে এসেছ বলে আমি খুশি হয়েছি গোল্ডমুণ্ড। তোমার অভাব আমি সর্বদাই অনুভব করেছি। প্রতিদিন তোমার কথা ভেবেছি। তুমি হয়তো আর ফিরে আসবে না এই ভাবনা কত কষ্ট দিয়েছে আমাকে।'

গোল্ডমুণ্ড মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'আমাকে তো তুমি হারাও নি বন্ধু।' অন্তর-ভরা ভালবাসা আর বেদনা নিয়ে নরজিস ধীরে ধীরে বন্ধুর দিকে নত হয়ে তাদের এতদিনকার বন্ধুত্বের মধ্যে যা কোনো দিন করেনি, আজ তাই করল। গোল্ডমুণ্ডের কপালে, চুলে সে তার ঠোঁটের তপ্ত পরশ বুলিয়ে দিল। বিস্ময়-বিমুগ্ধ গোল্ডমুণ্ড নরজিসের এই আকস্মিক ব্যবহারের কথা ভাবতে লাগল।

মহান্ত আস্তে আস্তে বলল, 'গোল্ডমুণ্ড, একটা কথা তোমাকে আগে বলতে পারিনি বলে আমাকে ক্ষমা কর, বন্ধু। এখন আমাকে সে কথা বলতে দাও। তোমাকে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসি। তোমার জীবন আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। তুমি আমাকে অনেক ঐশ্বর্য দিয়েছ। তোমার কাছে এসবের হয়তো কোনো মূল্যই নেই। জীবনে তুমি ভালবেসেছ, ভালবাসা পেয়েছও। তাই তোমার কাছে এটা কিছু অস্বাভাবিক, অসহজ নয়। কিন্তু আমার বেলায় সবই অন্য রকম। জীবনের এই সহজ, সুন্দর দিকটা আমি কোনোদিনই উপভোগ করিনি। ভালবাসার সামান্যতম স্পর্শও আমি পাইনি। আমাদের মহান্ত ড্যানিয়েল বলতেন আমি নাকি দাম্ভিক, আত্মাভিমানী। এখন মনে হয় তাঁর ধারণা হয়তো সত্য। মানুষের উপর কোনোদিন এতটুকু অবিচার না করে তাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ এবং ধৈর্যশীল হতেই চেষ্টা করেছি সারাজীবন ধরে। আমি তাদের ভালবাসি নি। মঠের দুজন সন্ন্যাসীর মধ্যে যিনি বেশি জ্ঞানী তার দিকেই ছিল আমার যত আকর্ষণ। দোষত্রুটি, দুর্বলতা নিয়ে একজন স্বল্পজ্ঞানী মানুষকে আমি ভালবাসতে পারিনি কোনোদিন। আজ যদি এতদিন পর ভালবাসার স্বরূপ বুঝতে পেরে থাকি তাহলে সেটা একমাত্র তোমারই অবদান গোল্ডমুণ্ড। এজগতে কেবল তোমাকেই আমি ভালবেসেছি, ভালবাসতে পেরেছি। আমার জীবনে এই ভালবাসার স্থান কোথায় তা তুমি কল্পনাও করতে পার না।'

গোল্ডমুণ্ড শান্ত স্বরে বলল, 'আমি কিন্তু তোমাকে সেই প্রথম দিন থেকেই ভালবেসেছি নরজিস। তোমার ভালবাসা পাবার জন্য আমার অর্ধেক জীবনই কেটে গেছে। আমি জানতাম তুমি আমাকে সর্বদাই স্নেহের চোখে দেখছ কিন্তু তোমার মত গর্বিত, সংযমী লোক একথা একদিন মুখ ফুটে বলবে এতটা আশা করিনি। আজ আমার এজগতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই,

বন্ধু। জীবনের সকল আনন্দ হারিয়ে আমি যখন একেবারেই নিঃস্ব, রিক্ত তখনই তুমি একথা বললে। আমি তোমার এই ভালবাসা গ্রহণ করছি, বন্ধু। তোমাকে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

ঘরের এককোণ থেকে লিডিয়া-ম্যাডোনার অপরূপ মূর্তিখানি যেন তাদের দুজনের দিকেই তাকিয়ে আছে। নরজিস প্রশ্ন করল, 'তুমি কি এখনও মৃত্যুর কথা ভাবছ ?'

'হাঁ, আমি মৃত্যুকেই কামনা করছি। আমার জীবনের বিচিত্র পরিণতির কথাও ভাবছি। আমি, যখন কিশোর ছিলাম আর তুমি ছিলে বিদ্যার্থী, শিক্ষক তখন আমি তোমার মত জ্ঞানী হতে চেয়েছি। কিন্তু তুমিই বুঝিয়ে দিয়েছিলে যে আমি তা হতে পারবনা কোনদিনই। তখন আমি জীবনের একটা ভিন্ন পথ বেছে নিলাম। ইন্দ্রিয়াসক্ত ভোগলালসায় আমি আনন্দ পেয়েছি, খুশি হয়েছি। একমাত্র দেহকে কেন্দ্র করে যে প্রেম গড়ে ওঠে, একদিন তা আত্মাকেও স্পর্শ করে একথা জেনে মনে মনে তৃপ্তিও পেয়েছি। আর এর মধ্য দিয়েই প্রকৃত শিল্পী হয়ে ওঠা যায়। এখন আমার মধ্যে সমস্ত পাশবিক কামনার আগুন নিভে গেছে। ইন্দ্রিয়াসক্তিতে আর আমার এতটুকুও আনন্দ বা আকর্ষণ নেই। কোনো মূর্তি গড়তেও আর আমি চাইনা। অনেক সৃষ্টি করেছি। একজন শিল্পী তার জীবনে কতগুলি মূর্তি গড়েছে, সেই হিসাব নিকাশে কি-বা আসে যায় ? তাই এখন আমার যাবার সময় হয়েছে। মৃত্যুকে কামনা করে তারই অপেক্ষায় বসে আছি আমি। আমি আবার আমার মায়ের বুকে ফিরে যাব এই বিশ্বাস আর স্বপ্ন আমার মনে গেঁথে আছে বলেই আমি মৃত্যুকে সাগ্রহে কামনা করছি। জীবনে প্রথম নারীসঙ্গ আমাকে যে আনন্দ আর তৃপ্তি দিয়েছিল, মৃত্যুও আমাকে ঠিক সেই আনন্দ, সেই তৃপ্তিই দেবে এ আশাই করছি। মৃত্যু তার ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আমার কাছে আসবে না। আমারই মা আবার তার বুকে আমাকে গ্রহণ করে মহাশূন্যে নিয়ে যাবে, এই একটি ভাবনা ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতে পারি না।'

এর পরের কয়েকটা দিন গোল্ডমুণ্ড কোনো কথা না বলে শান্ত হয়ে রইল। সে সময়ে একদিন নরজিস তাকে দেখতে এসেই বুঝতে পারল সে তারই সঙ্গে কথা বলার জন্য উতলা হয়ে জেগে আছে। নরজিসই প্রথম সুরু করল, 'ফাদার এনটন বলেন তোমার নিশ্চয়ই খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু এমন

শান্তভাবে এই যন্ত্রণা কি করে তুমি সহ্য করছ গোল্ডমুণ্ড? আমার মনে হয় তুমি এতদিন পর তোমার আত্মার প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছ।'

'ঈশ্বরকে মনে মনে উপলব্ধি করে আত্মার প্রশান্তি লাভ করবার কথা যদি বল তাহলে বলব, না, আমি তা পাই নি। ভগবৎচিন্তার মধ্য দিয়ে শান্তি আমি চাই না। ঈশ্বর এই পৃথিবীটাকে বড় কদর্য করে গড়েছেন আর তাই একে শ্রদ্ধা করবার কোনো কারণ নেই। যদি বল আমি আমার তীব্র দৈহিক বেদনাকে জয় করে মনের স্থৈর্য ও শান্তি লাভ করেছি তাহলে ঠিকই বলেছ বন্ধু। এমন একদিন ছিল যখন আমি মৃত্যুকে সহজ ভাবতে পারলেও কোনো বেদনাকে সহ্য করা আমার পক্ষে ছিল খুবই কঠিন। কাউন্ট হেনরিকের কারাগারে সেই রাত্রে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে এই সত্যকেই উপলব্ধি করলাম। আমি মরতে পারি নি, মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করবার মত মনের বল সেদিন আমার ছিল না। কিন্তু আজ আমার মনের সে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে।' কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছে- স্বরও ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। কথা না বলবার জন্য নরজিস তাকে অনুরোধ করল।

'না, আমার সব কথা তোমাকে শোনাতে চাই আমি। আগে তোমাকে এসব কথা বলতে লজ্জা হত। কিন্তু আজ আর বলতে কোন দ্বিধা নেই। সে দিন তোমাকে ফেলে রেখে ঘোড়া ছুটিয়ে আমি আবার পালিয়ে গেলাম। কোনো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সে দিন বের হই নি। কাউণ্ট হেনরিক এনিসকে সঙ্গে নিয়ে আবার ফিরে এসেছে শুনে আমি এত উতলা হয়ে পড়লাম যে এনিসের চিন্তা ছাড়া আর অন্য কিছুই আমি ভাবতে পারলাম না। জীবনে যত মেয়ের সঙ্গ আমি পেয়েছি এনিসই ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে রূপসী। আমি তাকে আর একবার দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। তার সান্নিধ্যে নিজেকে সুখী করতে চাইলাম আবার। তার সন্ধানে বের হয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই তার দেখাও পেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম তখনও সে তেমনই অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী। কিন্তু জান নরজিস, সে তখন আর আমাকে চায় না। বলল, আমি নাকি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমি আর তেমন সুন্দর নই। আমার যৌবন নেই, তার উপযুক্ত সঙ্গী হবার মত প্রাণবন্তও নই আমি। আমার জীবনের পথ-চলার অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবুও সেই মুহূর্তেই আমি আবার পথ চলতে শুরু

করলাম। বুঝতেই পারছ কেন তোমার কাছে সে দিন ফিরে আসতে পারিনি। পথ চললেও সেদিন থেকেই যেন আমার শক্তি, যৌবন, বুদ্ধি, বিবেচনা, সবই আমাকে পরিত্যাগ করল। আমি আমার ঘোড়া নিয়ে একটা নদীতে উল্টে পড়ে হাত ভেঙ্গে সারারাত জলের মধ্যেই পড়ে রইলাম। জীবনে এই প্রথম আমি তীব্র বেদনা অনুভব করি। সে মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম আমার বুকের ভেতরটা ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু তবুও সেই অসহ বেদনার মধ্যেই কেমন একটা আনন্দও হল মনে। আমি খুশি হলাম, আনন্দের সঙ্গে সেই ব্যথাকে অনুভব করলাম। বুঝলাম মৃত্যু এবার আমার কাছে এগিয়ে এসেছে। এখন আর তার বিরুদ্ধে কিছুই বলার নেই আমার। সেই কারাগারে মৃত্যুকে যেমন ভয়াবহ মনে হয়েছিল আজ আর তেমন মনে হয় না। বুকের ভেতরে তীব্র ব্যথা অনুভব করতে করতে আমি যেন এক স্বপ্নরাজ্যে চলে যাই। প্রথমদিকে ব্যথাটাকে অগ্নিপ্রদাহের মতই অসহ মনে হয়েছিল। সেখানে শুয়ে কাতরোক্তি করতে করতে হঠাৎ আমি একটা স্বর শুনলাম, কেউ যেন আমাকে দেখে হেসে উঠল। ছেলেবেলায় এই স্বর শুনতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম। এ আমার মায়ের স্বর। কোমল, গভীর, স্নেহ ভালবাসা চপলতা-ভরা সেই বিচিত্র সুন্দর স্বর শুনেই আমি বুঝতে পারলাম আমার মা আমার কাছে এসেছে আবার। আমাকে কোলে তুলে নিয়ে আমার বুকের পাঁজরের মধ্যে একটা গভীর ক্ষত তৈরী করছে। তারপর সেখানে তার আঙ্গুলগুলি ঢুকিয়ে আমার আত্মাকে টেনে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চাইছে যেন। ঠিক তখন থেকেই ব্যথাকে আর ব্যথা বলে মনে হয় না আমার। এই ব্যথা আর আমার শত্রু নয়। আমার আত্মাকে নেবার জন্য এ যেন আমার মায়ের আঙ্গুলের কোমল স্পর্শ, কখনো মা আমাকে বুকে চেপে ধরে করুণ স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে, কখনও হাসে আবার গুন গুন করে মৃদু মধুর স্বরে গান গায় কখনো। আবার এক সময় আকাশের বুকে উঠে যায়। তখন আমি মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তার করুণ হাসিমাখা মুখখানিকে দেখতে পাই। তার সেই করুণ হাসি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে তাকে টেনে নেয়।'

গোল্ডমুণ্ড বার বার তার মায়ের কথাই বলে চলল। তার জীবনের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। আর-একদিন সে বলল, 'তুমি কি জান নরজিস, তুমি আমার মাকে আমার জীবনে ফিরিয়ে দেবার আগে আমি কেমন করে তাকে

নিঃশেষে ভুলে ছিলাম? সেটাও একটা তীব্র বেদনার অনুভূতিই ছিল আমার কাছে। মা যখন আমাকে ডাক দিল আমি তখনও কিশোর। তার ডাকে আমি তখনই সাড়া দিলাম। সবখানেই আমি তাকে দেখতে পেলাম। জিপসী মেয়ে লিসার আর মাস্টার নিকোলাসের সেই বিষাদময়ী দেবী-প্রতিমার মাঝেও তাকেই আমি দেখেছি। জীবনের পূর্ণতা, শূন্যতা, ভয়, ক্ষুধা আর ভালবাসার প্রতীক হয়ে মা আমার কাছে ধরা দিল সে দিন। আজও মৃত্যুর বেশে মা-ই এসেছে আমার কাছে। আমার বুকে তারই আঙুলের স্নেহস্পর্শ।' নরজিস অনুরোধের সুরে বলল, 'আজ আর কথা বোলো না বন্ধু। আবার কাল সকালে শুনব।'

গোল্ডমুণ্ড তার চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসল। দীর্ঘ দিন পথে পথে কাটিয়ে এই বিচিত্র হাসিটুকু সম্বল করেই সে এখানে ফিরে এসেছে। তার নিষ্প্রভ আর অনিশ্চিত এই হাসিতে স্বচ্ছ সরলতা আর গভীর জ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যায় যেন! ক্ষীণ স্বরে সে বলতে লাগল, 'না, বন্ধু, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি না আমি। আমার বিদায় নেবার সময় হয়েছে। তাই বিদায় নেবার আগে তোমাকে সব কথা বলে যেতেই হবে। আর কিছুক্ষণ আমার কথা শোন। আমার মায়ের সকল কথাই তোমাকে শোনাতে চেয়েছি। মায়ের একটি মূর্তি গড়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার মনে বহুদিন থেকে। আমার সকল স্বপ্নের সেরা স্বপ্নই ছিল সেটা। আমার অন্তরে অতি সঙ্গোপনে রক্ষিত ভালোবাসা-দিয়ে-গড়া এই ছবির রূপদান করতে পারলে সেটাই হত আমার সকল শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সার্থকতম। মায়ের সেই মূর্তি সৃষ্টি না করে মরব এমন ভাবনা কিছুক্ষণ আগেও আমার কাছে অসহনীয় মনে হয়েছে। কিন্তু এখন দেখ মা আমার কেমন করে সব বদলে দিল। আমার দুটি হাত দিয়ে তাকে গড়বার পরিবর্তে সে-ই আমাকে গড়ছে। আমার বুক থেকে আমার আত্মাকে টেনে বের করে আমাকে শূন্য, হালকা করে দিচ্ছে। মা আমাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলেছে। কাঠের বা পাথরের বুকে সেই মাতৃমূর্তি সৃষ্টি করার স্বপ্ন আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে, বন্ধু। মা তাঁর রহস্য বুঝি কোনোদিনই উন্মোচন করতে দেবে না আমাকে। তাই সে আমাকে মেরে ফেলাই ঠিক করেছে। আমিও তাই চাই, বন্ধু। মৃত্যুকে আমার জন্য মা কেমন সহজ, সুন্দর করে দিয়েছে দেখ।'

নরজিস বেদনা-ভরা মনে গোল্ডমুণ্ডের অন্তিম কথাগুলি শুনছে। ভাল করে বোঝার জন্য গোল্ডমুণ্ডের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে কথা শুনতে হচ্ছে তাকে। অনেক কথাই বুঝতে পারল না। আবার এমন অনেক কথা শুনল যার অর্থ তার কাছে অজানাই রয়ে গেল। মুমূর্ষু গোল্ডমুণ্ড এবার চোখ খুলল। তাদের দুজনের দৃষ্টিই যেন পরস্পরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। মাথাটা নাড়বার চেষ্টা করে গোল্ডমুণ্ড ক্ষীণ, অস্ফুট স্বরে বলল, 'কিন্তু নরজিস, তুমি কেমন করে মরবে ভাই? তুমি তো মাকে চিনতে পার নি! মাকে চিনতে না পারলে আমরা কেমন করে ভালবাসব? মরবই বা কেমন করে?' তারপর আরও কি বলল, কিছুই বোঝা গেলনা। শেষের দুদিন দুরাত্রি নরজিস তার বিছানার পাশে বসে গোল্ডমুণ্ডের জীবনদীপ একটু একটু করে নিভে যেতে দেখল।

উজ্জ্বল অগ্নিশিখার মত গোল্ডমুণ্ডের অন্তিম কথাগুলি আজও তার হৃদয় বিদীর্ণ করে।

হেরমান হেস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর সামরিক মদমত্ততায় ক্ষুব্ধ ও বেদনার্ত হয়ে একটি মানুষ মাতৃভূমি ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে এলেন সুইজারল্যাণ্ডে। সত্য বা ন্যায় যেখানে বিপন্ন হয় সেখানে সত্যকার সাহিত্যিক কোনরকম আপোষ মেনে নিতে পারেন না। তাই মাতৃভূমি হলেও সামরিক মত্ততায় সায় দিতে পারেন নি সাহিত্যিক হেরমান হেস। নাৎসী জার্মান শাসকের রোষদৃষ্টিতে তাই তাঁর অমূল্য গ্রন্থগুলি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু নির্ভীক হেস তাতে হার স্বীকার করেন নি।

হেসের জীবনদর্শনের মধ্যে সর্বত্রই একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ব চরাচরের বস্তুজগৎকে অস্বীকার না করে, তার ভেতর দিয়ে যথার্থ সত্যে উপনীত হবার মূলমন্ত্র সাহিত্যিক হেস তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনায় উচ্চারণ করেছেন। হেস একসময় আমাদের ভারতভূমি দর্শনে এসেছিলেন, ভারতের চিন্তাধারার সঙ্গে যে তাঁর পরিচয় হয়েছিল তাঁর রচনাতেই সে প্রমাণ রয়েছে।

১৮৭৭ সালে হেস জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন। একুশ বছর বয়স থেকে পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে তাঁর সাহিত্যসাধনা। প্রথমে কবিতা, পরে উপন্যাস রচনায় তিনি হাত দেন। তাঁর গ্রন্থাবলী এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে অল্পসময়ের মধ্যে বহু বিক্রিত গ্রন্থের স্রষ্টারূপে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর গ্রন্থ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। টমাস মান তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল মন্তব্য প্রকাশ করেন। জীবনসন্ধানী এই শিল্পীকে সুইস সংস্থা পি-এইচ-ডি ডিগ্রি দান করেন। ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কার দানে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

সদাপ্রফুল্ল, ভাব-গম্ভীর এই মানুষটি সাহিত্য-জগতের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টারূপে চিহ্নিত।

১৯৬২ সালের আগষ্ট মাসে বিশ্বের এই সম্মানীয় সাহিত্যিক পরলোক-গমন করেন।

শিউলি মজুমদার (রায়চৌধুরী)

ডাফনে ডি ম্যুরিয়ারের 'রেবেকা' অথবা হেনরিক ইবসনের 'গোস্টস্'-এর বাংলা অনুবাদ পড়ে যাঁরা তৃপ্তি পেয়েছেন, তাঁদের কাছে শিউলি মজুমদারের পরিচয় অজানা নয়। কাব্যধর্মী ভাষায় মূলকে অক্ষুণ্ন রেখে তিনি যে অনুবাদকর্ম করেন তা যে কোন সৎ অনুবাদকের কাছে অনুকরণযোগ্য।

পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী জেলার এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে শ্রীযুক্তা মজুমদারের জন্ম। জীবনের উন্মেষলগ্ন থেকেই তিনি সাহিত্যসেবী। প্রবেশিকা থেকে এম-এ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সংসারজীবনে থেকে তিনি অনুবাদ কর্মকেই সাহিত্যজীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন। সৎগ্রন্থের অনুবাদ যে জাতির সাহিত্যকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে এই দৃঢ় বিশ্বাস তিনি মনে প্রাণে পোষণ করে থাকেন।